ভারতের

স্বাধীনতা সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

সচিত্র "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা" এবং "ভারতের নারী" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত

মডার্ণ বুক্ এজেন্সি

পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক

১০ নং বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য বি-এ
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

মূল্য দুই টাকা মাত্র

প্রিণ্টার—শ্রীশম্ভুনাথ ব্যানার্জ্জি
মানসী প্রেস
৭৩, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উৎসর্গ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

কৈশোরে বিদ্যালয়ে যাঁহার মুখ হইতে স্বদেশ-প্রেমের অমৃতময়ী বাণী শুনিয়া আমার তরুণ চিত্তে প্রথম দেশাত্মবোধ জাগরিত হইয়াছিল, আমার সেই পরম শ্রদ্ধাস্পদ শিক্ষাগুরু শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়কে এবং যাঁহার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া একদিন শত শত যুবক আত্মাহুতি দান করিয়াছিল, সেই বিখ্যাত বিপ্লবীবীর শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ মহাশয়কে ও তাঁহার নিত্য-সহচর নীরব-সহকর্ম্মী পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইলাম। ইতি—

গ্রন্থকার

বন্দে মাতরম্।

সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
শস্য শ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীং,
ফুল্ল-কুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীং,
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীং
সুখদাং বরদাং মাতরম্।
সপ্তকোটিকণ্ঠ-কলকলনিনাদ-করালে,
দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃত-খরকরবালে,
অবলা কেন মা এত বলে!
বহুবলধারিণীং, নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং মাতরম্।
তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম,
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী,
কমলা কমলদলবিহারিণী,
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং।
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং
সুজলাং সুফলাং মাতরম্,
বন্দে মাতরম্।
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং
ধরণীং ভরণীং মাতরম্।

মুখবন্ধ

ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস লিখিবার সময় এখনও আসে নাই। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট, ইংরাজ তাহার রাষ্ট্রীক অধিকার ভারতবাসীর হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেও, এতদিন ভারতবাসী যে সুমহান সাধনায় আত্মমগ্ন ছিল. সেই অখণ্ড ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা সে লাভ করিতে পারে নাই, বরং কূট-কৌশলী ইংরাজ-জাতি তাহার সেই সাধনার পথকে কেবল জটিল নহে, সর্ব্বপ্রকারে বিঘ্ন-সঙ্কুল করিয়া তুলিয়াছেন। এইজন্য ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন, বড়লাট বাহাদুরের ঘোষণা শুনিয়া, সত্যদ্রষ্টা ঋষি শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছিলেন "Not a solution but an ordeal."

ভারতবাসী আজ ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষার সম্মুখীন। সুকঠোর ঐকান্তিক সাধনায় যে দিন ভারত এই মহাসঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইবে, সেই দিনই ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতার ইতিহাস লিখিবার সময় আসিবে। আমার ন্যায় "আদার ব্যাপারীর পক্ষে সে জাহাজের সংবাদ রাখার" আশা বাতুলতা। ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকদিগের সুবিধার জন্য আমি এই ক্ষুদ্র পুস্তকে ইংরাজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠার পর হইতে এ যাবৎ স্বাধীনতা লাভের জন্য ভারতবাসীর ত্যাগ ও তপস্যার একটি ধারাবাহিক সূচীপত্র সঙ্কলিত করিয়াছি মাত্র। এই পুস্তকে বর্ণিত বিষয়গুলির মধ্যে কতকগুলি আমার নিজের চোখে দেখা, কতকগুলি উহার স্রষ্টা বিপ্লবী বন্ধুগণের মুখ হইতে স্বকর্ণে শোনা, অবশিষ্টগুলি সংবাদ পত্রে প্রচারিত প্রসিদ্ধ চিন্তাশীল লেখকগণের রচনা হইতে সংগৃহীত। এজন্য ইঁহাদের নিকট আমি চির কৃতজ্ঞ।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকে এদেশের সমস্ত শহীদগণের নাম ও কার্য্যাবলী সন্নিবেশিত করা সম্ভবপর নহে, এ জন্য যতটা সম্ভব প্রধান প্রধান নেতৃগণের নাম ও ঘটনাবলী প্রদত্ত হইয়াছে। ভবিষ্যৎ সংস্করণে আরও কতকগুলি নাম ও ঘটনা সন্নিবেশিত করার বাসনা রহিল। যাহা উপস্থিত আমার মনে হয় নাই।

এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ যাহাতে পূর্ণাঙ্গ ও ভ্রম-প্রমাদ শূন্য হয়। এজন্য দেশবাসীর নিকট আমার বিনীত নিবেদন, তাঁহারা যেন কৃপা করিয়া তাঁহাদের জানা ঘটনাগুলি আমাকে জানান, এবং এই সংস্করণের যেসব ভ্রম প্রমাদ আছে, তাহা আমার দৃষ্টিপথে আনয়ন করিয়া আমাকে সাহায্য করেন। ইতি—

—আড়বালিয়া— নিবেদক

গান্ধী-জয়ন্তী, ১৯৪৭ শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

চিত্র-সূচী

বিষয়-সূচী

প্রথম অধ্যায়—হিন্দুরাষ্ট্রের ক্রমবিবর্ত্তন—কংগ্রেস ও বৈপ্লবিক কার্য্য

দ্বিতীয় অধ্যায়—অহিংস অসহযোগ আন্দোলন

স্বাধীনতা-সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়

হিন্দু-রাষ্ট্রের ক্রমবিবর্ত্তন—কংগ্রেস ও বৈপ্লবিক কার্য্য

পূর্ব্বাভাষ

এই সুজলা-সুফলা ভারতভূমির মানচিত্রের সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারাই জানেন প্রকৃতি এই মহাদেশকে সকল রকম সম্পদ্ দিয়া এবং ইহার চতুর্দ্দিকে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান রচনা করিয়া ইহাকে সযত্নে রক্ষা করিতেছেন। ভারতের ইতিহাস যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন ইহার সভ্যতা কত প্রাচীন। মিশর চীন প্রভৃতি অন্যান্য সভ্যদেশ সভ্য হইবার বহু পূর্ব্বেই আমাদের এই পুণ্যভূমি সভ্যতার আলোকে আলোকিত হইয়াছিল।

আর্য্যজাতির জন্ম ও প্রথম বাসভূমি এই ভারতবর্ষ। আমাদের আদিপুরুষ এক জ্যোতিসম্পদ্ শ্রীভগবানের মুখ হইতে বেদবাণী শ্রবণ করেন। আর্য্য ঋষিগণ কালক্রমে সেই সমুদয় ভগবন্মুখ-নিঃসৃত বাণী লিপিবদ্ধ করেন। এই বেদই হইল হিন্দুজাতির ধর্ম্ম, রাষ্ট্র ও সমাজের ভিত্তিভূমি। এই বেদ-শাস্ত্রে হিন্দুর সকল রকম ধর্ম্মাচরণের বিধি-ব্যবস্থা আছে। কিন্তু বৈদিক ধর্ম্মের প্রথম যুগে অর্থাৎ সত্যযুগে মানুষের চেষ্টা ও প্রেরণা, ধ্যান-ধারণা ও আরাধনায় নিবদ্ধ ছিল। তখন মানুষ মাত্রেই মুনি-ঋষি ছিল। সুতরাং তদানীন্তন যুগে ভগবদ্‌চর্চ্চা ব্যতীত পার্থিব কোন বিষয়ের চর্চ্চা কেহ করেন নাই।

সত্যযুগের পর আসিল ত্রেতাযুগ। এই যুগে ভারতের লোক-সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইল। তখন ধর্ম্মের ভিত্তিতে পার্থিব সকল বিষয়ের চর্চ্চা হইতে লাগিল। তখনকার ঋষিগণ যুগের প্রয়োজনানুসারে রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি প্রণয়ন করিয়া জনগণকে দান করিলেন। যাঁহারা শক্তিমান্ বীর্য্যসম্পন্ন তাঁহারা দেশের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। দেশের মধ্যে বহুল পরিমাণে ধর্ম্ম প্রচার হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যবিস্তার ও নূতন নূতন রাজ্যস্থাপন হইতে লাগিল। এই সমুদয় রাজ্য শাসকগণ কর্ত্তৃক অতি শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালিত

হইত। যাঁহারাই শক্তি ও বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে লাগিলেন, তাঁহারাই এক একটি রাজ্য গড়িয়া প্রজা পালন করিতে লাগিলেন। এই সময় সূর্য্যবংশীয় নৃপতিগণ ভারতবর্ষে প্রাধান্য লাভ করেন। এই যুগে সূর্য্যবংশীয় নৃপতি **শ্রীরামচন্দ্র** আদর্শ গণতন্ত্র-রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীরামচন্দ্রের পিতৃসত্যপালনে চতুর্দ্দশবর্ষ স্বেচ্ছায় বনবাস ও পুত্রস্নেহে প্রজা-পালন, এবং প্রজাদের কথামত রাজ্য-পরিচালনা; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সেবার জন্য লক্ষণের স্বেচ্ছায় চতুর্দ্দশবর্ষ ব্রহ্মচর্য্য-পালন ও নানারূপ দুঃখ-বরণ; সীতার সতীত্ব এবং স্বামীভক্তি—আবালবৃদ্ধ-বনিতাকে মুগ্ধ করিয়াছে এবং আজও সেই আদর্শ ভারতবাসীর দৈনন্দিন জীবনে অম্লান ও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। আদিকবি **বাল্মীকি** এই যুগেই **রামায়ণ মহাকাব্য** রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই মহাকাব্যে ঐ যুগের ধর্ম্ম, রাষ্ট্র, সমাজ-সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্যের ও তত্ত্বকথার সম্যগ্ সমালোচনা আছে। এই সমুদয় সারগর্ভ নীতির প্রয়োগ সেই আদিকাল হইতে আজও চলিয়া আসিতেছে। আজও পৃথিবীর ধর্ম্ম, রাষ্ট্র, অর্থ ও সমাজনীতির উৎকর্ষতার জন্য সকলে এই মহাকাব্য রামায়ণের নিকট ঋণী।

ইহার পর আসিল দ্বাপরযুগ। এই দ্বাপরযুগেও অনেকগুলি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু সে যুগে চন্দ্রবংশীয় নরপতিগণই প্রাধান্য লাভ করেন। এই সময় ধর্ম্মশাস্ত্রের সমধিক উন্নতি সাধন হয় এবং নূতন নূতন শাস্ত্র-গ্রন্থের সৃষ্টি হয়। এই যুগেই **মহামুনি ব্যাসদেব মহাভারত মহাকাব্য** রচনা করেন। এই কাব্য গ্রন্থে ভারতের তৎকালীন সর্ব্ববিধ অবস্থা ও ঘটনার ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই মহাকাব্যে বর্ণিত কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাই গীতারূপে আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রকে অলঙ্কৃত করিয়াছে। এই সময় সমগ্র ভারতবর্ষ বহু খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। তখন ভারতে ক্ষত্রিয় শক্তি প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। প্রত্যেক ক্ষত্রিয় নৃপতি এইরূপ এক একটি খণ্ড রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া প্রতিবেশী নৃপতিগণের সহিত সর্ব্বদাই যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকিতেন। ফলে উভয়তঃ শক্তি ক্ষয় হইত ও জাতীয় সংহতির অপচয় ঘটিত। এই ক্ষয়ক্ষতি হইতে উদ্ভূত হইল ধর্ম্মের গ্লানি। অধর্ম্মে দেশ ভরিয়া গেল। ঠিক এই সময় শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রথম সৃষ্টি ধর্ম্মভূমি ভারতভূমিতে পুনরায় ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য শ্রীকৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করেন। এই **শ্রীকৃষ্ণ** গোকুলে বর্দ্ধিত হইয়া দ্বারকায় রাজ্য লাভ করেন। পরে কৌরব-পাণ্ডব-যুদ্ধে তাঁহার পরম ভক্ত ও সখা অর্জ্জুনের সারথ্য গ্রহণ করিয়া অর্জ্জুনকে জয়ী করেন। তাহার পর একে একে সকল নৃপতিগণকে বশ্যতা স্বীকার করাইয়া **অখণ্ড ভারতে অখণ্ড ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করেন।** এই অখণ্ড রাজ্য-স্থাপনায় মানবরূপী ভগবানের উপদেশ ও

প্রেরণা থাকিলেও অর্জ্জুনকে ভুজবলে বিভিন্ন রাজ্য জয় করিতে হইয়াছিল; সুতরাং ভারতবাসী আজও পর্য্যন্ত অর্জ্জুনকে আদর্শ বীর বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। *

ইহার কিছুকাল পরে আবির্ভাব হইল কলিযুগের। এই যুগের প্রারম্ভে ভারতে বহুবিধ বিপর্য্যয় দেখা দিল, রাজ্য খণ্ড-খণ্ড হইয়া গেল। নৃপতিগণ স্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়িলেন। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র সব কিছু লোপ পাইল। তখন রাষ্ট্রের পরিচালনা স্বৈরাচারী নৃপতিগণের খেয়াল-খুশির উপর নির্ভর করিয়া রহিল। ইহাব কিছুকাল পরে ভারতের এই অন্তর্বিপ্লব ও গৃহবিচ্ছেদের সংবাদ সমগ্র এশিয়া ও ইউরোপে ছড়াইয়া পড়িল। তখন সুযোগ বুঝিয়া ইউরোপের ম্যাসিদনীয় নৃপতি সেকেন্দার দরায়ুস্ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন (খৃঃ পূঃ ৫১৮ সালে)। তিনি পাঞ্জাবের কিয়দংশ জয় করিয়া কিছুদিনের জন্য তাহা স্বীয় অধিকারে রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সময়েই বুদ্ধদেবের জন্ম হয়। ইহার পর প্রায় দুইশত বৎসর পরে গ্রীসের রাজা অলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করেন। তিনি পাঞ্জাবের রাজা **পুরুকে** পরাজিত করেন। কিন্তু তিনি পুরুরাজের বীরত্ব দেখিয়া মুগ্ধ ও ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে যদিও ভারত বিজয় করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব কিন্তু উহা রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। সুতরাং তিনি পুরুরাজের সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়া পুরুকে তাঁহার হৃতরাজ্য প্রত্যর্পণ করিয়া দেশে ফিরিয়া যান।

ইহার অল্পকাল পরে মগধের মৌর্য্যরাজবংশ-সম্ভূত মহারাজ নন্দ অত্যন্ত অত্যাচারী হইয়া উঠেন। তাঁহার অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য **চাণক্য** নামক এক ব্রাহ্মণের আবির্ভাব হয়। তিনি ঐ রাজ্যের ন্যায্য উত্তরাধিকারী বঞ্চিত-রাজকুমার চন্দ্রগুপ্তকে লইয়া মৌর্য্যনৃপতিগণের সহিত যুদ্ধ করেন—এবং নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে মগধের রাজ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। চাণক্যের উপদেশানুযায়ী **চন্দ্রগুপ্ত** ভারতে অখণ্ড সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করেন—কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহার পর তাঁহার পৌত্র **অশোক** ভারতের প্রায় সকল রাজাকে পরাভূত করিয়া **ভারতবর্ষে এক অখণ্ড সাম্রাজ্য স্থাপন করেন** এবং নিজেকে ভারত-সম্রাট্ বলিয়া

* স্বাধীন ভারতের পতাকায় শ্রীকৃষ্ণের প্রহরণ সুদর্শন চক্র বা সম্রাট্ অশোকের চক্র যাহাই থাকুক উহাই যে কালচক্রের প্রতীক্ তাহাতে সন্দেহ নাই। অশোক যখন হিন্দু ছিলেন তখন তিনি অখণ্ড ভারত-সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া তাঁহার রাজ-পতাকাখানি চক্রশোভিত করিয়াছিলেন। আর অখণ্ড ভারত সাম্রাজ্য দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণই স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু কালক্রমে সেই অখণ্ড রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া যায় এবং অদ্যাবধি ভারতবর্ষে তদনুরূপ অখণ্ড সাম্রাজ্য সংস্থাপন করা সম্ভব হয় নাই।

ঘোষণা করেন। ভারত-সম্রাট্ হইয়া অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং ভারতবর্ষে বুদ্ধদেব-প্রবর্ত্তিত অহিংস ধর্ম্মের প্রচারে ব্রতী হন। অশোকের মৃত্যুর পর ভারতে উপর্য্যুপরি অনেকগুলি বৈদেশিক আক্রমণ হয়। কিন্তু অশোকত্তর কালে প্রায় হাজার বৎসর ভারতীয় নৃপতিবর্গের মধ্যে একতা ও প্রীতির বন্ধন বর্ত্তমান থাকার দরুন বৈদেশিক আক্রমণ দেশের অথবা রাষ্ট্রের কোন স্থায়ী ক্ষতি করিতে পারে নাই।

ইহার পর ভারত পুনরায় গৃহযুদ্ধের আত্মঘাতী অনলে দগ্ধ হইতে আরম্ভ করিল। ভারতের এই দুর্দৈবের সুযোগ গ্রহণ করিয়া ৯৭৭ খৃঃ অঃ সবুক্তগীন ভারত আক্রমণ করিয়া মাত্র কয়েকটি দুর্গ অধিকার করেন। ইহা দেখিয়া ভারতের নৃপতিগণের চৈতন্যোদয় হইল, তাঁহারা কয়েকজন মিলিত হইয়া সবুক্তগীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলেন। কিন্তু এই যুদ্ধে পরাজয় হইল তাঁহাদেরই। এই পরাজয়ের পর হইতে একটির পর একটি রাজ্য বৈদেশিকগণের অধিকারভুক্ত হইতে লাগিল। ইহার পরই পৃথ্বীরাজ ও জয়চন্দ্রের বিরোধের সুযোগ গ্রহণ করিয়া বিদেশীয়রা ভারতের বহুস্থান দখল করিয়া লইল।

ইহার পরবর্ত্তী যুগে মোগল ও পাঠানগণ ভারতে আগমন করিয়া বহুরাজ্য অধিকার করেন। এই মোগল নৃপতি বাবর কিছুকালের মধ্যে ভারতের বহুরাজ্য জয় করিয়া স্বয়ং সম্রাট্-উপাধি ধারণ করেন এবং দোর্দণ্ডপ্রতাপে রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। কিন্তু বাবরের অযোগ্য পুত্র হুমায়ুন পিতার সাধের সাম্রাজ্য শত্রুর হস্তে তুলিয়া দিলেন। তিনি শেরশাহের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রাজ্য হারাইলেন। কিন্তু হুমায়ুনের পুত্র আকবর হিন্দু-নরপতিগণের সাহায্যে পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। এই আকবরের রাজত্বকাল ভারতের ইতিহাসের এক স্মরণীয় অধ্যায়। **আকবর** ভারত-সম্রাট্ উপাধি লইয়া হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে মৈত্রী-স্থাপনের উদ্দেশ্যে **ধর্ম্ম-সমন্বয়ে ব্রতী হন**। তিনি স্বয়ং সূর্য্য-উপাসক হইয়া হিন্দু-মুসলমান সকলকেই সূর্য্য উপাসনা করিতে বলেন। আকবর হৃদয়ের মহত্ত্ব ও উদারতা দেখাইয়া হিন্দুর চিত্ত জয় করিলেন এবং তাহার ফলে ভারতে এক **অখণ্ড সাম্রাজ্য স্থাপিত হইল। হিন্দু নৃপতিগণের মধ্যে একমাত্র মেবারের রাণা প্রতাপ আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিলেন না**। তিনি আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলেন। এই যুদ্ধে রাজপুত জাতির বীরত্ব ও রাজপুত রমণীর তেজ ও সতীত্ব ভারতের বুকে প্রকটিত হইল। ভারতের ইতিহাসে এই গৌরবময় কাহিনী স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইয়াছে। ঠিক এই সময় বাংলার বীর প্রতাপাদিত্যও দেশকে স্বাধীন করিবার জন্য প্রভূত দুঃখ-কষ্ট বরণ করেন। পরিশেষে আকবর সেনাপতি

মানসিংহের হস্তে বন্দী হইয়া ৺পুরীধামে বন্দী অবস্থায় ইহলোক ত্যাগ করেন। সম্রাট্ আকবরের পৌত্র **দারা** হিন্দু ও মুসলমানগণের মিলন স্থায়ী করিবার বাসনায় সর্ব্ব **ধর্ম্ম-সমন্বয়** করিবার জন্য **হিন্দুধর্ম্মকে প্রাধান্য** দিতে আরম্ভ করিলেন। তখন তাঁহার তৃতীয় ভ্রাতা ঔরংজেব গোঁড়া মুসলমান হইয়া হিন্দুদের উপর অত্যাচার করিতে লাগিলেন। ফলে পরিবারিক বিরোধ বাধিল। ঔরংজেব জ্যেষ্ঠভ্রাতা দারাকে নিহত করিয়া বৃদ্ধ পিতা সম্রাট্ সাজাহানকে বন্দী করিয়া সিংহাসন দখল করিয়া বসেন। নিজে সম্রাট্-উপাধি ধারণ করিয়া হিন্দুদের উপর অকথ্য অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। তখন হিন্দু রাজগণের মধ্যে পরস্পর এইরূপ হিংসা ও দ্বেষ বিদ্যমান ছিল যে তাঁহারা কেহই এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংজ্ঘবদ্ধ হইবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিলেন না। সুতরাং ঔরংজেবের পক্ষে এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের প্রতিরোধ বা বিদ্রোহ দমন করা অতীব সহজসাধ্য হইয়া পড়িল। তখন **মহারাষ্ট্রাধিপতি শিবাজী রাণা-প্রতাপের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া সম্রাট্ ঔরংজেবের অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য সচেষ্ট হইলেন।** পরাজিত দেশে সম্মুখ সমর কার্য্যকরী হইবে না বিবেচনা করিয়া তিনি **গরিলা যুদ্ধের** প্রবর্ত্তন করেন। এই কৌশলেই তিনি বহুদিন যাবৎ প্রবল-প্রতাপান্বিত ভারত-সম্রাট্ ঔরংজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া স্বীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রের এই যুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাসে অমর হইয়া বিরাজ করিবে। উপরের কয়টি যুদ্ধই ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অবদান—অত্যাচারী বিজয়ীর বিরুদ্ধে নির্য্যাতিত স্বাধীনতাকামী বিজিতের ব্যর্থ প্রয়াস।

ইংরাজ আমলে স্বাধীনতা-সংগ্রামের সূত্রপাত

মুসলমানগণের ভারত-আক্রমণের পর হইতে ইউরোপীয় বণিকগণ ভারতবর্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তার করিবার উদ্দেশ্যে আগমন করে। তাহারা ভারতের বিভিন্ন বন্দরে পৌঁছাইয়া তত্রত্য শাসকগণের নিকট হইতে আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া কুঠি নির্ম্মাণ করিয়া লইত। কিন্তু যখন ভারতে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিতে আরম্ভ করিল—যখন মুসলমান-মুসলমানে, হিন্দুতে-হিন্দুতে ক্ষমতা ও অধিকার-লাভের উদগ্র আশায় পরস্পর হানাহানি আরম্ভ করিল—তখন ইউরোপীয় বণিকেরা নিজেদের অসহায় অবস্থার কথা চিন্তা করিতে লাগিল।

সুতরাং আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে তাহারা কুঠিতে কুঠিতে কিছু কিছু সৈন্য তাহাদের দেশ হইতে আনিয়া রাখিল। তাহার পর যখন মুসলমান-সাম্রাজ্য ধ্বংসোন্মুখ হইল তখন তাহারা এই সকল কুঠি দুর্গে পরিণত করিয়া অধিকতর

সৈন্য আমাদানী করিল। তাহার পর তাহারা হিন্দু ও মুসলমান নৃপতিগণের সহিত মিত্রতা করিয়া অর্থের বিনিময়ে জমি-জমা ইজারা লইতে আরম্ভ করিল। এই সময় ১৭৪৪ খৃঃ অঃ ফরাসীরা কর্ণাটের নবাবকে পরাজিত করিয়া মাদ্রাজ অধিকার করিলেন। **১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন** বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলার সহিত ইংরাজগণের সংঘর্ষ হয়। বাংলার সঙ্কটমুহূর্ত্তে ভাগ্যদেবী ইংরাজ-বণিকের প্রতি সুপ্রসন্ন হইলেন। পলাশীর যুদ্ধে সেনাপতি মীরজাফর ও অমাত্য উমীচাঁদের বিশ্বাসঘাতকতায় সিরাজদ্দৌলা পরাজিত হইলেন। আবার এই যুদ্ধে ভারতের **স্বাধীনতা বজায় রাখিবার জন্য শেষ চেষ্টা** করিলেন **মীরমদন ও মোহনলাল**। তাঁহারা বীরবিক্রমে ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ করিয়া রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলেন। এই দুই স্বাধীনতা-প্রয়াসী বীরের নাম ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। **ইহার পর হইতে বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে**। ইংরাজ-বণিকগণ রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। ঠিক সেইসময় ভারতের সমুদয় রাষ্ট্রনৈতিক উদ্যম স্তব্ধ হইয়া গেল। ভারতবাসী সকলেই ভুতাবিষ্টের ন্যায় অভিভূত হইয়া পড়িল। ইংরাজগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা দূরে থাক্ ইংরাজের অন্যায় ও অবিচারের একটা ক্ষীণ প্রতিবাদ করিতে কেহ সাহসী হইলেন না।

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে গভর্ণর জেনারেল **হেষ্টিংস** ভারতের সর্ব্বত্র হইতে **ঘুষ সংগ্রহ করিয়া** ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্যে এক রাজার পরিবর্ত্তে অন্য রাজাকে সিংহাসনে বসাইতে আরম্ভ করিলেন। তখন বাংলায় নন্দকুমার নামে এক ব্রাহ্মণ যুবক হেষ্টিংসের এই অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধে ইংরাজের রাজদরবারে অভিযোগ আনয়ন করেন। এই অভিযোগের আমল হইতে ইংরাজের তথাকথিত ন্যায়বিচারের সূত্রপাত। অভিযোগকারী **নন্দকুমারের ফাঁসী হইয়া গেল**। তখন সমস্ত দেশ মুহ্যমান, দেশ বিশ্বাসঘাতকে পরিপূর্ণ। এইজন্য একটি প্রতিবাদও কেহ করিতে পারিল না। তখন হইতে ইংরাজ-রাজত্ব শশীকলার ন্যায় শ্রীবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইল, আর ভারতের সকল রকম প্রেরণা রুদ্ধ হইয়া গেল। ইহার পর ক্রমশঃ ভারতবাসী তাহাদের সত্তা ভুলিল, তাহাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম বিসর্জ্জন দিল। ইংরাজ তখন বিশ্বাসঘাতকদের মধ্যে বুদ্ধিমান্ লোকদিগের দ্বারায় রাজকার্য্য চালাইতে লাগিল।

জাতীয় চেতনার উন্মেষ

এই সময়ে বাংলার রাজা রামমোহন রায়ের (জন্ম—১৭৭৪ সাল) মনে জাতীয় চেতনার উন্মেষ হইল। তিনি হৃদয়ঙ্গম করিলেন যে ভূতাবিষ্টের মত

বাঁচিয়া থাকিয়া কোন লাভ নাই। তিনি স্থির করিলেন ইংরাজের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া দেশে ইংরাজি শিক্ষা-বিস্তার করিয়া ও দেশবাসীকে পাশ্চাত্ত্যভাবে শিক্ষা-দীক্ষা দিয়া উপযুক্ত করিয়া তুলিতে হইবে। নতুবা এই দেশ হইতে বিদেশীর শাসন কখনও লুপ্ত হইবে না। তখন তিনি হিন্দুগণকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"পুরাতন জরাজীর্ণ সংস্কার লইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। 'যে মাটিতে পড়ে লোক, ওঠে সেই ধরে।' অতএব পাশ্চাত্ত্যের সহিত মিশিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মিলন না ঘটাইলে ভারতবাসীর উদ্ধার নাই।" তখন তিনি হিন্দু যুবকদের জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে হিন্দুর একটি শাখা-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিলেন। এদেশ হইতে যাহাতে কুসংস্কার বন্ধ হয় তাহার জন্য তিনি নানাভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সতীদাহ-প্রথা উঠাইয়া দিবার জন্য তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্ককে তিনি অনুরোধ করিয়াছিলেন। ইংরাজি শিক্ষা এদেশে প্রবর্ত্তনের জন্য তিনি বেন্টিঙ্ককে সাহায্য করিতে লাগিলেন। এই সময় ফরাসী দেশে স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব-প্রতিষ্ঠার জন্য ফরাসী জনসাধারণের মধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। এই বিদ্রোহে ফরাসী গণতন্ত্র বিজয়ী হইল। তখন রামমোহন রায় (১৮২৩ সালে) ফরাসী গণতন্ত্রের পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। ইহার পর তিনি ইউরোপ যান। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে তিনি দেহত্যাগ করেন (১৮৩৩ খৃঃ)।

এই সময় হইতে ভারতের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়ে যে ১৮৫৭ সালে ইংরাজ রাজত্বের অবসান হইবে। কিন্তু দেশের লোক তখন ইংরাজি শিক্ষার পাক্ষপাতী কাজেই এই গুজব বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারিল না। ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে কলিকাতায় প্রথমে মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়। তারপর ১৮৫৭ সালে মাদ্রাজ, বোম্বাই ও কলিকাতায় ৩টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সময়ে বংলাদেশে বড় বড় মনীষী, সাহিত্যিক, সমাজ-সংস্কারক জন্ম গ্রহণ করেন। বিরাট পরিবর্ত্তনের সন্ধিক্ষণে এইরূপ মনীষার যুগ প্রায় প্রত্যেক ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। শুধু বাংলা কেন সমগ্র ভারতবর্ষে এই মনীষার আবির্ভাব হয়। সিপাহী-বিদ্রোহ পর্য্যন্ত এই সব বিখ্যাত ব্যক্তি বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেন। রাধাকান্ত দেব (১৭৮৪), দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮০৬), রামতনু লাহিড়ী (১৮১৩), মদনমোহন তর্কলঙ্কার (১৮১৫), রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭), বিদ্যাসাগর (১৮২০), দ্বারকা বিদ্যাভূষণ (১৮২০), মধুসূদন (১৮২৪), ভূদেব (১৮২৫), রাজনারায়ণ (১৮২৬), রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৬), দীনবন্ধু মিত্র, রাখালদাস ন্যায়রত্ন (১৮২৯), রামগতি ন্যায়ালঙ্কার (১৮৩১); রামকৃষ্ণ পরমহংস (১৮৩৩), হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র,

কেশবচন্দ্র (১৮৩৮); রজনীকান্ত (১৮৪১), শিশির ঘোষ (১৮৪২), গিরিশ ঘোষ (১৮৪৩); বিজয় কৃষ্ণ, মনোমোহন ঘোষ, গুরুদাস, উমেশচন্দ্র (১৮৪৪); রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীন সেন (১৮৪৬); শিবনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দ মোহন (১৮৪৭); রমেশচন্দ্র, বিহারীলাল, লালমোহন ঘোষ (১৮৪৮); কৃষ্ণকুমার (১৮৪৯); বিপিন পাল (১৮৫৩); যোগেন বসু, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ (১৮৫৭)। অশ্বিনী দত্ত, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতাও ইঁহাদের সমসাময়িক। ইঁহাদের সমকক্ষ অন্ততঃ একশত মনীষী এক বাংলাদেশেই এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন।

এই সময় বোম্বাই, প্রদেশে পার্শি সম্প্রদায়ের মধ্যে ও মহারাষ্ট্রিয়গণের মধ্যে মনিষার আবির্ভাব দেখা দেয়। দাদাভাই নৌরোজি (১৮২৫); মহারাষ্ট্র তিলক (১৮৩০) প্রভৃতি ইহার নিদর্শন। মাদ্রাজে সুব্রহ্মনীয়া আয়ার, যুক্ত প্রদেশে মদনমোহন মালব্য প্রভৃতি সিপাহী-বিদ্রোহের পূর্ব্বেই জন্মগ্রহণ করেন।

দেশীয় রাজন্যবর্গ যখন দেখিলেন যে ইংরাজগণ কর্ত্তৃক একটির পর একটি করিয়া রাজ্য অধিকৃত হইতেছে তখন তাঁহাদের মধ্যে সকলেই চিন্তা করিতে লাগিলেন 'এইবার বোধহয় তাঁহার পালা আসিতেছে'। তাঁহারা ইহাও আশঙ্কা করিলেন যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট সমগ্র দেশবাসীকে খ্রীষ্টান না করিয়া অব্যাহতি দিবে না। তখন এই সকল নৃপতিবর্গ সঙ্ঘবদ্ধ হইবার চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন। ইংরেজগণ ভারতবর্ষের সৈন্যদলে যে সমুদয় হিন্দু ও মুসলমান সেনা নিযুক্ত করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে ইহা প্রচারিত করা হইল যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট সকলকে খ্রীষ্টান করিবার উদ্দেশ্যে বন্দুকের বুলেটে শূকর ও গরুর চর্ব্বি মাখাইতেছে, ফলে হিন্দু ও মুসলমান সৈনিক অপবিত্র হইয়া যাইতেছে। এই প্রচারের ফলে সৈন্যদিগের মধ্যে ঘোর অশান্তি দেখা দিল।

সিপাহী-বিদ্রোহ

ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত সিপাহিগণকে বিদ্রোহী করিবার জন্য সর্ব্ববিধ ব্যবস্থা হইল। ভারতের রাজন্যবর্গ সকলেই দিল্লীর শেষ সম্রাট্ বাহাদুর শাহের নেতৃত্বে একযোগে যুদ্ধ করিতে স্বীকৃত হইলেন। তাহার ফলে বাহাদুর শাহ ভারতবর্ষে গোহত্যা-নিবারণের ফতোয়া জারি করিলেন। তারপর ১৮৫৭ খৃঃ অঃ ২৯শে মার্চ্চ কলিকাতার নিকটস্থ ব্যারাকপুরে প্রথম সিপাহীদল বিদ্রোহ করিয়া প্রায় সমস্ত ইংরাজ সৈন্য মারিয়া ফেলিল। ঠিক একই দিনে মীরাট, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, বেরিলি, ঝাঁসি বিদ্রোহের প্রধান প্রধান কেন্দ্রস্থল হইল। কানপুর বিদ্রোহের নায়ক

ছিলেন নানাসাহেব। নানাসাহেবের সেনাপতি ছিলেন তাঁতিয়া টোপি। ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাই ঝাঁসির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এই যুদ্ধে মৌলবী আহম্মদ শা, কুমার সিং প্রভৃতি স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ যুদ্ধ করিলেন। ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাই অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যেরূপ বীরত্বের সহিত সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন তাহা জগতের ইতিহাসে বিরল। ফ্রান্সের জোয়ান অব থার্ক মত তাঁহার নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। তাঁতিয়া টোপি সেই সময় গরিলা যুদ্ধ প্রবর্ত্তন করিয়া বহুদিন যাবৎ যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইংরেজেরা তখন এক কৌশল অবলম্বন করিল। হিন্দুদিগকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তুলিতে আরম্ভ করিল। তাহার উপর আম্বালা প্রভৃতি স্থান হইতে সৈন্য আমদানী করিয়া যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে লাগিল। কিছুদিন পরে বিলাত হইতে নূতন সৈন্য ও প্রভূত অস্ত্রশস্ত্র আসিয়া পৌছাইল। এই সমুদয় অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্যের দ্বারায় ইংরাজেরা শীঘ্রই বিদ্রোহ দমন করিয়া ফেলিল। ঝাঁসির রাণী যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন। নানাসাহেব পলায়ন করিলেন, তাঁতিয়া টোপি ধৃত হইয়া ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দিলেন, বাহাদুর শা নির্ব্বাসিত হইলেন। এইরূপে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রথম অধ্যায় শেষ হইল।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের গোড়ার কথা

রামমোহন রায়ের মৃত্যুর চার বৎসর পরে (১৮৩৭ সালে) দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের প্রথম ও প্রধান প্রচারকগণ "ভূম্যাধিকারী সভার" প্রতিষ্ঠা করিয়া ইংরাজগণের নিকট হইতে জমিদার-শ্রেণীর জমি-সংক্রান্ত সুযোগ ও সুবিধা আদায় করিতে থাকেন। ১৮৪৩ সালে জর্জ টমাস ও হ্যারির উদ্যোগে কলিকাতায় Bengal British India Association স্থাপিত হয়। এই এসোসিয়েশনে রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি যুবকগণ প্রবেশ করিয়া ভারতীয়দের জন্য নানারূপ সুযোগ ও সুবিধা আদায় করিতে সচেষ্ট হন। ঠিক এই সময় মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি যুবকগণ ভারতবর্ষে ইংরাজি-শিক্ষার প্রবর্ত্তন ও প্রসারে যথেষ্ট সাহায্য করেন। তাহার পর ১৮৫১ সালে উক্ত 'ভূম্যাধিকারী সভা' Bengal British India Societyর সহিত মিশিয়া যায়। ইহা সম্ভব হইল একমাত্র রাধাকান্ত দেব ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায়।

১৮৫৮ সালে দীনবন্ধু মিত্র "নীলদর্পণ" নাটক রচনা করিয়া "প্রভাকর" পত্রিকায় প্রকাশিত করেন। "নীলদর্পণ" প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেশে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। ইহার প্রত্যক্ষ ফল হইল এই যে তখন হইতে ইংরাজগণ নীলকরদের উপর ভাল ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৬১ সালে **ঋষি রাজনারায়ণ**

(শ্রীঅরবিন্দের মাতামহ) "জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী" নামে এক সভার প্রতিষ্ঠা করেন। এই সভার শাখা বাংলার প্রতি জেলায় স্থাপিত হয়। এই সভা হইতেই **প্রকৃত জাতীয় চেতনার উন্মেষ হইল**। ১৮৬৭ সালে ঋষি রাজনারায়ণ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবগোপাল মিত্র, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি মিলিয়া কলিকাতায় একটি হিন্দু মেলা (অর্থাৎ হিন্দুদের একত্র হওয়া) অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এই মেলায় স্বদেশী শিল্প প্রভৃতি প্রচারেরও ব্যবস্থা করা হয়।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে সিপাহী-বিদ্রোহ পর্য্যন্ত বাংলায় বহু সাহিত্যিক, দার্শনিক, কবি ও বৈজ্ঞানিক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সিপাহী-বিদ্রোহের পরেও ঐরূপ বহু মনীষী বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত মনীষিগণের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

কর্ণেল স্থরেশ বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৮৬১); বিবেকানন্দ (১৮৬২); জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৬৪); আশুতোষ (১৮৬৫); ডি. এল্. রায় (১৮৬৭); চিত্তরঞ্জন, শ্যামসুন্দর (১৮৭০); শ্রীঅরবিন্দ (১৮৭২)। এই সকল মনীষী বয়োপ্রাপ্ত হইলে ঋষি রাজনারায়ণের আরব্ধ কর্ম্ম সর্ব্বান্তকরণে গ্রহণ ও পরিচালনা করিতে আরম্ভ করিলেন। পুণা, গুজরাট প্রভৃতি বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত স্থানে ঠিক এই সময়েই মহাত্মা গান্ধী, মহামতি গোখ্‌লে জন্মগ্রহণ করেন। পাঞ্জাবে লালা লাজপত রায় (১৮৬৫) ও মধ্যপ্রদেশের মতিলাল নেহরু (১৮৬১) প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। এই সময় যাঁহাদের জন্ম হয় তাঁহাদের মধ্যে দুই একজন বিপ্লবপন্থী হইয়া পড়েন, কিন্তু ইহার পর হইতে অধিকাংশই বিপ্লববাদীর জন্মের গৌরবে বাংলাদেশ সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করে।

১৮৭৫ সালে শিশিরকুমার ঘোষ প্রভৃতি মনীষিগণ India League নামে এক সঙ্ঘ স্থাপন করেন। এই সঙ্ঘে সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দ মোহন প্রভৃতি বহু দেশহিতৈষী যুবক যোগদান করেন। কিন্তু কিছুকাল পরে শিশিরবাবুর সহিত তাঁহাদের মতবিরোধ উপস্থিত হয়। ইহার ফলে এই যুবকগণ India League ত্যাগ করিয়া Indian Association নামে আর একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। এই সময় নবীন সেনের "পলাসী-যুদ্ধ" কাব্যাকারে প্রকাশিত হয়। ইহাতে দেশের সকলের চিত্তে একটা গ্লানি উপস্থিত হয়। পলাসীর যুদ্ধে ভারতের বিশ্বাসঘাতকতা সেই দিন ভারতীয় চিত্তে সত্যকারের অনুতাপ আনিল। ১৮৮২ সালে Ilbert Bill পাশ হইলে ভারতের ইংরাজগণ ক্ষিপ্ত হইয়া পড়িলেন। দেশ জুড়িয়া ঘোর আন্দোলন আরম্ভ হইল। এই আন্দোলনে যোগদান করিলেন লালমোহন ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি তেজস্বী বাঙ্গালী তরুণ। এই ঘোরতর আন্দোলনের

যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠ" বাহির হইল। "আনন্দমঠের" সন্তানগণ ও "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীত আপামর জনসাধারণের মধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব উদ্দীপনার সৃষ্টি করিল। ১৮৮৩ সালে সুরেন্দ্রনাথের উদ্যোগে কলিকাতার Albert Hallএ National Conferenceএর অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে স্বামী বিবেকানন্দ, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি যুবকেরা যোগদান করেন। পর পর এই কয়টি ঘটনার মধ্য দিয়া তদানীন্তন শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকগণের মনে দেশাত্মবোধ জাগ্রত হইয়া উঠে। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মধুসূদন দত্ত প্রভৃতির মনে এই সময়ে পরাধীনতার গ্লানি ফুটিয়া উঠে। তাঁহাদের এই অন্তরগ্লানির অভিব্যক্তি হইল গদ্যে, পদ্যে ও নাটকে। মধুসূদন মেঘনাদ ও রাবণের মুখ দিয়া দেশের স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য যে বক্তৃতা দিয়াছেন—তাহা এই অন্তর্দাহের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। ইহাছাড়া হেমচন্দ্রের "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে" প্রভৃতি গীতি-কবিতার মধ্য দিয়া নিজের দেশকে স্বাধীন করিবার একটা তীব্র ব্যাকুলতা জাগিয়া উঠে। দেশের মনে এই সকল সাহিত্য-সৃষ্টি এক অভিনব প্রেরণা জোগাইতে লাগিল। এই সমুদয় ঘটিল বঙ্কিমের যুগে এবং ইহার কিছু পরেই রমেশচন্দ্রের "রাজপুত জীবন প্রভাত," "রাজপুত জীবন সন্ধ্যা," যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের "ম্যাজিনী" ও "গ্যারিবল্ডি জীবনী" প্রভৃতি দেশাত্মবোধ উদ্দীপনাকারী পুস্তকগুলি প্রকাশিত হয় এবং এই নবজাগরণের যুগকে নূতন মহিমায় মহিমান্বিত করে। ইহার পরই "পৃথ্বীরাজ" গ্রন্থের রচয়িতা যোগেন্দ্রনাথ বসুর "ভারতের মানচিত্র" কবিতা বাহির হয়। ইহাতে লোকের মনে দেশাত্মবোধ সমধিক্ বৃদ্ধি পায়। ইহার কিছুকাল পরে ডি. এল. রায়ের "হাসির গান" বাহির হইলে বাংলাদেশে একটু একটু করিয়া ইংরাজ-ভীতি কমিতে আরম্ভ হইল। কবি-সম্রাট্ রবীন্দ্রনাথও এই সময়ে যে সব কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন তাহাতেও দেশাত্মবোধ জাগ্রত হয়।

যখন বাংলাদেশে এইরূপ আলোড়ন চলিতেছিল তখন মহারাষ্ট্রদেশে মহারাষ্ট্র-তিলক বালগঙ্গাধর তিলকের নেতৃত্বে অনুরূপ আন্দোলনই চলিতেছিল। মহারাষ্ট্র-তিলক, পরাঞ্জপে প্রভৃতি দেশ সেবকগণ পুণাতে "সার্ভেণ্ট্ অব ইণ্ডিয়া সোসাইটি" স্থাপন করিলেন। মহামতি গোখ্‌লে, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি কৈশোরে এই মহারাষ্ট্র-তিলকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উৎপত্তি

১৮৮৫ সালে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতের সমস্ত শিক্ষিত ও ধনী সম্প্রদায়কে লইয়া ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের (Indian National Con-

gress) অধিবেশনের ব্যবস্থা করিলেন। এই কংগ্রেস-অধিবেশনে যাঁহারা সুরেন্দ্রনাথকে সাহায্য করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথের বহু বন্ধু-বান্ধব (আনন্দমোহন বসু, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি) ব্যতীত স্কচ্ সাহেব অক্টোভিয়ান্ হিউম্, বোম্বাইয়ের দীনশা ওয়াচা, ফিরোজসা মেটা, দাদাভাই নৌরোজি, মাদ্রাজের সুব্রাহ্মণিয়া আয়ার প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই বৎসর হিউমের নেতৃত্বে প্রথম কংগ্রেসের বৈঠক বসে বোম্বাইয়ে। এই প্রথম অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সময় বিপিনচন্দ্র পাল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি যুবক-সম্প্রদায় ও বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি শিক্ষকগণ সুরেন্দ্রনাথকে যথেষ্ট সাহায্য করেন।

সূত্রপাত হইতেই কংগ্রেস ইংরাজের নিকট আবেদন-নিবেদন করিতেই ব্যস্ত রহিল। কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনও একটা বিলাতের শিক্ষিত যুবক ও বণিকশ্রেণীর অবসর-বিনোদন-ব্যসনে পরিণত হইল। বাস্তবিকই কতকগুলি শিক্ষিত সম্প্রদায় ও জমিদারদের বড়দিনের ছুটির খোরাক-স্বরূপ কংগ্রেসের অধিবেশন বড়দিনের ছুটিতে প্রত্যেক বৎসর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে হইতে লাগিল। কিন্তু ইহাতেই যুবক-সম্প্রদায়ের মধ্যে সবিশেষ সাড়া পড়িয়া গেল। তাঁহারা কংগ্রেস লইয়া মাতিয়া উঠিলেন। তখন বাংলাদেশে ঋষি রাজনারায়ণের পরামর্শে শিবনাথ শাস্ত্রীর নেতৃত্বে বিপিনচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, ভূদেব, অশ্বিনী দত্ত প্রভৃতি স্বদেশী শিল্প-প্রচারে ব্রতী হইলেন।

এই সময় যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের অলোকসামান্য প্রতিভার কথা চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িতেছিল। বাংলার পশ্চাত্ত্যশিক্ষায় শিক্ষিত অনেক নব্যআলোকপ্রাপ্ত যুবক এই অবতারকে বুজ্‌রুক্ ও ভণ্ড প্রমাণ করিবার জন্য দলে দলে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। কিন্তু যাঁহারাই যাইতেন তাঁহারাই এই তথাকথিত অশিক্ষিত বুজ্‌রুক্ সাধুটীর নিকট নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহাকে অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিতেন এবং তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি মহাপুরুষগণও ইঁহার নিকট গিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র, কেশবচন্দ্র প্রভৃতি তদানীন্তন কালের বিশিষ্ট শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ এই সাধু ব্যক্তিটিকে স্ব-স্ব গৃহে আমন্ত্রণ করিয়া আনিতেন এবং তাঁহার নিকট যুক্তি-তর্কে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইয়া তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ আসন দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ **সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়** করিয়া ব্রাহ্ম-সমাজ ও হিন্দু-সমাজের মধ্যে বিরোধ মিটাইয়া ফেলেন। তিনি সকল ধর্ম্মাবলম্বীদের হিন্দুধর্ম্মের আশ্রয়ে আনিতে চেষ্টা

করিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ ইঁহার প্রধান শিষ্যরূপে পরিগণিত হন। ইনি পৃথিবীর সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিয়া হিন্দুধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচার করেন। তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাব বাঙ্গালী যুবকগণের মধ্যে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের প্রেরণা আনিয়া দেয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মাচরণ-পদ্ধতি, তথা যুবকগণের ব্রহ্মচর্য্য-পালনে আত্মিক শক্তির বিকাশ প্রভৃতি বিষয়ে অধ্যাবধি বহু হিন্দু বাঙ্গালী যুবকের অনুরাগ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

আনুমানিক ১৮৯০ খৃঃ অঃ বিপিনচন্দ্র পাল ব্রাহ্মমিশনের পক্ষ হইতে হিন্দুদর্শন প্রচার করিবার জন্য ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রেরিত হন। বিপিনবাবুর এই প্রচেষ্টায় ইউরোপীয় মনীষিগণ ভারতীয় দর্শনের সহিত পরিচিত হন ও ভারতের দৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে থাকেন। ১৮৯৩ খৃঃ অঃ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মিশন হইতে স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিবার জন্য ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রেরিত হন। তিনি আমেরিকার সিকাগো কন্‌ফারেন্সে হিন্দুদর্শন-সম্বন্ধে যে বক্তৃতা প্রদান করেন তাহার প্রত্যক্ষ ফল-স্বরূপ দলে দলে আমেরিকা-বাসী যুবক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শিষ্য ও শিষ্যাগণের মধ্যে ভগিনী নিবেদিতা কায়মনোবাক্যে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ভারতে আসিয়া বাস করেন, এবং আজীবন ভারতের জন্য কল্যাণকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া ভারতবাসীর শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছেন। ভারতের ইতিহাসে তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

বিপ্লবের সূচনা

শ্রীঅরবিন্দ বিলাতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করিবার পর কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষায় ক্ল্যাসিক্যাল ট্রাইপোসের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ-স্থান অধিকার করেন। তখন তাঁহার বয়সমাত্র ১৯ বৎসর। তখন বরোদার ভূতপূর্ব্ব মহারাজা অক্সফোর্ডে বি. এ. পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইবার জন্য ইংলণ্ড গিয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তিনি তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়েন এবং চেষ্টা করিয়া শ্রীঅরবিন্দকে আপনার নিকট রাখিতে সমর্থ হন। তখন মহারাজের বয়স ২৩ বৎসর মাত্র। অচিরেই উভয়ে গভীর সখ্যতা-সূত্রে আবদ্ধ হন এবং মহারাজা শ্রীঅরবিন্দের নিকট হইতে পাঠ্য বিষয়ে প্রভৃত উপায়ে সাহায্য পাইতে লাগিলেন। ১৮৯১ সালের শেষভাগে বরোদার মহারাজা শ্রীঅরবিন্দকে তাঁহার প্রাইভেট্ সেক্রেটারী করিয়া ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বরোদায় আসিয়া শ্রীঅরবিন্দ মহারাজার প্রাইভেট্ সেক্রেটারী থাকা সত্ত্বেও বরোদা কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। এই সময় বরোদার ছাত্র-জাগরণ আরম্ভ হয়। ১৮৯৩ সালে শ্রীঅরবিন্দ

বোম্বাইয়ের "ইন্দুপ্রকাশ" পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ বাহির করিলেন। উক্ত-প্রবন্ধে তিনি কংগ্রেসী নীতির তীব্র সমালোচনা করিয়া লেখেন—"কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন কতকগুলি শিক্ষিত ও ধনী ব্যক্তির জন্য। ইহাতে দেশের কোটি কোটি দরিদ্র ও অশিক্ষিত জনসাধারণের কোন উপকার হইবে না। এখনই এমন আন্দোলন করা দরকার যাহাতে দরিদ্র ও অশিক্ষিত জনসাধারণের মঙ্গল হয় এবং ইংরাজ প্রভুদেরও চৈতন্যোদয় হয়।" স্বামী বিবেকানন্দ এই সময় হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিবার জন্য আমেরিকায় অবস্থান করিতেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের বাণী প্রকাশিত হইবার কিছু পরে স্বামীজী ভারতবাসীদের জানাইলেন "শক্তিমান্ হও, পৌরুষ লাভ কর, দরিদ্র জনসাধারণকে বাঁচাইবার জন্য যুদ্ধ কর।"

ঠিক এই সময়ে ছাত্রদল কংগ্রেসের বিরোধিতা করিতে লাগিলেন। শ্রীঅরবিন্দ বরোদায় "তরুণ সঙ্ঘ" নামে একটি সঙ্ঘ স্থাপন করিলেন। তাঁহার এই সব দেশহিতকর কার্য্য-কলাপে বোম্বাই হাইকোর্টের জষ্টিস্ রাণাডে, মহারাষ্ট্র-তিলক বালগঙ্গাধর তিলক ও যুক্ত প্রদেশের পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য শ্রীঅরবিন্দকে স্নেহ করিতে লাগিলেন।

১৮৯৩ সালের কিছু আগে পুণার ঠাকুর সাহেব একটি গুপ্ত সমিতি স্থাপন করেন। তাহাতে শিবাজী উৎসব আরম্ভ হয়। ১৮৯৪ সালে মহারাষ্ট্রদেশে দামোদর এবং বালকৃষ্ণ চাপেকার (দুইভাই) "হিন্দুধর্ম্ম সঙ্ঘ" স্থাপন করিয়া গণপতি উৎসব আরম্ভ করিলেন। ১৮৯৭ সালের গণপতি উৎসবে মহারাষ্ট্র-তিলক-সম্পাদিত "কেশরী" পত্রিকায় শিবাজীর বাণী প্রকাশিত হয়। তাহাতে তিলক মহারাজের দেড় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। তারপরই ১২ই জুন, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ৬০ বৎসর রাজত্ব পূর্ণ হইবার জন্য যে "হিরক জুবিলী উৎসব" হয়, সেইদিনই চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয় ল্যাণ্ড ও লেঃ আয়ার্ষ্টকে হত্যা করেন। সেই সময়ে মহারাষ্ট্রে মহামারী প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়। এই প্লেগ নিবারণের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। কিন্তু দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা তখন এইরূপ যে এই প্লেগ কমিটির সভাপতি একজন ইংরাজ গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিহত হইলেন। চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ের ফাঁসি হইল। এই শাস্তিকে উপলক্ষ্য করিয়া সেই সময় পরাঞ্জপে তাঁহার সম্পাদিত "কাল" পত্রিকায় দেশ-সেবকের অপরাধ-সম্পর্কে অনেক প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন। এই সময়ে নাটু ভ্রাতৃদ্বয় তিলক মহারাজের "কেশরী" পত্রিকায় "দেশ সেবকের" অপরাধ-সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন তাহার জন্য পরাঞ্জপে ও নাটু-ভ্রাতৃদ্বয় নির্ব্বাসিত হন।

১৮৯৪ সালে পুণায় চীফ্ কনেষ্টবলকে হত্যার চেষ্টায় ৪ জন যুবকের ১০ বৎসর কারাদণ্ড হয়।

১৮৯৪ সালে শ্রীঅরবিন্দ "ইংরাজের জেল পরিচালনা"-সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বোম্বাইয়ের "ইন্দু প্রকাশ" পত্রিকায় প্রকাশিত করেন। সেই প্রবন্ধ পড়িয়া তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড এল্‌গিন জষ্টিস্ মহামতি রাণাডেকে বরোদায় যাইয়া শ্রীঅরবিন্দকে "ভারতীয় কারাসমূহের তত্ত্বাবধানের" ভার লইবার জন্য অনুরোধ করিতে বলেন। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ গভর্ণমেণ্টের এই সম্মান প্রত্যাখ্যান করেন। সেই বৎসরই "ইন্দু প্রকাশ" পত্রিকায় "ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার" ইঙ্গিত করিয়া শ্রীঅরবিন্দ আর একটি প্রবন্ধ লিখেন। ১৮৯৬ সালে শ্রীঅরবিন্দ পুণায় ঠাকুর সাহেবের "গুপ্ত সমিতির" সভাপতি হইয়াছিলেন। ১৮৯৭ সালে চাপেকার ব্রাদার্সের ফাঁসীর পর তিলকের পূর্ব্বাদেশ মত ঠাকুর সাহেবের "গুপ্ত সমিতি" ও শ্রীঅরবিন্দের বরোদার "তরুণ সমিতি" ও চাপেকার ব্রাদার্সের "হিন্দুধর্ম্ম সঙ্ঘ" এই কয়টি প্রতিষ্ঠান একত্র মিলিত হয় এবং শ্রীঅরবিন্দ ইহার সভাপতি হন। সেই সময় ভারতের সর্ব্বত্র সঙ্ঘ ও সমিতি-স্থাপনের হিড়িক্ পড়িয়া যায়। স্বামী বিবেকানন্দ ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ১৮৯৭ সালে "সেবাধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান" স্থাপন করেন। এই সময় শ্রীঅরবিন্দ বাংলায় আসিতে ইচ্ছা করেন এবং বাংলাভাষা শিক্ষা আরম্ভ করেন। তৎপূর্ব্বে তিনি বাংলাভাষা ও বাংলা কথা কিছুই জানিতেন না।

বাংলাভাষা শিক্ষা করিয়া শ্রীঅরবিন্দ "ভবানী স্তব" ও "ভবানী পূজা" ভারতের সর্ব্বত্র প্রবর্ত্তন করিবার মানসে "ভবানী মন্দির" নামক একখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন বরোদার রাজার দেহরক্ষী ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ ইঁহাকে তাঁহার উদ্দেশ্য-সাধনের পথে আকর্ষণ করিলেন। শ্রীঅরবিন্দ যতীন্দ্রের হাতে ভবানী মন্দিরের একখানি কপি দিয়া ভারতের সর্ব্বত্র গুপ্ত সমিতি-স্থাপনের জন্য ১৯০২ সালে প্রেরণ করিলেন। যতীন্দ্র প্রথমে কলিকাতায় আসিয়া একটি গুপ্ত সমিতি স্থাপন করিলেন। এই সময়ে ব্যারিষ্টার পি. মিত্র মহাশয় আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে রাজা রামমোহন রায়ের বাড়ীর পাশে যেখানে পূর্ব্বে পুলিশ ষ্টেশন ছিল তাহার পাশের বাড়ীতে একটি অনুশীলন সমিতি স্থাপন করেন। তাহার কর্ত্তৃত্ব-ভার তিনি শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও আড়বালিয়া গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বসুর হাতে অর্পণ করেন। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও ইহাদের সহিত আলাপ-পরিচয় করিয়া তাহার পর মেদিনীপুর গমন করেন এবং সেখানে "যুবসঙ্ঘ" "তরুণ সঙ্ঘ" "ভবানী মন্দির" প্রভৃতি নামে কয়টি গুপ্ত সমিতি স্থাপন করিলেন। ১৯০৩ সালের গোড়ায় কলিকাতা-শাখার ভার অরবিন্দ-ভ্রাতা বারীন্দ্রের হস্তে অর্পিত হইল। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বারীনবাবুর

সহিত জুটিলেন। সেই সময় বারীন্দ্র শ্রীযুক্ত পি মিত্র মহাশয়ের অনুশীলন সমিতির সহিত পরিচিত হন এবং তৎকালীন "হিতবাদী" সংবাদপত্রের সহকারী-সম্পাদক মহারাষ্ট্রিয় ব্রাহ্মণ সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয়কে "দেশের কথা" লিখিতে অনুরোধ করেন। ইহার পর ১৯০৩ সালে বারীন্দ্র কলিকাতানিবাসী শ্রীযুক্ত দেবব্রত বসু (পরে মায়াবতী মঠের অধ্যক্ষ প্রজ্ঞানন্দ স্বামী), বিবেকানন্দ-ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রভৃতি কয়েকটি যুবককে ঐ সমিতির সভ্য তালিকাভুক্ত করেন। তখন বাংলাদেশের সর্ব্বত্র শিবাজী ও আনন্দমঠের আদর্শ অনুসরণ করিয়া গরিলা-যুদ্ধের আয়োজন পূর্ণোদ্যমে চলিতে থাকে। ব্যারিষ্টার পি. মিত্র মহাশয় পূর্ব্ব হইতেই অনুশীলন সমিতি বাংলাদেশের কয়েকস্থানে স্থাপিত করিয়াছিলেন। এখন এই সকল সমিতির নেতৃত্ব-ভার তিনি নিজে গ্রহণ করিলেন। মিত্র মহাশয়ের নেতৃত্বে ইহার কিছুদিন পরে ঢাকায় "অনুশীলন সমিতির" বরিশালে "স্বদেশ বান্ধব সমিতি," ফরিদপুরে "ব্রতী সমিতি," ময়মনসিংহে "সাধনা সমিতি," "সুহৃদ সমিতি" প্রভৃতি স্থাপিত হইল। ঢাকা ও বরিশালে স্বদেশী প্রথায় 'দরিদ্রনারায়ণের সেবা,' 'লাঠিখেলা,' ও 'ব্যায়াম শিক্ষা' প্রভৃতি এই সকল সমিতির প্রধান স্থান অধিকার করিয়া বসিল। তৎকালীন বরিশালের শিক্ষাগুরু অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় ঐ সব ছেলেদের চরিত্র-গঠনে ব্রতী হইলেন। ইঁহার সহকারী হইলেন শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ঠিক এই সময়ে শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তীর চেষ্টায় কলিকাতায় আর একটি আধা-বিপ্লবীদল গঠিত হয়। তাহার সদস্য হন শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু, রাজকুমার সেন, ডাক্তার নলিনীরঞ্জনের কাকা যতীন্দ্রনাথ সেন, অধ্যাপক শশীভূষণ সরকার প্রভৃতি। ইঁহারা শ্যামসুন্দরকে সম্পাদক করিয়া "People and Pratibashi" নামে একখানি মাসিকপত্রিকাও প্রকাশিত করেন। পশ্চিমবঙ্গের সমিতিগুলির প্রধান কর্ম্ম হইল বিপ্লব প্রচার করা। (এই সময় অশ্বিনীকুমার দত্তের সুযোগ্য ছাত্রবৃন্দ বাংলার ছাত্র-সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বদেশী প্রচারের জন্য ও ছাত্রগণের চরিত্র-গঠনের নিমিত্ত বাংলার পল্লীতে পল্লীতে শিক্ষকতা গ্রহণ করিতে লাগিলেন।) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন আড়বালিয়ায় প্রধান শিক্ষকের পদ লইয়া আগমন করিলে শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের সহিত মিলন হইল। আড়বালিয়া গ্রাম বিপ্লবীদের একটি প্রধান কেন্দ্র লইয়া দাঁড়াইল। আড়বালিয়ার কেন্দ্রের নায়ক হইলেন শ্রীযুক্ত পি. মিত্র মহাশয়ের কলিকাতা শাখার কর্ত্তা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বসু এবং শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ভটাচার্য্য। তখন বাংলার সর্ব্বত্রই হিন্দুযুবকগণ মুসলমানদিগকে দলভুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং তাহাদিগকে শিক্ষিত করিবার কার্য্যে লাগিয়া গেলেন।

বঙ্গ-ভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন

বাংলার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবের পর হইতে বাংলার এইরূপ অভূতপূর্ব্ব জাগরণ ও সর্ব্বত্র সমিতি স্থাপনা ইত্যাদিতে ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কার্জ্জন বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তিনি বাংলার হিন্দু ও মুসলমানকে পৃথক করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি কি করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের দুর্দ্ধর্ষ প্রকৃতির যুবকগণের সহিত পশ্চিমবঙ্গের যুবকগণের মিলন বন্ধ করিবেন তাহাও চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১৯০৪ সালের শেষে তিনি বিলাতের মন্ত্রীসভায় বঙ্গভঙ্গের খস্‌ড়া প্রেরণ করিলেন। ১৯০৫ সালে শ্রীঅরবিন্দ বাংলায় আসিয়া বাংলার নেতাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ করিতে বলিলেন। তদনুযায়ী ইংরাজ সরকারের নিকট অনেক আবেদন নিবেদন প্রেরণ করা হইল কিন্তু কোনও ফলোদয় হইল না। ১৯০৫ সালের মধ্যভাগ হইতে বাংলার চারিদিকে ঘোরতর প্রতিবাদ আরম্ভ হইল। ইংরাজ রাজ সকল প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া সকলরকম আবেদন নিবেদনে কর্ণপাত না করিয়া যখন যথার্থই বাংলাকে বিভক্ত করা স্থির করিলেন, তখনই বাংলায় তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইয়া গেল। রাষ্ট্রগুরু স্থরেন্দ্রনাথ বঙ্গ-বিভাগ রদ্ করিবার মানসে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার সহকারী হইলেন শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, লিয়াকৎ হোসেন, এ রস্থল, বিপিনচন্দ্র পাল, কৃষ্ণকুমার মিত্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, স্থরেন্দ্রনাথ সেন, শচীন্দ্রনাথ বস্থ, গিষ্পতি কাব্যতীর্থ, মতিলাল ঘোষ, আনন্দমোহন বস্থ, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি বাংলার খ্যাতনামা নেতা, বক্তা ও সংবাদপত্র সম্পাদকগণ। দেশের সর্ব্বত্র প্রত্যহ সভার অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। কলিকাতায় এই বিষয়ে প্রথম যে মহতী সভার অধিবেশন হয় তাহার স্থান হইল বাগবাজারের জমিদার পশুপতি বস্থ মহাশয়ের বাটির বিস্তৃত প্রাঙ্গন। চতুর্দ্দিকেই সভা হইতে লাগিল। সভায় লক্ষ লক্ষ জনসমাগম হইতে লাগিল। প্রতি সভার উদ্বোধনে "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীত গীত হইত। এই গীতটী ছাড়াও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আরও কতকগুলি স্বদেশী গান রচনা করিয়াছিলেন। সেই সকল গান ও হেমচন্দ্রের "দীনের দীন সবে দীন, ভারত হয়ে পরাধীন" গানটী, দ্বিজেন্দ্রলালের "বঙ্গ আমার জননী আমার "এইরূপ অন্যান্য বহুবিধ দেশাত্মবোধক সঙ্গীত এই সকল সভাসমিতিতে গীত হইতে লাগিল। এই সকল সঙ্গীতের মধ্য দিয়া জাতীর প্রাণ আলোড়িত হইল—তাহাদের অন্তরে স্বাদেশিকতার উদয় হইল। সকলেই স্বদেশী আন্দোলনের কার্য্যে মত্ত হইয়া পড়িল। বাংলা দেশে "মরা গাঙ্গে ঢেউ আসিল"—আর সকলে "জয় মা বলে তরী ভাসাইল।"

সেই সময় ঢাকা ও বরিশালে পশ্চিম বঙ্গ অপেক্ষা আন্দোলনের তীব্রতা অধিক হইতে লাগিল। তাহার কারণ ঢাকার ও বরিশালের সমিতির ছেলেরা সকলেই খুব কষ্টসহিষ্ণু ও সাহসী। ঢাকায় অনুশীলন সমিতির নেতা ও লাঠি, খেলার গুরু ছিলেন শ্রীযুক্ত পুলীনচন্দ্র দাস। বরিশালে শ্রীযুক্ত মুকুন্দ দাস যাত্রার দল করিয়া "মাতৃপূজা"র গীতাভিনয়ের দ্বারায় স্বদেশী প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার গান—"ভয় কি মরণে রাখিতে সন্তানে" যখন গীত হইত, তখন শ্রোতৃমণ্ডলী আবালবৃদ্ধবণিতার রক্ত উত্তেজনায় টগ্‌টগ্‌ করিয়া ফুটিয়া উঠিত। স্বদেশী দ্রব্য প্রচারের আন্দোলন প্রত্যহ চলিতে লাগিল। বাংলার সর্ব্বত্র স্বদেশী কোম্পানী জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে লাগিল। ১৯০৫ সালের মাঝামাঝি মৈমনসিংহের কিশোরগঞ্জে জাতীয় বিদ্যালয় প্রথম স্থাপিত হয়। উহার প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন স্বদেশ প্রেমিক নেতা বরিশাল নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন।

কিশোরগঞ্জ জাতীয় স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেনের উদ্যোগে ১৯০৫ সালের ১৩ই শ্রাবণ, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে কিশোরগঞ্জে একটী সভা আহুত হয়। তাহাতে শ্রীঅরবিন্দ, কৃষ্ণকুমার মিত্র, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রভৃতি জননায়কগণ উপস্থিত ছিলেন। সেই সভার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন বিলাতীবর্জ্জনের প্রস্তাব করেন। উহা শ্রীঅরবিন্দ সর্ব্বান্তকরণে সমর্থন করেন। সুরেন্দ্রনাথ সেন তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন "শুধু গুঞ্জনে কুজনে গন্ধে, সন্দেহ হয় মনে, লুকোনো কথার হাওয়া বহে, যেন বন হ'তে উপবনে"। ঐ সভায় সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় প্রথম বিলাতী বর্জ্জন প্রস্তাব করিয়াছিলেন বলিয়া ইহাকে "ফার্ষ্ট বয়কটার ছোট সুরেন্দ্রনাথ" বলা হইত।

তাহার পর কলিকাতা, টাউন হলে, ৭ই আগষ্ট, এক মহতী সভার আয়োজন হয়। উহাতে মহারাজা মনীন্দ্র নন্দী, মহারাজা ব্রজেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী, টাকির জমিদার যতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, জাষ্টিশ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জাষ্টিশ এ, চৌধুরী, ব্যারিষ্টার জে, চৌধুরী প্রভৃতি বাংলায় সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তি ও রাজা মহারাজা উপস্থিত ছিলেন। ঐ সময়ে বিলাতী বর্জ্জন, স্বদেশী গ্রহণ, জাতীয় শিক্ষার প্রস্তাব সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। উহাতে সুরেন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, শ্যামসুন্দর, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি নেতা ও যুবকগণ উপস্থিত ছিলেন।

উহার কিছু পরে বরিশালে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির একটি সভার আয়োজন হয় এবং দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথকে সভাপতি করা হয়। কিন্তু তৎকালীন পূর্ব্ববঙ্গের ছোটলাট ফুলারের হুকুমে সেই সভা ভাঙিয়া দিবার চেষ্টা হয়।

বরিশালের ম্যাজিষ্ট্রেট্, সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি কলিকাতার নেতৃবৃন্দকে বরিশালে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলে সুরেন্দ্রনাথ সে হুকুম্ অমান্য করিয়া সভা করিলেন এবং পুলিশের দ্বারায় ধৃত হইয়া চারিশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। শ্রীঅরবিন্দ, ব্যারিষ্টার জে. চৌধুরী প্রভৃতি ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। রাষ্ট্রগুরুকে পুলিশে ধরার জন্য ছেলের দল ক্ষেপিয়া উঠিল। তাহারা পুলিশের বিরুদ্ধে নানারূপ বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে লাগিল। এই বিক্ষোভ এতই চরমে উঠিয়াছিল যে আশু একটি বিদ্রোহের আশঙ্কাও অমূলক ছিল না। সুরেন্দ্রনাথ জরিমানা দিতে অস্বীকার করায় তাঁহার নাম হইল Surrender not." তারপর ব্যারিষ্টার জে, চৌধুরী মহাশয় সেই টাকা দিয়া সুরেন্দ্রনাথকে লইয়া কলিকাতায় ফিরিলেন। এই প্রসঙ্গে সকলের জানা আবশ্যক, শ্রীঅরবিন্দ তখনকার স্বদেশী আন্দোলনের প্রচার করিবার জন্য বরোদা হইতে ছুটি লইয়া বাংলায় আসিয়া সমস্ত সভা সমিতিতে যোগ দিয়া যুবসমাজকে পরিচালিত করিতেছিলেন, শ্রীঅরবিন্দ বরিশাল কন্‌ফারেন্সও গিয়াছিলেন।

প্রায় এক বৎসর আন্দোলনের পর যখন ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গ ভঙ্গের দিন স্থির হইল। তখন নেতৃবৃন্দ ঐ তারিখে বাংলার সর্ব্বত্র হিন্দু-মুসলমানে রাখীবন্ধন ব্যবস্থা করিলেন। সেই রাখীবন্ধনের উৎসবের মন্ত্র কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ রচনা করিলেন। "ভাই ভাই, এক ঠাঁই, ভেদ নাই, ভেদ নাই।"

১৯০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বারাণসী ধামে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। তাহাতে মহামতি গোখ্‌লে সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। তাহাতে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ করা হইল, "স্বদেশী গ্রহণ" ও "যতদূর সম্ভব বিলাতী বর্জ্জন" পাশ হইল, কিন্তু কেহই ইংরাজের বিরুদ্ধে বিশেষ কিছুই জোর করিয়া বলিলেন না। ইহাতে বাংলার সকলেই ক্ষুব্ধ হইল। কংগ্রেসের অধিবেশনের শেষ হইবার পর পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, মহারাষ্ট্র তিলক বাল গঙ্গাধর তিলক, মহামতি গোখ্‌লে, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, মহামতি জাষ্টিস্ রাণাডে, ও শ্রীঅরবিন্দকে লইয়া একটি বোর্ড গঠিত করিলেন। এই বোর্ড জাতীয় শিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য কাশী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। কলিকাতার অনুরূপ একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাব এই স্থানেই গৃহীত হইল।

যখন ভারতীয় কংগ্রেসের মডারেট্ নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসের ভিতর হইতে বাংলার জন্য ভারতব্যাপী আন্দোলনের সাহায্য করিলেন না তখন বাংলার বিক্ষোভ দেখা দিল। বাঙ্গালীরা তখন কংগ্রেসের আশা ত্যাগ করিয়া নিজেরাই প্রতিকারের নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইলেন। ইহার ফলে কলিকাতার "জাতীয় শিক্ষা পরিষদ" গঠিত হইল এবং রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, ব্যারিষ্টার তারকনাথ পালিত, জষ্টিশ

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক, রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁ, জষ্টিশ এ, চৌধুরী প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিরা ইহাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিলেন এবং ইহার জন্য প্রচুর অর্থ দান করিলেন। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় কবি-সাহিত্যিক হইতে আরম্ভ করিয়া রাজা মহারাজা প্রভৃতি এই বোর্ডের সভ্য হইলেন। ইহাতে বিদ্যালয়ের শিক্ষা হইতে বি, এ, অবধি শিক্ষার ব্যবস্থা রহিল। অধিকন্তু ইহাও স্থির হইল যে ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট টেক্‌নিক্যাল ক্লাসে সকল ছাত্রকেই যোগ দিয়া কার্য্যকরী বিদ্যাশিক্ষা করিতেই হইবে। শ্রীরামপুরে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস, কলিকাতায় ন্যাশন্যাল ট্যানারি, বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রভৃতি বহু স্বদেশী প্রতিষ্ঠান এই সময় স্থাপিত হইল। এই সময়ে এ্যান্টি সারকুলার সোসাইটী, ছাত্র ভাণ্ডার, কমলালয় প্রভৃতি স্বদেশী জামা কাপড়ের দোকান স্থাপিত হয়। দেখিতে দেখিতে ছোটবড় বহুবিধ শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে লাগিল। বিলাতি সিগারেট ও সাবান দেশ হইতে উঠিয়া গিয়া দিশি সাবান, বিড়ি ও চুরুটের প্রবর্ত্তন হইল।

গরম পন্থীরা দেখিলেন শুধু স্বদেশী আন্দোলনে বা কাতর অনুনয়ে বিনয়ে কাজ হইবে না। তখন তাঁহারা ছাত্রদের উত্তেজিত করিবার জন্য নিজেরাই সংবাদপত্র বাহির করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেই সময় পৃথিবীর সর্ব্ব-ধর্ম্ম-শাস্ত্রজ্ঞ-সন্ন্যাসী, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় খৃষ্টধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু হইয়া "সন্ধ্যা" নামক দৈনিক সংবাদপত্র বাহির করিলেন। শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী ইহার সহকারী সম্পাদক ও শ্যামসুন্দরের কনিষ্ঠ গিরিজাসুন্দর চক্রবর্ত্তী ইহার কর্ম্মকর্ত্তা হইলেন। তৎকালীন বাংলাদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ভাট্‌পাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্নের নিকট ব্রহ্মবান্ধব প্রায়শ্চিত্ত্য বিধি চাহিলে তিনি বিধান দিলেন যে "গঙ্গাস্নানের পর পাঁচটি কড়ি গঙ্গায় দিয়া মনে মনে বলিতে হইবে যে আমি আর কোন অখাদ্য ভক্ষণ করিব না বা হিন্দুধর্ম্মের বাহিরের কোন কাজ করিব না।" তিনি আরও লিখিলেন "আপনার মত সাধুরা সর্ব্বদাই শুচি অবস্থায় আছেন, আপনাদের কোন প্রায়শ্চিত্ত না করিলেও ক্ষতি নাই।" ব্রহ্মবান্ধব খৃষ্টান হইতে যখন হিন্দুসমাজে স্থান পাইলেন তখন সকলের মনে নূতন প্রেরণা আসিল। এই সময়েই শ্রীঅরবিন্দ বরোদা হইতে বারীন্দ্রকে টাকা পাঠাইলেন—বিপ্লবীদের একখানি মুখপত্র বাহির করিবার নির্দ্দেশ দিয়া। তদনুযায়ী ১৯০৬ সালের মার্চমাসে "যুগান্তর" রক্ত পতাকা বক্ষে ধারণ করিয়া সাধারণ্যে আত্মপ্রকাশ করিল। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত মহাশয় ইহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইলেন। কর্ম্মকর্ত্তা হইলেন শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য আর প্রধান লেখক হইলেন শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ আর দেবব্রত বসু। সম্পাদক হইলেন স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।

আড়বালিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এবং কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত শাক্য সিংহ সেন ইহাতে নিয়মিত লিখিতেন। ইহার অতি অল্পদিন পরে শ্রীঅরবিন্দ বরোদার রাজ-সম্মান পরিত্যাগ করিয়া দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। শ্রীঅরবিন্দের আগমন সংবাদ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেশের মধ্যে নূতন জোয়ার আসিল। 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদের' কর্ত্তারা শ্রীঅরবিন্দকে ঐ পরিষদের অধ্যক্ষের পদে বরণ করিয়া লইলেন। এই সময় "যুগান্তর" ও 'সন্ধ্যা' দেশের ছেলেদের প্রায় মারমুখী করিয়া তুলিয়াছে। কারণ তাহারা ঐ দুইখানি পত্রিকা মারফৎ বৈদেশিক অত্যাচারের নির্ম্মম উদাহারণ পাঠ করিয়া ক্রমশই ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিতেছিল।

শ্রীঅরবিন্দের সহিত ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয় রাজা সুবোধ মল্লিকের বাটীতে দেখা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন "বিপিন বাবু তাহার 'New India' সাপ্তাহিক পত্রিকাখানি দৈনিক করিতে চান এবং আপনাকে তাহার সম্পাদক করিতে চান।" ইহাতে শ্রীঅরবিন্দ বিপিনবাবুকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাইয়া বলিলেন "আমি সম্পাদক হইলে সে কাগজের নাম রাখিতে হইবে 'বন্দেমাতরম'।" তখনই শ্যামসুন্দরবাবু বিপিনবাবুকে সংবাদ দিলেন। বিপিন বাবু রাজা সুবোধ মল্লিকের বাটী আসিয়া শ্রীঅরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। রাজা সুবোধ মল্লিক এই কথা শুনিয়া তখনই বন্দেমাতরম্ পত্রিকার অফিসের জন্য তাঁহার বাড়ী সংলগ্ন ক্রীক্‌রোর তাঁহার নিজের আর একটি বাড়ী ছাড়িয়া দিলেন, এবং মুদ্রাযন্ত্র, কাগজ প্রভৃতি আনাইবার জন্য একলক্ষ টাকা দিলেন। রবিবাবুর সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি. এ (অক্সফোর্ড) মহাশয় বন্দেমাতরম পত্রিকা চালাইবার জন্য কিছু টাকা দিলেন। "বন্দেমাতরম" পত্রিকা বাহির হইল। শ্রীঅরবিন্দ হইলেন প্রধান সম্পাদক। বয়োবৃদ্ধ দেশনেতা বিপিনবাবু হইলেন সহকারী সম্পাদক আবার বিপিনবাবুর প্রধান সহকারী হইলেন শ্যামসুন্দর। সংবাদাদি সম্পাদনার ভার লইলেন শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ। আর শ্রীযুক্ত গিরিজাসুন্দর চক্রবর্ত্তী ইহার কর্ম্মকর্ত্তা হইলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, বি, সি, চ্যাটার্জ্জি, প্রভৃতি ব্যারিষ্টারগণ ও রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি ইহাতে নিয়মিতভাবে লিখিতে লাগিলেন। "বন্দেমাতরমে" শ্রীঅরবিন্দ প্রথমে "জাতীয়তাবাদীর আদর্শ" প্রবন্ধ লিখিলেন। কংগ্রেস ও মডারেট পার্টির সমালোচনা করিয়া তিনি লিখিলেন "আমরা চাই অখণ্ড ভারতে অখণ্ড স্বাধীনতা"—"We want absolute auotnomy free from British control." ভারতের সর্ব্বত্র শিক্ষিত সমাজের মধ্যে চাঞ্চল্য ও সাড়া পড়িয়া গেল। এখন শ্রীঅরবিন্দ,

ব্রহ্মবান্ধব, বিপিনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শ্যামসুন্দর হইলেন গরম দলের কর্ত্তা এবং ইহাদের মুখপাত্ররূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন বিপিনচন্দ্র পাল। তখন গরম দল খুব গরম গরম কথা বলিতে লাগিলেন। তখন নরম দল বিপিনবাবুর দলকে বাদ দিয়া রাষ্ট্রগুরুকে সভাপতি করিয়া সভা করিতে লাগিলেন আর গরম দল বিপিনবাবুকে সভাপতি করিয়া সভা করিতে আরম্ভ করিলেন। রাষ্ট্রগুরুর সমকক্ষ হইতে পারে এমন ইংরাজি বক্তা এক বিপিনবাবু ছাড়া বাংলা দেশে আর কেহই ছিল না। রাষ্ট্রগুরুর গলা বিপিনবাবু অপেক্ষা চড়া ছিল কিন্তু বাক্য শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার শেষ কথাটির স্বর পড়িয়া যাইত। ৫০ হাজার লোক রাষ্ট্রগুরুর গলা সুস্পষ্ট শুনিতে পাইত। বিপিনবাবুর কণ্ঠস্বর প্রথমে ক্ষীণ হইয়া পরে প্রায় রাষ্ট্রগুরুর মত উচ্চগ্রামে উঠিত। অধিকন্তু বিপিনবাবু বাংলা ভাষায় ইংরাজির মতন সমান বর্ত্তৃতা দিতে পারিতেন। একই দিনে এই দুই নেতার সভাপতিত্বে সভার অনুষ্ঠান হইলে একত্রে দুইটি সভায় যোগ দিবার ইচ্ছা সকলেরই হইত। কোন দিন উভয় দল একত্রিত হইয়াই সভা করিতেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, গিষ্পতি কাব্যতীর্থ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র, শ্রীঅরবিন্দ, লিয়াকৎ হোসেন, শ্যামসুন্দর, কৃষ্ণকুমার মিত্র, কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সুরেন্দ্রনাথ সেন, শচীন বসু (যুবক বক্তা) প্রভৃতি যেদিন সকলেই সভায় সমবেত হইতেন, সেইদিন সভায় স্থান সঙ্কুলান হইত না।

এদিকে পূর্ব্ববঙ্গে সভা সমিতি দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া পূর্ব্ববঙ্গের ছোটলাট ব্যোনফিল্ড ফুলার ঢাকার নবাব সলিমুল্লার সাহায্যে স্বদেশী আন্দোলন বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তখন মুসলমানেরা "বন্দেমাতরম" ধ্বনি শ্রবণ-মাত্র ক্ষিপ্ত হইয়া হিন্দু ছেলেদের আক্রমণ করিতে সুরু করিল। পরিশেষে হিন্দুর দেবদেবীর মন্দির চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে লাগিল। তখন শ্রীঅরবিন্দ লিখিলেন—"হে বাংলার পদলেহনকারী কৃতদাসেরা, যদি তোমাদের দক্ষিণ বাহুতে শক্তি না থাকে তাহা হইলে তোমরা তোমাদের স্ত্রীর ইজ্জত ও সন্তানের জীবন রক্ষা করিতে পারিবে না।" মহারাষ্ট্র তিলক পুণার "কেশরী" পত্রিকায় লিখিলেন "রক্ত গঙ্গা না বহাইয়া হিন্দুরা তাহাদের প্রতিমা ভাঙিতে দিল ?" ইত্যাদি। তখন পূর্ব্ববঙ্গে পুলিনদাসের নেতৃত্বে হিন্দুর ছেলেরা লাঠির আশ্রয় লইল। ঘোরতর দাঙ্গা উপস্থিত হইল। হিন্দু যুবকেরা সর্ব্বত্র জয়লাভ করিতে লাগিল। সলিমুল্লার সহস্র চেষ্টায় ছত্রভঙ্গ ও বিপর্য্যস্ত মুসলমানদের সমাবেশ অসাধ্য হইল।

১৯০৬ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কলিকাতার অধিবেশনে গরম দলের প্রধানেরা মহারাষ্ট্র তিলককেই সভাপতি নির্ব্বাচিত করিলেন। ইঁহাদের ভোট

বেশী হওয়া সত্বেও তিলক মহারাজ জেল খাটিয়াছেন এই অজুহাতে মডারেট পার্টির সকলেই ভয় পাইয়া ইহার বিরোধিতা করিল। ফলে মডারেটদের জয় হইল। মহারাষ্ট্র তিলককে সভাপতি করা হইল না। গরম দল আরও গরম হইয়া পড়িলেন। বৃদ্ধ দাদাভাই নৌরজীকে এই সভার সভাপতি করিবার জন্য বিলাত হইতে আনা হইল। এই কংগ্রেসে Boycott of British goods পাশ হইল এবং "স্বরাজের" দাবী স্বীকৃত হইল।

বিপ্লবের সূচনা

১৯০৬ সালে কংগ্রেস বসিবার পূর্ব্বেই বিপ্লববাদীবা মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। "যুগান্তরের" রক্ত ধ্বজার তলে হাজার হাজার সৈনিক আসিয়া সমবেত হইতে আরম্ভ কবিল। দুই চারিটি বন্দুক, ছোরা ও তলোয়ার শিক্ষা করা এবং কলিকাতার অনুশীলন সমিতিতে ভর্ত্তি হওয়া ছাড়া বিপ্লববাদীদের আর কোন কাজ রহিল না। এই সময় চন্দননগরে মতিলাল রায়, চারুচন্দ্র রায়, চন্দননগরের শিক্ষক উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল প্রভৃতি অনেকে বিপ্লববাদী হইয়া উঠিলেন। উপেন্দ্রনাথ "বন্দেমাতরম্" পত্রিকায় একটি ইংরাজি প্রবন্ধ পাঠাইলেন। তাহা পাঠ করিয়া শ্রীঅরবিন্দ শ্যামবাবুকে বলিলেন "এখনি এই ছেলেটীকে খবর দিন বন্দেমাতরমের সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দিবার জন্য।" শ্যামসুন্দরবাবু উপেন্দ্রনাথকে শ্রীঅরবিন্দের সহিত দেখা করিতে লিখিলেন। উপেন্দ্রনাথ আসিলেন। শ্রীঅরবিন্দ উপেন্দ্রনাথকে পাইয়া খুব আনন্দিত হইলেন। তিনি শ্যামসুন্দরবাবুকে বলিলেন "এরূপ সূক্ষ্ম বিচার বুদ্ধি বাঙ্গালীর মধ্যে দেখিতে পাই না, আর এই ছেলেটি স্কুল মাষ্টারি করিয়া এত বুদ্ধি ধরে!" তাহার পর শ্রীঅরবিন্দ উপেন্দ্রের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে অবগত হইলেন যে ছাত্রদিগের মধ্যে বিপ্লবের বীজ ছড়াইয়া দিবার জন্যই তিনি এবং তাঁহার বন্ধু হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল শিক্ষকতা আরম্ভ করিয়াছেন। এই সময়ে বরিশালের মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা কলিকাতায় আসিয়া "নবশক্তি" নামে আর একখানি নূতন সংবাদ পত্র গরমদলের প্রচার কার্য্য চালাইবার জন্য বাহির করিলেন।

এখন হইতে বাংলার বিপ্লবী সংখ্যা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। বিপ্লবের জন্য সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি দুই একজন উচ্চ শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বংশের যুবক বহু অর্থ দিতে আরম্ভ করিলেন কিন্তু তখন কাজ সেইরূপ অগ্রসর হইল না। তখন হেমচন্দ্র দাস মেদিনীপুর হইতে বারীনবাবুর সহিত যোগ দিলেন। হেমবাবু বোমা প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করিবার জন্য ও অস্ত্র সংগ্রহের জন্য ফ্রান্সে গমন করিলেন। তখন ইহা স্থির হইল যে এখন হইতে বারীনবাবু যুগান্তরের লেখা

ছাড়িয়া যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য অন্যত্র নিযুক্ত থাকিবেন। ইহার জন্য উপেন্দ্রনাথকে 'বন্দেমাতরম্' হইতে 'যুগান্তরে' আসিতে হইল এবং চন্দননগর হইতে পণ্ডিত হৃষিকেশ কাঞ্জিলালকে আনা হইল।

তখন হইতে বারীন্দ্রকুমার রিভলবার ও বন্দুক সংগ্রহের চিন্তা ও চেষ্টায় মনোনিবেশ করিলেন। যে সকল যুবকগণ মরণপণ করিয়া সমিতিতে যোগদান করিতেন, বারীনবাবু কেবল তাঁহাদেরই বন্দুক চালনা শিক্ষা দিতেন, বাকী সকলকে লাঠিখেলা শিক্ষা করিতে অনুশীলন সমিতিতে পাঠাইতেন। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন অক্‌সফোর্ডের গ্রাডুয়েট্। বারীনবাবু তাঁহার দ্বারায় ইংরাজি বিপ্লববাদের পুস্তকগুলি অনুবাদ করাইয়া যুবকগণকে পড়াইতে লাগিলেন। আর অল্পবয়স্কদের ন্যাশন্যাল কলেজে ভর্ত্তি করিয়া তাহাদের শিক্ষিত করিয়া গড়িয়া তুলিতে আরম্ভ করিলেন।

বীরযুবক উল্লাসকর দত্ত ১৯০৫ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ ছাড়িয়া বোম্বে টেক্‌সটাইল স্কুলে পড়িতে যান। বাংলার এই আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে সে সংবাদও তিনি রাখিয়াছিলেন। তিনি ১৯০৬ সালে বোম্বে হইতে কলিকাতায় আসিয়া বারীনবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং বিপ্লবীদের দলে যোগদান করিলেন। বন্দুক ছোড়া শিক্ষা করিয়াই তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। হেমবাবুর ফ্রান্স হইতে ফিরিয়া আসা অবধি তিনি ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না। তিনি নিজ জীবন তুচ্ছ করিয়া সকল রকম বিস্ফোরক দ্রব্য লইয়া পরীক্ষা কার্য্য চালাইলেন। যেহেতু তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র ছিলেন এবং তাঁহার সহপাঠী রাসবিহারী বসুও তখন ঐ কলেজে পড়িতেছে, সেই হেতু তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়নাগারের অনেক সাহায্য পাইলেন। এইরূপ পরীক্ষা করিতে করিতে তিনি বোমা আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। পরবর্ত্তী কালে হেমচন্দ্র দাসের ফ্রান্স হইতে আনীত ফরমূলা দৃষ্টান্তে নির্ম্মিত বোমা অপেক্ষা উল্লাসকরের বোমা শক্তিমান বলিয়া প্রকাশ্য আদালতে প্রমাণিত হইয়াছিল।

উল্লাসকরের বোমা পরীক্ষা করিবার জন্য বারীনবাবু, উপেনবাবু, অবিনাশবাবু এবং উল্লাসকর এবং তাঁহার সহকর্ম্মী প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তীকে লইয়া দেওঘরে রোহিণী পাহাড়ে গমন করিলেন। সেখানে প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী বোমাটি নিক্ষেপ করিবার ভার গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার নিকটে রহিলেন উল্লাসকর। বারীনবাবু, উপেনবাবু ও অবিনাশবাবু কিয়দ্দূরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বোমাটি দড়ির সাহায্যে পাহাড়ের নীচের দিকে অনেক দূরে নিক্ষেপ করা হইল কিন্তু ইহা ফাটিয়া সেখানকার পাহাড় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া প্রবলবেগে ঊর্দ্ধদিকে উৎক্ষিপ্ত হইল এবং প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তীকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া তাঁহার উপর আসিয়া পড়িল।

ইহাতে উল্লাসকরও গুরুতর আহত হইলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে কাজেই ইহারা প্রফুল্ল চক্রবর্তীর শবদেহ সেখানে রাখিয়া উল্লাসকরকে শুশ্রূষা করিবার জন্য তাঁহাকে কাঁধে করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসেন। উল্লাসকর অল্পদিনের মধ্যে আরোগ্য লাভ করিলেন। ইহার পর তাঁহার উৎসাহ আরও বাড়িল। এখন তিনি অধিক পরিমাণে বোমা প্রস্তুত করিতে মনোনিবেশ করিলেন। বোমার উপাদান দেশ বিদেশ হইতে সংগৃহীত হইতে লাগিল। এই উপাদান সংগ্রহ করা যুবকদের একটা প্রধান কার্য্যে পরিণত হইল। শহীদ সত্যেন্দ্রনাথ বসুর দাদা শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু এ বিষয়ে সকলকে উৎসাহিত করিতেন।

এই বোমা তৈয়ার করিবার জন্য মানিকতলার একটি বাগান স্থির হইল। সেখানে উল্লাসকরের দ্বারায় বারীনবাবু অল্পই বোমা তৈয়ার করাইতে লাগিলেন। কিন্তু ভয় হইল যদি ছদ্মবেশে পুলিশের লোক এই দলে যোগ দেয়। তখন উপেন্দ্রনাথকে যুগান্তর অফিস হইতে মানিকতলার বাগানের একজন সন্ন্যাসী করিয়া আনা হইল। উপেন্দ্রনাথ নিজে ছিলেন বুদ্ধিমান ও লোক-চরিত্র বিশেষজ্ঞ। তিনি নূতন ছেলেদের প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়া লইতেন। তাহার পর তাহাদের শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা পড়াইয়া তাহাদিগকে সাহসী ও মৃত্যুঞ্জয়ী করিয়া তুলিতেন। বাহিরের সকলেই জানিত এই বাগানের প্রতিষ্ঠানটি একটি মঠ এবং উপেন্দ্রনাথ উহার অধ্যক্ষ। বাহিরের লোকেও উপেন্দ্রনাথের ধর্ম্মালোচনা শ্রবণ করিবার জন্য এই মঠে আসিয়া সমবেত হইতেন। প্রতিদিন বৈকালে এই সাধুটির নিকট বহুলোকের সমাগত হইত। উপেন্দ্রবাবু তাঁহার বাল্যবন্ধু হৃষিকেশ কাঞ্জিলালকে প্রধান শিষ্যরূপে ঐ মঠে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। পণ্ডিত হৃষীকেশ ভক্ত গরুড় সাজিয়া যেরূপ আন্তরিকতার সহিত গুরুর ব্যাখার উপর টিকা টিপ্পনী কাটিতেন তাহাতে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে কে বড় সাধু এই লইয়া অনেক সময় তর্ক ও সমালোচনা চলিত। কেহ কেহ বলিতেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব অপেক্ষা বিবেকানন্দ শ্রেষ্ঠ আবার প্রতিপক্ষ তখনই তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিত রামকৃষ্ণের আবিভাব না হইলে বিবেকানন্দকে কে চিনিত। বাহিরে যখন এইরূপ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সমালোচনা চলিত তখন অন্দরে বিপ্লবীদের কার্য্য অব্যাহত গতিতে চলিত, পুলিশের কোনরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইত না।

রাসবিহারী বসু যখন তৃতীয় বার্ষিকী শ্রেণীর ছাত্র সেই সময় উল্লাসকর রাসবিহারীবাবুকে সঙ্গে লইয়া বারীনবাবুর নিকট উপস্থিত হন। উপেন্দ্রবাবু পূর্ব হইতেই রাসবিহারী সম্পর্কে অনেক কিছুই জানিতেন কাজেই তাহার আর পরীক্ষার প্রয়োজন হইল না। রাসবিহারী তখনই ঐ দলে যোগ দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ইহাতে বারীনবাবু তাহাকে বলিলেন "তোমার বন্ধু উল্লাসকর

মরণ পাগল; এজন্য তাহার এখনই মরা প্রয়োজন, কিন্তু তুমি লেখাপড়ায় যখন উপরের স্থান অধিকার করিতেছ, তখন তুমি একটু বেশী দিন পড়াশুনা কর, এবং তোমার দলের ছেলেদের বিপ্লবী করিয়া তোলো। আমাদের পর তোমার মত ছেলেদেরই নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।" রাসবিহারী এই কথা শুনিয়া পড়াশুনায় মনোনিবেশ করিলেন।

এই সময় বিপ্লবের ধূম উদ্গিরণ করিয়া গরম দলের সংবাদপত্রগুলি প্রকাশিত হইতেছিল। ইহার মধ্যে ইংরাজিতে "বন্দেমাতরম্" বাংলায় 'যুগান্তর,' 'সন্ধ্যা' ও "নবশক্তি"ই প্রধান। আপামর জনসাধারণের মধ্যে উত্তেজনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল বাংলার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা এই সকল কাগজ পড়িয়া মরিয়া হইয়া উঠিল। রাজরোষ যাইয়া যুগান্তর পত্রিকার উপর পড়িল। রাজদ্রোহ প্রচার করিবার অভিযোগে যুগান্তর সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও কর্ম্মকর্ত্তা এবং প্রেসের মালিক অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ধৃত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে আদালতে উপস্থিত করা হইল। চিফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট্ কিংসফোর্ডের এজ্‌লাসে বিচার আরম্ভ হইল। এই বিচার একটি স্মরণীয় ঘটনা। বিচারের দিন বিচারালয়ের প্রাঙ্গণ জনতায় পূর্ণ হইল। বিচার আরম্ভ হইবার বহুপূর্ব্বে সমস্ত যুবক-ব্যারিষ্টার ও উকিলে আদালত গৃহ পূর্ণ হইয়া গেল। বিনাপারিশ্রমিকে আসামী পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য এই সকল উকিল ব্যারিষ্টার ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। কিংসফোর্ড ইঁহাদের ১২৪ (ক) ধারায় ধৃত আসামী বলিয়া মত প্রকাশ করেন এবং আসামীদ্বয়কে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে বলিলেন। তখন ভূপেন্দ্রনাথ বলিলেন "**আমি দুঃখিনী জন্মভূমির জন্য যাহা কর্ত্তব্য বুঝিয়াছি তাহাই করিয়াছি, এক্ষণে তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পার।**" ইহাতে উপস্থিত সকলে নিরাশ হইয়া পড়িলেন। সকলেই অনুমান করিয়াছিলেন যে সম্পাদক মহাশয় অপরাধ স্বীকার না করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করিবেন। অগত্যা কিংস্‌ফোর্ড সাহেব ভূপেন্দ্রনাথকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাঁহাকে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। ইহাই হইল বাংলায় প্রথম রাজদ্রোহ মামলার শাস্তি (২০শে জুলাই, ১৯০৬ সাল)। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য আত্মপক্ষ সমর্থন করিলেন। অনেক নজির দেখাইবার পর বিচারে সাব্যস্ত হইল—"সংবাদ পত্রের মালিক ও কর্ম্মকর্ত্তা দায়ী নহেন, মুদ্রাকর ও সম্পাদকই দায়ী।" অবিনাশবাবু মুক্তি পাইলেন। ইহার কিছুকাল পরে পুনরায় যুগান্তর অফিসে পুলিশের হানা পড়িল। ঐ সময় পত্রিকার কর্ম্মকর্ত্তা উপস্থিত না থাকায় তাঁহার সহকারী, আড়বালিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র নাথ বসু পুলিসকে অফিসের ভিতর প্রবেশ করিতে দিলেন না। ইহার ফলে

পুলিসের সহিত মারপিট্ আরম্ভ হইয়া গেল। সেই মারপিঠে অবিনাশ বাবুর নিকট-সম্পর্কীয় দুই ভ্রাতা স্বর্ণেন্দু ভট্টাচার্য্য ও নরেন্দ্র ভট্টচার্য্য (মানবেন্দ্র রায়) ছিলেন। ইহারা মারামারির পর পলাইয়া গেলে কেবল মাত্র শৈলেন্দ্র ও বাহিরের একটী যুবক ধরা পড়িলেন। কিংস্‌ফোর্ড সাহেবের বিচারে শৈলেন্দ্রের তিন মাস ও অন্য যুবকটীর একমাস সশ্রম কারাদণ্ড হইল।

এই ঘটনার কিছুকাল পরে 'যুগান্তর' পুনরায় রাজদ্রোহ অপরাধে ধৃত হইল। এই সময় মুদ্রাকর শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্যের (ইনিও অবিনাশ বাবুর নিকট আত্মীয়) দুই বৎসর কারাদণ্ড হইল। ইহাঁরও বিচার চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটে কিংস্‌ফোর্ডের এজ্‌লাসে সম্পন্ন হইল।

ইহার পর "সন্ধ্যা" পত্রিকার প্রকাশিত "ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে" প্রবন্ধে ইংরাজরাজ রাজ-দ্রোহিতার গন্ধ পাইলেন। "সন্ধ্যা" সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও মুদ্রাকর ধৃত হইলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট্ কিংসফোর্ডের এজলাসে মাম্‌লার শুনানী আরম্ভ হইল। মাম্‌লার দিন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এক অভিনব ও অদ্ভুত পন্থায় বিচারালয়ে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার এইরূপে আদালত গমন সকলের আনন্দ, কৌতুক ও বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়াছিল। ব্রহ্মবান্ধব মুদ্রাকরকে মাল্য-চন্দনে ভূষিত করিয়া তাঁহাকে বর-বেশে সজ্জিত করাইলেন, আর স্বয়ং পুরোহিতের বেশে হাজার হাজার বরযাত্র সমবিব্যাহারে ও ঢাক-ঢোল ব্যাণ্ড বাদ্য সহকারে আদলতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার এই অপূর্ব্ব রসিকতায় আপামর জনসাধারণ কৌতুক বোধ করিলেন এবং হাজার হাজার লোক কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া আদালত প্রাঙ্গন জনাকীর্ণ করিয়া তুলিল। এই বরযাত্র দলের মধ্যে তৎকালীন প্রথা অনুযায়ী অবিরত বাদ্য নিনাদ হইতে লাগিল—ঘনঘন উলুধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। শাম্‌লা পরিহিত উকিল আম্‌লায় পরিপূর্ণ আদালত-প্রাঙ্গন মুহূর্ত্তের মধ্যে আনন্দমুখর রহস্যালাপ বাসর গৃহে পরিণত হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট্ কিংসফোর্ড সাহেব এই সমুদয় দর্শন করিয়া ভীষণ ক্রুদ্ধ হইলেন। একজন সামান্য ব্রাহ্মণের ধৃষ্টতা ও দুঃসাহস নিরীক্ষণ করিয়া তিনি ক্রোধে, ক্ষোভে দিশেহারা হইয়া পড়িলেন। তিনি তিক্ত কণ্ঠে ব্রহ্মবান্ধবকে শাসাইয়া বলিলেন যে তাঁহার এই রসিকতার জন্য তিনি উপযুক্ত শাস্তি পাইবেন। ইহাতে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সহাস্যে বলিলেন—"বেটা ফিরিঙ্গির সাধ্য কি ব্রাহ্মণকে শাস্তি দিতে পারে।"

সেদিন আর মাম্‌লা হইল না—কয়েকদিন পরে মাম্‌লার দিন পড়িল। ইত্যবসরে এক ঘটনা ঘটিয়া গেল। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের বাল্যকাল হইতে অন্ত্র-বৃদ্ধির রোগ ছিল। সহসা তাহা এইরূপ বৃদ্ধি পাইল যে অস্ত্রোপচার ভিন্ন গতি রহিল না। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়কে ক্যাম্বেল হাসপাতালে আনিয়া অস্ত্রোপচার করা হইল।

কিন্তু ব্রহ্মবান্ধব ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না—তিনি স্বর্গে গমন করিলেন। তাঁহার এই আকস্মিক মৃত্যুর সংবাদ কাগজে ছাপা হয় নাই, কোনরূপ বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় নাই, তথাপি লোকের মুখ হইতে এই সংবাদ অচিরেই শহরের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ যে ফিরিঙ্গিকে এরূপভাবে ফাঁকি দিতে পারিয়াছেন তাহা জানিতে পারিয়া দলে দলে হাজারে হাজারে লোক তাঁহার পার্থিব দেহখানির দর্শন আশায় হাসপাতাল প্রাঙ্গনে সমবেত হইতে লাগিল। ব্রহ্মবান্ধব সন্ন্যাসী ব্যক্তি ছিলেন তাঁহার কোন আত্মীয় স্বজন বা জ্ঞাতি কুটুম্ব ছিল না। কিন্তু তাঁহার শবাধার বহন করিয়া সহস্র সহস্র নাগরিক শোভাযাত্রা করিয়া নিমতলা ঘাট অভিমুখে অগ্রসর হইল। কলিকাতার রাজপথে সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য!...অগণিত নরনারীর সমাবেশ!...রাজপথের উভয় পার্শ্ব হইতে পুরললনাগণ শঙ্খধ্বনি করিয়া শবাধারের উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল। সেই বিরাট জনতার মধ্যে শবাধার স্পর্শ করিবার জন্য—তাহা একটিবার কাঁধে করিবার জন্য সে কি আলোড়ন! ইহার পূর্ব্বে কলিকাতার রাজপথে এতবড় শোভাযাত্রা আর কখনও হয় নাই। কেবল সম্রাট সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড যুবরাজ অবস্থায় যখন এদেশে আসিয়াছিলেন তখন তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য যে শোভাযাত্রা হইয়াছিল কেবল তাহারই সহিত ইহার তুলনা করা চলে। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত গিষ্পতি কাব্যতীর্থ, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এমন কি দেশপূজ্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি পর্য্যন্ত শবানুগমন করিলেন। সন্ন্যাসী ব্রহ্মবান্ধবের নশ্বর দেহখানি চিতায় স্থাপন করা হইলে অযুত কণ্ঠের "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করিল। ঘৃত ও চন্দন কাষ্ঠে দেহ ভস্মীভূত করা হইল। একঘণ্টার মধ্যে স্বদেশীযুগের সন্ন্যাসী ব্রাহ্মবান্ধবের নশ্বর দেহ বিলুপ্ত হইল। স্বদেশী যুগের সন্ন্যাসীকে বিদায় গ্রহণ করিতে দেখিয়া স্বদেশীযুগের ঋষি শ্রীঅরবিন্দ, দার্শনিক বিপিনচন্দ্র পাল, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি মনীষীরাও এইরূপ গৌরবময় শেষ বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের এইরূপ ভাবে ধরাধাম হইতে বিদায় গ্রহণের স্মৃতি চিরকাল বাঙ্গালীর মনে জাগরূক থাকিবে।

ইহার পর "সন্ধ্যার" মামলার নির্দ্ধারিত দিনে বিচারক কিংস্‌ফোর্ড ব্রহ্মবান্ধবের নামে মামলা প্রত্যাহার করিয়া লইলেন। কেবল সন্ধ্যার মুদ্রাকরকে দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। তাহার পর আদালতে "বন্দেমাতরম্" পত্রিকার মামলা উঠিল। ঋষি শ্রীঅরবিন্দ আসামীর কাঠগড়ায়

দণ্ডায়মান হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার উত্তেজিত যুবক আসিয়া আদালত গৃহ পূর্ণ করিয়া ফেলিল। চিত্তরঞ্জন দাস প্রভৃতি উদীয়মান তরুণ ব্যারিষ্টারগণ ছুটিয়া আসিলেন ঋষি অরবিন্দকে বাঁচাইবার জন্য। কিংস্‌ফোর্ডের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ অবিচলিত ধীর অথচ গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"If to announce freedom is a crime, then I am the first criminal". এই উক্তিতে উপস্থিত সকলেই প্রমাদ গণিলেন। তখন ব্যারিষ্টারগণ আইনের কূটনৈতিক প্রয়োগের আশ্রয় লইলেন। তাঁহারা দাবী জানাইলেন যে "প্রমাণ করিতে হইবে রাজদ্রোহ মূলক প্রবন্ধটি শ্রীঅরবিন্দের লেখা।" তখন বিচারক কিংস্‌ফোর্ড উক্তি করিলেন—"শ্রীঅরবিন্দ ব্যতীত এইরূপ সুললিত ও সাবলীল ভঙ্গীতে ইংরাজি ভাষায় কোন ভারতবাসী লিখিতে পারে ইহা আমি বিশ্বাস করিতে পারি না।" তখন ব্যরিষ্টারগণ প্রতিবাদ করিয়া জানাইলেন—"বিশ্বাস অবিশ্বাসের উপর কোন মামলা চলিতে পারে না।" অগত্যা "বন্দেমাতরম্" পত্রিকার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্রপালকে সাক্ষ্য ডাকা হইল। বিপিনচন্দ্র পাল আসিয়া দৃঢ়কণ্ঠে আদালতকে জানাইয়া দিলেন—"শ্রীঅরবিন্দের শাস্তি হওয়া অপেক্ষা আমার শাস্তি হউক, আমি আদালতে কোন সাক্ষী দিব না।" তখন আদালত অবমাননার জন্য বিপিনচন্দ্র পালের ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইল। শ্রীঅরবিন্দ বেকসুর খালাস পাইলেন। কেবল মুদ্রাকর মনোমোহন ঘোষের দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইল। শ্রীঅরবিন্দের বিচার আরম্ভ হইলে কবিগুরু **রবীন্দ্রনাথ** তাঁহার পুত্রাধিক স্নেহের অধিকারী **অরবিন্দকে** নমস্কার জানাইলেন:—

নমস্কার

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।
হে বন্ধু, হে দেশ-বন্ধু, স্বদেশ আত্মার
বাণী-মূর্ত্তি তুমি। তোমা লাগি' নহে মান,
নহে ধন, নহে সুখ; কোনো ক্ষুদ্র দান
চাই নাই কোনো ক্ষুদ্র কৃপা; ভিক্ষা লাগি'
বাড়াওনি আতুর অঞ্জলি। আছ জাগি'
পরিপূর্ণতার তরে সর্ব্ববাধাহীন,—
যার লাগি' নর-দেব চির রাত্রি দিন
তপোমগ্ন; যার লাগি' কবি বজ্ররবে
গেয়েছেন মহাগীত, মহাবীর সবে

গিয়াছেন-সংকট যাত্রায় ; যার কাছে
আরাম লজ্জিত শির নত করিয়াছে ;
মৃত্যু ভুলিয়াছে ভয় ;—সেই বিধাতার
শ্রেষ্ঠ দান আপনার পূর্ণ অধিকার—
চেয়েছ দেশের হয়ে অকুণ্ঠ আশায়,
সত্যের গৌরব-দৃপ্ত প্রদীপ্ত ভাষায়
অখণ্ড বিশ্বাসে। তোমার প্রার্থনা আজি
বিধাতা কি শুনেছেন। তাই উঠে বাজি'
জয় শঙ্খ তাঁর ? তোমার দক্ষিণ করে
তাই কি দিলেন আজি কঠোর আদরে
দুঃখের দারুণ দীপ, আলোক যাহার
জ্বলিয়াছে, বিদ্ধ করি' দেশের আঁধার
ধ্রুব তারকার মতো। জয় তব জয়।
কে আজি ফেলিবে অশ্রু, কে করিবে ভয়,
সত্যেরে করিবে খর্ব কোন্ কাপুরুষ
নিজেরে করিতে রক্ষা। কোন্ অমানুষ
তোমার বেদনা হতে না পাইবে বল।
মোছ্ রে, দুর্বল চক্ষু, মোছ্ অশ্রুজল,
দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে
সেই রুদ্র দূতে, বলো, কোন্ রাজা কবে
পারে শাস্তি দিতে। বন্ধন শৃঙ্খল তার
চরণ বন্দনা করি' করে নমস্কার—
কারাগার করে অভ্যর্থনা। রুষ্ট রাহু
বিধাতার সূর্য্যপানে বাড়াইয়া বাহু
আপনি বিলুপ্ত হয় মুহূর্ত্তেক পরে
ছায়ার মতন। শাস্তি ? শাস্তি তারি তরে
যে পারে না শাস্তি ভয়ে হইতে বাহির
লঙ্ঘিয়া নিজের গড়া মিথ্যার প্রাচীর,
কপট বেষ্টন ; যে নপুংস কোনোদিন
চাহিয়া ধর্মের পানে নির্ভীক স্বাধীন
অন্যায়েরে বলেনি অন্যায় ; আপনার
মনুষ্যত্ব, বিধিদত্ত নিত্য অধিকার

যে নির্লজ্জ ভয়ে লোভে করে অস্বীকার
সভামাঝে ; দুর্গতির করে অহংকার ;
দেশের দুর্দশা লয়ে যার ব্যবসায়,
অন্ন যার অকল্যাণ মাতৃরক্ত প্রায়,
সেই ভীরু নতশির, চিরশাস্তি তার
রাজকারা বাহিরিতে নিত্য কারাগার।
বন্ধন পীড়ন দুঃখ অসম্মান মাঝে
হেরিয়া তোমার মূর্তি, কর্ণে মোর বাজে
আত্মার বন্ধনহীন আনন্দের গান,
মহাতীর্থযাত্রীর সংগীত, চিরপ্রাণ
আশার উল্লাস, গম্ভীর নির্ভয় বাণী
উদার মৃত্যুর। ভারতের বীণা-পাণি
হে কবি, তোমার মুখে রাখি' দৃষ্টি তাঁর
তারে তারে দিয়াছেন বিপুল ঝংকার,—
নাহি তাহে দুঃখ তান, নাহি ক্ষুদ্র লাজ,
নাহি দৈন্য, নাহি ত্রাস। তাই শুনি আজ
কোথা হতে ঝঞ্ঝাসাথে সিন্ধুর গর্জন,
অন্ধবেগে নির্ঝরের উন্মত্ত নর্তন
পাষাণ পিঞ্জর টুটি',—বজ্রগর্জরব
ভেরিমন্দ্রে মেঘপুঞ্জ জাগায় ভৈরব
এ উদাত্ত সংগীতের তরঙ্গ মাঝার
অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।
তার পরে তাঁরে নমি যিনি ক্রীড়াচ্ছলে
গড়েন নূতন সৃষ্টি প্রলয় অনলে,
মৃত্যু হতে দেন প্রাণ, বিপদের বুকে
সম্পদেরে করেন লালন, হাসিমুখে
ভক্তেরে পাঠায়ে দেন কণ্টক কান্তারে
রিক্তহস্তে শত্রুমাঝে রাত্রি অন্ধকারে।
যিনি নানা কণ্ঠে কন্ নানা ইতিহাসে,
সকল মহৎ কর্মে পরম প্রয়াসে,
সকল চরমলাভে "দুঃখ কিছু নয়,
ক্ষত মিথ্যা, ক্ষতি মিথ্যা, মিথ্যা সর্ব ভয়,

কোথা মিথ্যা রাজা কোথা রাজদণ্ড তার ;
কোথা মৃত্যু, অন্যায়ের কোথা অত্যাচার,
ওরে ভীরু, ওরে মূঢ়, তোলো তোলো শির,
আমি আছি, তুমি আছ, সত্য আছে স্থির।"

৭ ভাদ্র, ১৩১৪।

বিপিনবাবুর কারাদণ্ডের আদেশ শুনিয়া যুবকের দল ক্ষেপিয়া উঠিল। তাহারা আদালত গৃহ ভাঙ্গিয়া তচ্‌নচ্‌ করিয়া ফেলিল। সুশীল সেন নামক একজন ১৫ বৎসর বয়স্ক বালক একজন পুলিশ সাহেবের ঘোড়ার উপর উঠিয়া সাহেবকে ঘুঁসি মারিল। ইহাতে বালক সুশীলের ১৫ ঘা বেত্রদণ্ডের আদেশ হইল। হাত-পা বাঁধিয়া সুশীলকে বেত্রাঘাত কবায় সুশীল অচৈতন্য হইয়া পড়ে। যুবকেরা ইহাতে আরও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। তাহারা এই ইংরাজ বিচারককে মারিবার জন্য তখনই মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করিল। এই ব্যাপারে ইংরাজ বিদ্বেষ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। বাংলার যুবকগণের মন বিষাইয়া তুলিল। ইহার পর হইতে প্রত্যহ রাজদ্রোহের মামলা চলিতে লাগিল।

বিপ্লব আরম্ভ

হেমচন্দ্র দাস ফ্রান্স হইতে উৎকৃষ্ট বোমা প্রস্তুত প্রণালী ও যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া বাংলায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। আসিবার সময় তিনি গোপনে অনেক যন্ত্রপাতি রিভলভার ও বন্দুক লইয়া আসিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে এখন হইতে অনুশীলন সমিতির যুবকগণও আসিয়া যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা আরম্ভ করিল। এই সময়েই বৈপ্লবিক কার্য্য সামান্য সামান্য করিয়া আরম্ভ হইল। নারায়ণগড়ে লেফটন্যাণ্ট গবর্ণর এনড্রু ফেজারের ট্রেণ উল্টাইবার চেষ্টা হইল। গোয়ালন্দে এ্যালেন সাহেবকে হত্যার চেষ্টা হইল। খড়্গপুরেও অনুরূপ চেষ্টা করা হইল কুষ্টিয়াতে হিগিনবোথাম সাহেবকে হত্যার চেষ্টা করা হইল কিন্তু কোন প্রচেষ্টাই তেমন ফলবতী হইল না। এই সময় গরমদলের নেতারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়া একযোগে সারা ভারতবর্ষে জোর স্বদেশী আন্দোলন চালাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শ্রীঅরবিন্দ ন্যাশানাল কলেজের অধ্যক্ষের কার্য্য ছাড়িয়া দিয়া সারা ভারতবর্ষে এই আন্দোলনকে কার্য্যকরী করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কলিকাতায় গণপতি ও শিবাজী উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন চলিতে লাগিল। মহারাষ্ট্র হইতে তিলক মহারাজ, নাগপুর হইতে ডাঃ মুঞ্জে, পাঞ্জাব হইতে লালা লাজপৎ রায় ও সর্দ্দার অজিত সিং প্রভৃতি দেশবরেণ্য নেতাগণ কলিকাতায় আমন্ত্রিত হইলেন। ইহারা

বিপ্লবের ঋষি ও নায়ক—

৺বালগঙ্গাধর তিলক

নূতন বাংলার স্রষ্টা—

স্বামী বিবেকানন্দ

কলিকাতায় আসিয়া সর্ব্বাগ্রে শ্রীঅরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার স্কুখান-সামালেনস্থিত বাসায় গমন করিলেন। তিলক মহারাজ আসিয়াছেন শুনিয়া শ্রীঅরবিন্দ আনন্দে আত্মহারা হইয়া তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আসিয়া তিলক মহারাজের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। তিলক মহারাজ একেবারে অরবিন্দকে কোলে উঠাইয়া লইয়া তাঁহার মস্তকে হস্ত বুলাইতে লাগিলেন। শ্রীঅরবিন্দকে দেখিয়া কি তাঁহার আনন্দ! শ্রীঅরবিন্দ তিলক মহারাজের ক্রোড় হইতে অবতরণ করিয়া পুনরায় তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। তারপর ডাঃ মুঞ্জে, লালা লাজপৎ রায়, অজিৎ সিং প্রভৃতিকে অভিবাদন করিলেন। তাঁহারা সকলেই অরবিন্দকে দেখিয়া এরূপ মোহিত হইলেন যে তাঁহাকে ছাড়িয়া কেহই উঠিতে চাহিলেন না। তাহারা সকলেই ইহার পূর্ব্বে অনেক শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবককে দেখিয়াছেন সত্য কিন্তু এমনটি তাঁহারা কখনও দেখেন নাই। অববিন্দকে অপূর্ব্ব অদ্ভুত বলিয়া তাহারা মনে করিতে লাগিলেন।

তাঁহারা সকলে মিলিয়া অরবিন্দকে নানারূপ উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীঅরবিন্দ মৃদু হাস্যের সহিত তাঁহাদের উপদেশগুলি ধীর মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তাহার পর তাঁহারা সকলে "বন্দেমাতরম্" অফিসে যাইয়া বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শিবাজী ও গণপতি উৎসব-সংক্রান্ত বিষয়ে নানারূপ আলোচনা করিলেন। অতঃপর তাঁহারা রাষ্ট্রগুরু শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে মডারেট্ মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করিবার পরামর্শ দিলেন। এই সময় সকলে বন্দেমাতরম পত্রিকার ফাইল হইতে ভাল ভাল প্রবন্ধ পড়িতে লাগিলেন। একটী প্রবন্ধের জন্য সকলে প্রশংসা করিলে শ্রীঅরবিন্দ বলিলেন—"এটা আমার নিজের লেখা নহে, ওটী ইহারই (অর্থাৎ শ্যামসুন্দরেরই)। তখন নেতারা শ্যামবাবুর সহিত পরিচিত হইয়া শ্যামবাবুকেও স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন এবং তাহাকে খুব উৎসাহিত করিলেন।

অতঃপর শিবাজী ও গণপতি উৎসব নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গেল। ইহাতে বাংলার তরুণদের প্রাণে আর এক নূতন প্রেরণা আসিল। তখন "যুগান্তর" পত্রিকায় বিপ্লব প্রচারের বাণী প্রকাশিত হইতে লাগিল। ঘরে ঘরে বিপ্লববাদের কার্য্য সুরু করিবার সঘনে আহ্বান আসিতে লাগিল। সুদূর পল্লীর প্রতিটি নিভৃত নীড়ে বিপ্লব বহ্নি ধূমায়িত হইয়া উঠিল। গদ্যে, পদ্যে, ছড়ায় বিপ্লবাত্মক কথা বাহির হইতে লাগিল। "যুগান্তর" পত্রিকা লিখিল—"সেদিনের তরে করলি কি? যেদিন আসবে আহ্বান, ওরে সন্তান, চাইবে মা পূজার বলি। পথ ঘাট সব রাখিস চিনে, বলির পাঁঠা রাখিস গুনে, হাঁক ফাঁক করে মরতে যেন হয়

নারে সেদিন! ওরে লুট তরাজে নানান কাজে শক্ত করিস বুক, নইলে কাঁপবে যে হাত, হবি চিৎপাৎ, ধরিলে বন্দুক।”

এই যুগেই চতুর্দ্দিকে ডাকাতির হিড়িক্ পড়িয়া গেল। বিপ্লবীদের কর্ম্মপন্থা এই লুণ্ঠনের পথ অবলম্বন করিল। বিরাট বিপ্লবীশক্তিকে সংহত করিয়া চালাইতে হইলে অর্থের প্রয়োজন কাজেই সরকারের সম্পদ লুণ্ঠন করা বিপ্লবীদের একটি পবিত্র কর্ত্তব্যে পরিণত হইল। প্রথমে ডাকাতি হইল চাংড়িপোতার ষ্টেশন ঘরে। এই ডাকাতির অনুষ্ঠান করেন শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ও কোদালিয়া নিবাসী হরিকুমার চক্রবর্ত্তী। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য তখন ন্যাশান্যাল কলেজে এফ্, এ ক্লাসের ছাত্র। তিনি আবার শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের নিকট সম্পর্কে ছোট ভাই। এই নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যই পরে ইউরোপ ও রাশিয়ায় গমন করিয়া মানবেন্দ্র রায় নামে পরিচিত হন। দেখিতে দেখিতে বাংলার সর্ব্বত্র ছোট বড় ডাকাতি সুরু হইয়া গেল। গভর্ণমেন্ট এই বিপ্লববাদীদের কার্য্যে সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। এই সকল বিপ্লববাদীদের সংবাদ গভর্ণমেন্ট সংগ্রহ করিতে লাগিলেন—তাহাদের উপর নজর রাখিতে লাগিলেন। মিটিং, বক্তৃতা, “বন্দেমাতরম্” ধ্বনি যাহাতে বন্ধ হয় তাহার চেষ্টা পূর্ণ উদ্যমে চলিতে লাগিল। আর প্রায় প্রত্যেক দিনই জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলির সম্পাদক মুদ্রাকর কেহ না কেহ জেলে যাইতে লাগিলেন। এই সময় কলিকাতায় অর্দ্ধোদয় যোগে বিপ্লবপন্থী যুবকদের লইয়া প্রথম ভলান্টিয়ার দল গঠন হয়। সে সময় যুবকেরা এমন শৃঙ্খলার সহিত কাজ করিয়াছিল যাহাতে শত্রুপক্ষেরা ভীত হইলেও ইহাদের শতমুখে প্রশংসা করিয়াছিল।

বিপ্লববাদীদের কংগ্রেস দখল করিবার চেষ্টা

১৯০৭ সালের ডিসেম্বরে সুরাটে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের আয়োজন চলিতে লাগিল। ভারতের সকল প্রদেশের গরম দলের নেতারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী উকীল শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষকে এই অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচন করিলেন। কিন্তু গরমদলের সকলেই মহারাষ্ট্র তিলক বালগঙ্গাধর তিলক্‌কে সভাপতি নির্ব্বাচন করিলেন। তখন বাংলা দেশ ও মহারাষ্ট্রে রাজনৈতিক গণচেতনা সম্যগ্‌রূপে জাগরিত হইয়াছিল কিন্তু পাঞ্জাব প্রভৃতি দেশে তখন সবেমাত্র ঐ চেতনা জাগ্রত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে সমগ্র ভারতের শিক্ষিতব্যক্তিরা বালগঙ্গাধর তিলককে অন্তরের সহিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিলেও তিনি বিপ্লবী বলিয়া তাঁহাকে সভাপতি করিতে নরম দল স্বীকৃত হইল না। তখন মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবের অধিবাসীরা দলে দলে ডেলিগেট লইয়া

সুরাটে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। বাংলা হইতেও ডেলিগেটদল গমন করিলেন। তাঁহাদের নেতৃত্ব করিলেন শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী। সুরাটে এই ডেলিগেটগণ সভাপতি নির্ব্বাচনের বৈধতার প্রশ্ন উঠাইয়া উপস্থিত ডেলিগেট্‌দের ভোটে সভাপতি নির্ব্বাচন কবিতে দাবী করিলেন। ইহাতে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ক্রুদ্ধ হইলেন। তখন গরমপন্থীরা উপস্থিত ভোটের জোরে তিলককে সভাপাতি করিলেন। মহারাষ্ট্র তিলক সভাভতির অভিভাষণের প্রারম্ভেই বলিলেন "We want absolute autonomy free from British control." মডারেট্ দল ইহাতে আশঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। গরমদলকে সভা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার জন্য পুলিশের আশ্রয় লইলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ মারপিট্ সুরু হইয়া গেল। উপস্থিত সভ্যেরা চেয়ার ছোড়াছুড়ি করিয়া মারামারি করিতে লাগিলেন। মডারেটগণ প্রাণ লইয়া পলাইতে লাগিলেন। তিলকের অভিভাষণ শেষ হইবার পূর্ব্বেই পুলিশ আসিয়া সকলকে সভামণ্ডপ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিল। সুরাটের কংগ্রেস দক্ষ-যজ্ঞে পরিণত হইল।

কংগ্রেস শেষ হইলেই শ্রীঅরবিন্দ স্বাধীনতার প্রচারকার্য্য চালাইবার জন্য বোম্বাই, পুণা ও ভারতের অন্যান্য স্থানে গমন করিলেন। তখন সারা ভারতে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। শ্রীঅরবিন্দের জাতীয়তাবাদের স্বরূপ সকলের মর্ম্ম স্পর্শ করিতে লাগিল। এই প্রচারকার্য্যের ফলে মডারেট্‌গণ একঘরে হইয়া 'কোণঠাসা' হইয়া পড়িলেন। তখন চরমপন্থীদলের মুখপাত্র হইলেন লালা লাজপত রায়, বালাগঙ্গাধর তিলক ও শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল। এই লাল-বাল-পাল হইলেন সমগ্র ভারতের নেতা। পুণা, পাঞ্জাব এবং বাংলা তখন ভারতের স্বাধীনতার পুণ্যক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইল। ভারতবাসী মাত্রেই আশা করিলেন এইবার ভারত স্বাধীন হইবেই। শিখসৈন্য, মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য আর বাঙ্গালীর বুদ্ধি মিলিয়া ইংরাজকে এদেশ হইতে না তাড়াইয়া ছাড়িবে না।

বৈপ্লবিককার্য্য ও আলিপুর বোমার মামলা

১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার প্রচারকার্য্য শেষ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ইহার পর হইতে বিপ্লববাদীদের উৎসাহ ও সাহস আরও বাড়িয়া গেল। তাহার কারণ শ্রীঅরবিন্দ ভারতের সর্ব্বত্র বিপ্লবের সমর্থন পাইয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবীদের কার্য্য সুরু হইয়া গেল। শ্রীঅরবিন্দ আসিবার পূর্ব্বেই ছোটলাটের ট্রেণ উল্টাইয়া দিবার জন্য উল্লাসকর প্রেরিত হইয়াছিল। ট্রেণের একখানি গাড়ী লাইনচ্যুত হইল কিন্তু লাটসাহেবের গাড়ীর কিছুই হয় নাই। ইহার পর ঢাকায় ম্যাজিষ্ট্রেট এলেনকে গোয়ালন্দের মরিবার

চেষ্টা করা হয়। তাহার পর কুষ্ঠিয়ায় এক পাদ্রীকে গুলি করিয়া হত্যা করা হইল। শ্রীঅরবিন্দ বাংলায় ফিরিবার পর চন্দননগরের মেয়রের ঘরে বোমা নিক্ষেপ করা হইল। এই সময় হইতেই বিপ্লবকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল। সর্ব্বত্র পুলিশের চর ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই বিপ্লবী যুবকদের সন্ধান লইয়া ফিরিতে লাগিল। কলিকাতার চিফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট্ কিংফোর্ড সাহেব বিপ্লবীদের প্রতি তাঁহার তথাকথিত উদার মনোভাবের জন্য ইংরাজ-রাজের অনুগ্রহ লাভ করিলেন। তাঁহার পদোন্নতি হইল। তিনি মজঃফরপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট্ হইয়া গেলেন। কিন্তু বিপ্লবীদল তাঁহাকে ভুলিতে পারিল না। বারীন্দ্র, উপেন্দ্র, হেমচন্দ্র প্রভৃতি বিপ্লবী নেতারা মজঃফরপুরে যাইয়া কিংসফোর্ডকে মারিবার জন্য প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। নরেন্দ্র গোঁসাই স্বীকৃত হইয়া পিতা ও স্ত্রীপুত্রকে দেখিবার জন্য গৃহে গমন করিলেন। কিন্তু গৃহে গিয়া ধনী পিতার একমাত্র সন্তান নরেন্দ্র গোঁসাই স্ত্রীপুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া আপন প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হইলেন। তিনি আর কলিকাতায় ফিরিলেন না। তখন এই কার্য্যের ভার পড়িল শ্রীযুক্ত ক্ষুদীরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকীর উপর। ক্ষুদীরামের বয়স তখন মাত্র ১৮ বৎসর তিনি ন্যাসান্যাল কলেজে অধ্যয়ন করেন, আর প্রফুল্ল চাকীর বয়স ১৬ বৎসর তিনি রংপুর ন্যাশান্যাল স্কুল ছাড়িয়া সবেমাত্র কলিকাতার ন্যাশান্যাল কলেজে প্রবেশ করিয়াছেন। এই দুইজন বীর কিশোর বিপ্লবী, এই দুঃসাহসিক কার্য্যের ভার পাইলেন। হেমচন্দ্র দাস মহাশয়ের উপদেশমত ও শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ মহাশয়ের কর্ম্মপদ্ধতি অনুযায়ী তাঁহারা উভয়ে একটি করিয়া বোমা ও একটি করিয়া রিভলবার লইয়া মজঃফরপুর যাত্রা করিলেন। এই বোমার দ্বারায় কিংসফোর্ডকে হত্যা করিবেন স্থির হইল। আর রিভলবার রহিল তাঁহাদের আত্মরক্ষার অস্ত্র হিসাবে, এবং ইহাও নির্দ্দেশ দেওয়া হইল যে আত্মরক্ষা যদি অসম্ভব হইয়া পড়ে তখন ঐ রিভলবার দিয়া আত্মহত্যা করিতে হইবে জীবন্ত অবস্থায় পুলিশের হাতে ধরা দেওয়া চলিবে না।

মজঃফরপুরে আসিয়া কিশোর ক্ষুদীরাম ও প্রফুল্ল একটি হোটেলে অবস্থান করিয়া স্বকার্য্য সিদ্ধির সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। তাঁহারা কিংস্‌ফোর্ড সাহেবের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য করিয়া জানিতে পারিলেন যে সাহেব প্রতিদিন একটি ঘোড়ার গাড়ী করিয়া বৈকালে বেড়াইতে বাহির হন এবং রাত্রি ৮॥০ ঘটিকার সময় তাঁহার বাংলোতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইহার পর তাঁহারা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইলেন। একদিন সন্ধ্যা হইতে তাঁহারা কিংস্‌ফোর্ডের প্রত্যাবর্ত্তনের পথের ধারে আত্মগোপন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। স্থির হইল প্রথমে প্রফুল্ল চাকী ছুটিয়া গিয়া বোমা নিক্ষেপ করিবেন। যথাসময়ে ঘোড়ার গাড়ী তাঁহাদের নিকট দিয়া

অতিক্রম করিতে লাগিল। অন্ধকারের মধ্যে তাঁহারা অস্পষ্ট ভাবে দেখিলেন যেন কিংস্‌ফোর্ড বসিয়া আছেন। আর বিলম্ব নয়! প্রফুল্ল ছুটিয়া আসিয়া বোমা নিক্ষেপ করিলেন। প্রবল বিস্ফোরণের শব্দ করিয়া বোমা ফাটিয়া গেল চকিতের মধ্যে গাড়ীখানি শূন্যে উত্থিত হইয়া মাটিতে পড়িয়া ভগ্নস্তূপে পরিণত হইল। ক্ষুদীরাম ও প্রফুল্ল চাকী সেখানে আর ক্ষণমাত্র অপেক্ষা না করিয়া উভয়ে উভয় দিকে প্রাণপণ শক্তিতে রাত্রির অন্ধকার ভেদ করিয়া বনজঙ্গল ভাঙ্গিয়া ছুটিতে লাগিলেন।

এদিকে বিধাতার নির্ব্বন্ধে ঐদিনই কিংসফোর্ড সাহেব ঐ গাড়ীতে ছিলেন না। ঐ গাড়ীতে করিয়া মিসেস কেনেডি ও মিস কেনেডি নামক দুইজন ইংরাজ মহিলা কিংসফোর্ডের বাংলোয় যাইতেছিলেন। তাঁহারা দুইজনেই ঘটনাস্থলে মৃত্যুমুখে পতিত হন আর সহীশ এবং ক্যোচম্যান গুরুতররূপে আহত হয়। এই ঘটনার অব্যবহিত পরে সমস্ত মজঃফরপুর শহর আলোড়িত হইয়া উঠিল। এই ভয়াবহ হত্যার কথা দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িল। পুলিশের লোক তৎক্ষণাৎ সারা মজঃফরপুর পরিবেষ্ঠন করিয়া ফেলিল এবং আততায়ীকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ছুটাছুটি করিয়া রাত্রের মধ্যে সর্ব্ববিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করিল।

এদিকে ক্ষুদীরাম ও প্রফুল্ল উভয়ে সারারাত্র ধরিয়া ছুটিয়া ছুটিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। প্রভাত হইলে প্রথমেই প্রফুল্লচাকী পুলিশের নজরে পড়িয়া গেলেন। পুলিশের লোক তাঁহাকে মুহূর্ত্তের মধ্যে চতুর্দ্দিক হইতে ঘেরাও করিয়া ধরিল। তখন আত্মরক্ষার আর কোন উপায় না দেখিয়া প্রফুল্লচাকী মুখের মধ্যে রিভলবার পুরিয়া ঘোড়া টিপিয়া দিলেন। রিভল্‌বাবেব গুলি তাঁহার মস্তিষ্ক ভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসিল। বীর বিপ্লবী এইরূপে পুলিশের ধরা ছোঁওয়ার বাহিরে চলিয়া গেলেন। ঠিক এই সময় বিপরীত দিকে ক্ষুদীরাম পুলিশের হাতে ধরা পড়িলেন। আত্মরক্ষা অসম্ভব দেখিয়া ক্ষুদীরাম রিভলবার বাহির করিয়া আত্মহত্যা করিতে যাইবেন এরূপ সময়ে পুলিশ তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল এবং তাঁহার হস্ত হইতে রিভলবার ছিনাইয়া লইল। ঠিক ঐ দিনেই (১লা মে) কলিকাতার সমস্ত বিপ্লবী আড্ডার উপর সারাদিন ধরিয়া পুলিশের কড়া নজর রহিল।

ক্ষুদীরাম ও প্রফুল্ল চাকীর এই সংবাদ পাইয়া শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ সমস্ত বিপ্লবীকে সতর্ক করিয়া দিলেন। অনেক বিপ্লবী নিজ নিজ দেশের দিকে রওনা হইয়া গেল। উল্লাসকর দত্ত কয়েক বাক্স বোমা লইয়া হ্যারিসন রোডের একটি বাড়ীতে আত্মগোপন করিলেন। হেমচন্দ্র দাস মহাশয় মাণিকতলার বাগান হইতে নিজের বাসায় (১৫নং গোপীমোহন দত্ত লেনে) আশ্রয় লইলেন।

মণিকতলা বাগানের যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র ও বোমা নির্ম্মাণের যন্ত্রপাতি মাটির ভিতর ভাল করিয়া পুঁতিয়া ফেলা হইল। তখন এই মাণিকতলার বাগানে বহু নূতন নূতন বিপ্লবী তরুণ অবস্থান করিতেছিল। স্থির হইল ঐ দিন অর্থাৎ ১লা মে রাত্রি শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সকলকেই বাগান বাড়ী হইতে সরাইয়া দেওয়া হইবে। বিপ্লবীরা ঘোর আশঙ্কা ও উত্তেজনায় সারারাত্র জাগিয়া কাটাইল।

ঐদিন রাত্রি ১২টার পর হইতে পুলিশ সমস্ত সন্দেহ জনক জায়গা ও বাড়ী ঘিরিয়া ফেলিতে আরম্ভ করিল। মাণিকতলার বোমার কারখানা খুব ভাল করিয়া ঘিরিয়া ফেলিল। রাত্রি ২টার সময় বিপ্লবীরা বেশ বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহাদের পরিত্রাণের আর উপায় নাই। তখন উপেন্দ্রনাথ দুইচারিটি দুঃসাহসিক বিপ্লবীকে পুলিশের চোখে ধূলি দিয়া রাত্রের অন্ধকারে বাহির করিয়া দিলেন। বিপ্লবীরা পুলিশের নজর এড়াইয়া নিরাপদ স্থানে পলাইয়া গেল। উপেন্দ্রবাবু তখন উপস্থিত অন্যান্য বিপ্লবীদের বলিলেন যে ধরা তাঁহারা কিছুতেই দিবেন না, পুলিশের সহিত যুদ্ধ করিয়া বীরের মতন প্রাণত্যাগ করিবেন। কিন্তু বারীন্দ্রবাবু নবাগত যুবকদের বাঁচিবার অন্য উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি উপেন্দ্রবাবুকে বলিলেন যে "অস্ত্রশস্ত্র যখন সবই লুকাইয়া ফেলা হইয়াছে তখন পুলিশ প্রবেশ করিলে ক্ষতি কি? এক্ষেত্রে পুলিশ যদি ধরে তাহা হইলে উল্লাস, আমি ও তুমি স্বীকার করিব এবং বলিব অন্য সকলে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। তাহারা কেহই বিপ্লবাত্মক কার্য্যে লিপ্ত নহে সকলেই ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা করিবার জন্য মঠে সমবেত হইয়াছে।"

কিন্তু যুক্তি-তর্ক আর অধিকদূর অগ্রসর হইল না। পুলিশের দল ধীরে ধীরে বাগানে প্রবেশ করিল। রাত্রি ঠিক চারিটার সময় পুলিশ সকলকেই ধরিয়া ফেলিল। সর্ব্বশুদ্ধ এখানে ৩০ জন ধরা পড়িলেন। অস্ত্রশস্ত্র যে সব স্থানে পুঁতিয়া রাখা হইয়াছিল পুলিশ তাহার সন্ধান করিল এবং সেই স্থান খুঁড়িয়া গাড়ী গাড়ী বোমা, বন্দুক, গুলি ও বারুদ হস্তগত করিল। হেমচন্দ্রের বাসা হইতে অনুরূপ সময়ে হেমচন্দ্রকে ধরা হইল। হ্যারিসন রোড হইতে উল্লাসকর ও যামিনী কবিরাজকে গ্রেপ্তার করা হইল এবং হ্যারিসন রোড হইতে পুলিশ চার বাক্স বোমা উদ্ধার করিল। ৫৩নং গ্রেষ্ট্রীটে "নবশক্তি" অফিস হইতে শ্রীঅরবিন্দ, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শৈলেন্দ্রনাথ বসু ও দীনদয়াল বসুকে ধরা হইল। এই সময় সকল সংবাদ পত্রের আফিস, ৪নং হ্যারিসন রোডের "যুগান্তর পুস্তকালায়", "ছাত্র ভাণ্ডার" এবং সমস্ত দেশীয় প্রতিষ্ঠান পুলিশ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া অনেক কাগজপত্র লইয়া গেল। "যুগান্তর পুস্তকালয়" প্রভৃতিতে তালা চাবি লাগাইয়া গেল।

প্রভাত হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যাপক ধরপাকড়ের কথা সহরের চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। শ্রীঅরবিন্দকে হাতকড়া ও কোমরে দড়ি দিয়া বাঁধিয়াছে শুনিয়া তৎকালীন এটর্ণি ও মডারেট্ নেতা ভূপেন্দ্রনাথ বসু ছুটিয়া আসিলেন। তাঁহার সহিত বহু মডারেট নেতা আগমন করিলেন। শ্রীঅরবিন্দকে ধরা হইয়াছে শুনিয়া স্বয়ং পুলিশ কমিসনার হ্যালিডে সাহেবও ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। সকলের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধেও শ্রীঅরবিন্দের হাতের হাতকড়া খোলা হইল না। সমস্ত নেতারা তখন ইংরাজের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারিলেন। সকলেই বিপ্লবীদের কার্য্য সমর্থন করিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

ইহার ঠিক পরদিন শ্রীযুক্ত দেবব্রত বসুকে তাঁহার গ্রে ষ্ট্রীটের বাসা হইতে ধরা হইল। নরেন্দ্র গোঁসাইকে হাতে হাতকড়া না দিয়া শ্রীরামপুর হইতে তাঁহার বাড়ীর গাড়ীতে বসাইয়া আনা হইল। তখন সকলের সন্দেহ এই নরেন্দ্র গোঁসাইএর উপরই পড়িল। সর্ব্বশুদ্ধ ৪৭ জন আসামী ধরা পড়িল। বারীন্দ্র ঘোষ জবানবন্দী দিয়া বলিলেন—"আমি আমার বন্ধু অবিনাশ ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে লইয়া বিপ্লব প্রচারের জন্য "যুগান্তর" পত্রিকা বাহির করিয়াছি। আমিই উল্লাসকর ও উপেন্দ্রকে লইয়া বিপ্লব কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি। ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী আসামীদের মধ্যে নরেন্দ্র গোঁসাইও আমাদের সঙ্গে ছিল এবং কিছু কিছু কাজও করিত। আর সকলেই নির্দ্দোষ। ইহারা আমাদের অস্ত্রশস্ত্রের কোন সন্ধান জানিত না।" উপেন্দ্র তাঁহার জবানবন্দীতে বলিলেন "ইংরাজ গর্ভমেণ্টের উচ্ছেদ সাধন করিবার জন্য আমিই বিপ্লবীদলের নেতৃত্ব করিতাম।" উল্লাসকর জবানবন্দীতে বলিলেন "ইংরাজ রাজত্বের উচ্ছেদ সাধন আমার জীবনের ব্রত। এই মহৎ কার্য্য সম্পাদনের জন্য আমি নিজে জীবনপণ করিয়া বোমা অবিষ্কার করিয়াছি। আমারই তৈরী বোমা ক্ষুদীরাম ও প্রফুল্ল চাকী কিংসফোর্ডের গাড়ীতে ছুড়িয়া মারিয়াছিল। আমিই বারীনদা'র সঙ্গে নারায়ণগঞ্জে গিয়া বোমার সাহায্যে ছোট লাটের ট্রেণ উল্টাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। ইত্যাদি, ইত্যাদি।"

আলিপুর বোমার মাম্‌লা পুলিশ কমিশনারের নিকট হইতে পুলিশকোর্টে উপস্থিত করা হইল। সেখানে আসামীগণের বিরুদ্ধে চার্জ্জ সীট্ গঠন করা হইল। বারীন্দ্র ঘোষ লণ্ডন সহরে জন্মাইয়াছেন বলিয়া তাঁহার বিচার হাইকোর্টে হইবে স্থির হইল। উল্লাসকর হ্যারিসন রোড্ বোমার মাম্‌লার প্রধান আসামী স্বরূপ হাইকোর্টে বিচারার্থ প্রেরিত হইলেন। বারীন ঘোষ বিলাতে জন্মাইবার দরুণ হাইকোর্টে বিচারের সুবিধা গ্রহণ করিতে রাজী হইলেন না। তাঁহার আশঙ্কা হইল হয়তো তাঁহাকে এই সুবিধার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইবে আর

কাহাকেও ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না। কারণ ইংলণ্ডে যাঁহাদের জন্ম তাঁহারা অস্ত্র আইনের পর্য্যায়ে পড়েন না। কাজেই বারীন ঘোষ হাইকোর্টে তাঁহার বিচারের সুযোগ সুবিধা প্রত্যাখ্যান করিলেন। উল্লাসকরের মামলা হাইকোর্ট ও আলিপুর কোর্ট, উভয় কোর্টে উঠিল। অন্য সকলের মামলা আলিপুব ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টে আরম্ভ হইল। সকলের সম্বন্ধে ১২১, ১২১এ, ১২২, ১২৩, ১২৪এফ ধারার প্রয়োগ করা হইল।

ক্ষুদীরামের ফাঁসি ও মহারাষ্ট্র তিলকের নির্ব্বাসন

মজঃফরপুরেই ক্ষুদীরামের বিচার চলিল। এই বিচার এক অভিনব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিল। সমগ্র দেশবাসীর এই তরুণ বিপ্লবীর বিচারের ফলাফল জানিবার জন্য অধীব আগ্রহে বিচাবের রায়ের প্রতীক্ষায় রহিল। যথাকালে বিচার শেষ হইল এবং ক্ষুদীরামের ফাঁসির হুকুম হইল। ফাঁসীর হুকুম শুনিয়া বীববালক ক্ষুদীরাম বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। বরং তিনি আক্ষেপের সহিত বলিয়াছিলেন—"আমি কিংস্‌ফোর্ডকে মারিতে গিয়া দুইজন স্ত্রীলোককে মারিলাম ইহাই আমার দুঃখ। যদি আসল আসামীকে মারিতে পারিতাম তাহা হইলে ফাঁসি ঝুলিবার সময়ও আনন্দ করিতে পারিতাম।" ২১শে সেপ্টেম্বর, ক্ষুদীরামের ফাঁসির দিন ধার্য্য হইল। আত্মীয় ও ভগ্নীদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে ও কাতর প্রার্থনায় ক্ষুদীরাম হাইকোর্টে আপীল করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু এই আপীলে কোন ফল হইল না। হাইকোর্টের বিচারে ফাঁসির হুকুম বহাল থাকিয়া গেল। ১৯০৮ সালের ১১ই আগষ্ট, মজঃফরপুর জেলে ক্ষুদীরামের ফাঁসী হইল। ক্ষুদীরাম "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি করিয়া সহাস্য বদনে ফাঁসী কাষ্ঠে যাইয়া আরোহণ করেন। তাঁহার সুকুমার মুখমণ্ডল বীরত্বের এক অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনায় দীপ্ত হইয়া উঠিল। ইহা যেন ভাবী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্তরালে জাগ্রত আত্মিক শক্তির ইঙ্গিত দিয়া গেল। তিনি ফাঁসীকাষ্ঠে উঠিয়া ভগবানের কাছে তাঁহার শেষ নিবেদনে জানাইলেন "যেন আমি ভারতে জন্মিয়া ভারতমাতার বন্ধন মুক্ত করিতে পারি"। এইরূপে বীর শহীদ ক্ষুদীরাম হাসিমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া ভারতের জাতীয় ইতিহাসে এক গৌরবময় অনন্ত জীবন লাভ করিলেন।

দেশ নেতাদিগের নির্ব্বাসন

ক্ষুদীরাম কর্তৃক সরকারী কর্ম্মচারীর হত্যার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া মহারাষ্ট্র তিলক তাঁহার সম্পাদিত পুণার "কেশরী" পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখিলেন।

এই প্রবন্ধের তাৎপর্য্য ভারতবাসীর নিকট যেরূপই অনুমিত হউক না কেন ব্রিটিশ প্রভুদের চক্ষে তাহা তথাকথিত রাজদ্রোহিতার প্রেরণাদানের হীন অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হইল। মহারাষ্ট্র তিলক ৬ বৎসরের জন্য নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। এই সময়ে পাঞ্জাবে চাষী আন্দোলন সুরু হইল। এই আন্দোলনের পরিচালক ও নিয়ামক লালা লাজপৎ রায়ও রাজ-অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইলেন না। তাঁহাকেও নির্ব্বাসিত করা হইল—আর সঙ্গে সঙ্গে ভাই পরমানন্দ, রামভূজ চৌধুরী, অজিত সিংও নির্ব্বাসিত হইলেন।

এইসময় বাংলার গরমদল শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তীর নেতৃত্বাধীনে চলিতে লাগিল। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল তখন বিলাতে অবস্থান করিতেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ আলিপুর বোমার মামলার আসামী হইয়াছেন। এবং শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্তও জেল হইতে মুক্তি পাইবার পর আমেরিকায় গমন করিয়াছিলেন। ইতোপূর্ব্বে গরম দলের নেতৃত্ব করিতেছিলেন বিপিনচন্দ্র ও শ্রীঅরবিন্দ। ইহাঁদের অবর্ত্তমানে শ্যামসুন্দরের উপরই গরমদলের ভার পড়ে। ইহা ছাড়া শ্রীঅরবিন্দের অনুপস্থিতিতে 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার সম্পাদনা তাঁহাকেই করিতে হইত। তাহার উপর শ্রীঅরবিন্দের বোমার মাম্‌লা তদ্‌বীরের জন্য উকিল ও ব্যারিষ্টারের বাড়ীতে তাঁহাকেই ছুটাছুটি করিতে হইত। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় শ্রীঅরবিন্দের মামলা পরিচালনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছিলেন ও শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তীকে লইয়া মাম্‌লার তদ্বিরও করিতেছিলেন।

প্রথমে তৎকালীন বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তীকে দৈনিক হাজার টাকা দক্ষিণা দিয়া শ্রীঅরবিন্দের জন্য দাঁড় করান হইল। তিনি ২১ দিনে ২১ হাজার টাকা লইয়া আর টাকা পাইবার আশা নাই অনুমান করিয়া মামলাটি ছাড়িয়া দিলেন। শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী ও স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দের অনুরোধে কৃষ্ণকুমার মিত্র শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাসকে শ্রীঅরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। কৃষ্ণ কুমার মিত্রের একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত সুকুমার মিত্র, এবং যুবক বক্তা শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বসু, সন্তোষকুমার বসু, নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতি এই মাম্‌লার যথোচিত তদ্বির করিতে লাগিলেন। এই মামলায় সংশ্লিষ্ট শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য ঢাকার প্রধান উকিল শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন রায় আসিলেন। এইরূপে ব্যারিষ্টার পি. মিত্র, রজত রায়, বি. সি চ্যাটার্জ্জি, নরেন্দ্রকুমার বসু, বিজয়কৃষ্ণ বসু, সুরেন্দ্রনাথ সেন (ইনি দেশবন্ধুর ভগ্নীপতি) প্রভৃতি ৫০ জন উকিল ও ব্যারিষ্টার আসামী পক্ষ সমর্থন করিলেন। ইঁহারা সকলেই বিনা পারিশ্রমিকে মামলা চালাইতে লাগিলেন।

সেই সময় বাহরা নামক স্থানে পুনরায় একটি ডাকাতি হইল। ব্রিটিশ প্রভুদের আবার টনক নড়িল। তাঁহারা একই দিনে বোমার মামলায় সাহায্যকারী অনেককে নির্ব্বাসিত করিলেন। ইহার মধ্যে পড়িলেন "বন্দেমাতরমে"র সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, "সঞ্জিবনী"র সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, "নবশক্তির" সত্ত্বাধিকারী ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, গরমদলের প্রধান অর্থ সহায্যকারী রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক, যুবক বক্তা শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বসু, বরিশালের জনপ্রিয় নেতা শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত, ঢাকার অনুশীলন সমিতির অধ্যক্ষ পুলিন বিহারী দাস ও বরিশাল কলেজের অধ্যাপক শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আর নজরবন্দী হইয়া রহিলেন, গোপনে সাহায্যকারী নাড়াজোলের রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁন, চারুচন্দ্র দত্ত আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুযোগ্য ভ্রাতুস্পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মুন্সেফ্ শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। কিছুদিন নজরবন্দী অবস্থায় থাকিবার পর মুন্সেফ শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী চাকুরী হইতে বিতাড়িত হইলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে পুলিশ অভিযোগ করিয়াছিল এই যে তিনি শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তীর স্বগ্রামবাসী এবং সহপাঠী এবং তিনিই নাকি একটি ডাকাতিতে বারীন্দ্র ঘোষ প্রভৃতিকে বাড়ীতে আশ্রয় দিয়া তাঁহাদিগকে পুলিশের হাত হইতে বাঁচাইয়াছিলেন। এই আকস্মিক ধরপাকড়, নির্ব্বাসন ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের অহেতুক ও বর্ব্বরোচিত লাঞ্ছনায় সমগ্র দেশ বিহ্বল হইয়া পড়িল। তাহার পর এমন হইল যে দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ নির্য্যাতন ও নির্ব্বাসনের ভয়ে তাঁহাদের নিকটে কোন যুবককে ঘেঁসিতে দিতেন না। কেহই কাহাকেও মনে প্রাণে বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। সর্ব্বদাই সকলে সকলকে পুলিশের গুপ্তচর বলিয়া সন্দেহ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু দেশের এইরূপ বিপর্য্যয়ে যুবশক্তি হীনবীর্য্য হইয়া পড়ে নাই। যুবকদের মনোভাব অটুট ও মনোবল অক্ষুণ্ণ ছিল। তাহারাই তখন গরমদলের নেতৃত্ব ভার নিজেরা গ্রহণ করিল। সেই সময় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্রের পুত্র শ্রীযুক্ত সুকুমার মিত্র আলিপুর মামলার তদ্বির একাই করিতে লাগিলেন। তখন চন্দননগরের মতিলাল রায় ও চারুচন্দ্র রায়, যতীন মুখার্জ্জি, রাসবিহারী বসু, চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী, নরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সতীশ সেনগুপ্ত, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, রামচন্দ্র মজুমদার, সুরেশচন্দ্র মজুমদার, যদুগোপাল মুখার্জ্জি, অতুল ঘোষ, গিরীন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, বিপিন বিহারী, অমর ঘোষ, অমর বসু, নরেন শেঠ প্রভৃতি যুবকগণ সকল বিপ্লবীদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু ও শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার প্রভৃতি যুবকগণও আলিপুর

বোমার মামলায় কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ উকিল, শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ দত্ত, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মহারাজা ব্রজেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী, টাকীর জমীদার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী প্রভৃতি এই মামলায় যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করেন। কমলালয়ের একজন সত্ত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীও বিপ্লবীদের যথেষ্ট সাহায্য করেন।

আলিপুর জজকোর্টে বোমার মাম্‌লা

আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ বার্লি তিনমাস মামলা চালাইয়া সমস্ত আসামীকে জজ আদালতে বিচারের জন্য পাঠাইয়া দেন। উল্লাসকর দত্ত, যামিনী কবিরাজ, হ্যারিসন রোড বোমার মামলায় ধৃত হইয়া হাইকোর্টে বিচারার্থ প্রেরিত হন। হাইকোর্টের বিচারে তাঁহাদের প্রত্যেকের সাত বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড হয়। তাহার পর উল্লাসকরকে পুনরায় নূতন দফায় আলিপুর বোমার মামলার আসামীরূপে বিচারের জন্য জজ আদালতে পঠান হয়। এইরূপে আলিপুরের বোমার মাম্‌লাটি বেশ জটিল এবং ঘটনা পরম্পরায় চমকপ্রদ হইয়া উঠিল। সরকার পক্ষে দাড়াইলেন—ব্যারিষ্টার নর্টন, বার্টন ও উইথহল এবং তাঁহাদের সহকারী হইলেন সরকার পক্ষের উকিল শ্রীযুক্ত আশুতোষ বিশ্বাস। আর সরকার পক্ষ হইতে মাম্‌লার তদ্বির করিতে লাগিলেন —পুলিশের সি. আই. ডি. ইন্‌স্পেক্টর মৌলভী সামসুল আলাম।

কিরূপভাবে আসামীগণকে জেল হইতে আদালতে হাজির করা হইত তাহার বিবরণ পাঠ করিলে ব্রিটিশ রাজশক্তির "বিপ্লব ও বিপ্লবী" আতঙ্কের সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়। আসামীদের বেলা ৯টার সময় আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল হইতে বৃহদাকার দুইখানি বন্দী-গাড়ীতে হাতে হাতকড়া ও কোমরে দড়ি বাঁধা অবস্থায় ভর্ত্তি করা হইত। ঐ দুইখানি ঘোড়ার গাড়ীর চারি-দিকে থাকিত বহু সশস্ত্র পুলিশ প্রহরী। গাড়ীর অগ্রে ও পশ্চাতে মার্চ করিয়া চলিত অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যবাহিনী। কিন্তু সেই জালে-ঘেরা গাড়ীর মধ্য হইতে তেজদীপ্ত কণ্ঠে "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি উত্থিত হইত, আর ভক্তিপ্লুত কণ্ঠে উদাত্তস্বরে দেশমাতৃকার গীত গাওয়া হইত। যখন গাড়ীগুলি রাজপথ অতিক্রম করিত তখন উভয় পার্শ্বের পথচারী পথিক অবাক বিস্ময়ে এই অপরূপ দৃশ্য অবলোকন করিত এই অদ্ভুত উন্মাদনা সঞ্চারকারী ধ্বনি শ্রবণ করিত। এই সব আসামীদের একটিবার দেখিবার জন্য সহস্র সহস্র নাগরিক পথিপার্শ্বে সমবেত হইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত করিত। তাহার পর তাহারাই আবার আদালত প্রাঙ্গন পূর্ণ করিয়া ফেলিত। সঘনে বন্দেমাতরম্

ধ্বনি উত্থিত হইয়া আদালত প্রাঙ্গন প্রকম্পিত করিত। পুলিশ আসিয়া জনতা ছত্রভঙ্গ করিয়া দিত। আদালতের ভিতর একটি সুবৃহৎ লৌহ খাঁচা ছিল। আসামীদের আনিয়া তাহার মধ্যে একে একে বসান হইত। হেমচন্দ্র দাস ও উল্লাস কর সেই খাঁচার মধ্যে থাকিয়াই গান জুড়িয়া দিতেন—শ্রীঅরবিন্দ বাদে সকল আসামীই তাহাতে যোগ দিত। এমন সময় দেখা যাইত নরেন্দ্র গোস্বামীকে রাজসম্মানে আদালত-গৃহে প্রবেশ করান হইতেছে এবং জজের পার্শ্বে রক্ষিত একটি আসনে তাঁহাকে সমাদরে উপবেশন করানো হইতেছে।

কিছুকাল এইভাবে মামলার শুনানী চলিল। ঠিক সেই সময় কতকগুলি নথি পত্র তৈয়ারী হয় নাই বলিয়া কিছুকালের জন্য আদালতের ছুটি রহিল। এই অবসরে হেমচন্দ্র দাসের নেতৃত্বে সরকারী সাক্ষী নরেন্দ্র গোঁসাইকে মারিবার ব্যবস্থা করা হইল। উল্লাসকরকে হেমচন্দ্র দাস বলিলেন জেলের ইউরোপীয়ন কোয়াটারে গিয়া ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডারের হাত হইতে রিলভবার ছিনাইয়া লইয়া সেই রিভলবার দ্বারা নরেন্দ্র গোঁসাইকে মারিতে হইবে। উল্লাসকর কিন্তু সেই প্রস্তাবে রাজী হইতে পারিলেন না। তখন কানাই দত্ত ও সত্যেন্দ্র বসু প্রস্তাব করিলেন—"যদি আপনি দুইটি রিভলবার আমাদের সংগ্রহ করিয়া দেন তাহা হইলে আমরা যে কোন উপায়ে নরেন্দ্র গোঁসাইকে মারিতে পারি। কুশলী হেমচন্দ্র অনেক কৌশলে বাহির হইতে দুইটি ভাল রিভলবার আনাইয়া কানাই ও সত্যেন্দ্রকে দিলেন। এই সময় কানাই দত্ত অসুস্থ ছিলেন। তিনি জেল হাঁসপাতালে গেলেন আর সত্যেন্দ্র অসুখের ভাণ করিয়া হাঁসপাতালে গমন করিলেন। দ্বিতলের দুইখানি পাশাপাশি ঘরে তাঁহাদের থাকিবার বন্দোবস্ত হইল।

হাঁসপাতালে আসিয়া কানাই দত্ত একটি কৌশল অবলম্বন করিলেন। তিনি নরেন্দ্র গোঁসাইকে একখানি পত্র দিয়া জানাইলেন "যে তিনি খুব অসুস্থ। আর জেলের কষ্ট সহ্য হইতেছে না। বারীনদাকে তোমার নাম তুলিয়া লইতে বলায় তিনি বলিলেন যে তিনি সত্যের অবমাননা করিতে পারিবেন না। অতএব আমি বেশ বুঝিয়া দেখিয়াছি যে বারীনদার খেয়ালে আমাদের জীবন দিয়া লাভ নাই। আমিও রাজসাক্ষী হইয়া প্রাণে বাঁচিতে চাই। তুমি আসিলে সাক্ষাতে সব কথা হইবে।" পত্র পাইয়া নরেন্দ্র গোঁসাই আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন—কারণ তাহার এই বিশ্বাসঘাতকতার কর্ম্মে তিনি সঙ্গী পাইবেন। বিবেকের দংশন তাঁহাকে একাই ভোগ করিতে হইবে না।

নরেন্দ্র গোঁসাইকে জেলের মধ্যে হত্যা

১৯০৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর সকাল ৮৷৷০ সময় নরেন্দ্র গোঁসাই তাঁহার প্রাতরাশ সমাপন করিয়া চারিজন ইউরোপিয়ান ওয়ার্ডার সমভিব্যাহারে কানাই দত্তের সহিত সাক্ষাৎ করিতে উপরে উঠিলেন। ইউরোপিয়ান্ ওয়ার্ডারগণ দ্বিতলের বারান্দায় পায়চারী করিতে লাগিলেন এবং নরেন্দ্র ভিতরে প্রবেশ করিয়া কানাইয়ের শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। তখন কানাই দত্ত তাঁহার অসুখের কথা, একথা-সেকথা প্রভৃতি পাঁচ রকম কথাবার্ত্তায় নরেন্দ্র গোঁসাইকে অন্যমনস্ক করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—"ভাই, আমি সমস্ত রাত্রি ভাবিয়া দেখিলাম তুমি তোমার জবানবন্দী উঠাইয়া লইলে আমাদের বিরুদ্ধে যে অন্য প্রমাণ পাছে তাহা হইতে আমরা অব্যাহতি পাইতে পারি। তাই আমার অনুরোধ আমাদের বাঁচাইবার জন্য তোমার জবানবন্দী উঠাইয়া লও। তুমি কিছুদিন কারাদণ্ড ভোগ করিবে কিন্তু আমরা বাঁচিয়া যাইব।" তাহার উত্তরে নরেন্দ্র গোস্বামী বলিলেন "দেখ ভাই, আমার নাম উঠাইয়া লইতে বারীনদা'কে কত অনুরোধ করিলাম। বারীনদা' বলিলেন "আমি সত্যের অবমাননা করিতে পারি না।" বারীনদা সত্যের অবমাননা করিতে পারিলেন না বলিয়া আমিও সত্যের অবমাননা করিলাম না। তারপর পুলিশ দুই চারিটি কথা উহার সহিত যুক্ত করিয়া দিয়া বাড়াইয়া ফেলিতেছে। এখন আর উপায় নাই। তুমি যদি বাঁচিতে চাও তুমিও রাজসাক্ষী হও।" তখন কানাই দত্ত চিন্তার ভাণ দেখাইয়া বলিলেন "চিন্তা করিয়া দেখি।" তারপর বলিলেন "ভাই, আমাকে একটু উঠাইয়া বসাইয়া দেও।" কানাই দত্তের কথায় যেইমাত্র নরেন্দ্র তাঁহাকে শয্যার উপর বসাইলেন অমনি কানাই তাঁহার কম্বলের ভিতর হইতে হাত বাহির করিয়া নরেন্দ্রের বুক লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িয়া বলিলেন—"দেশ-দ্রোহিতার পুরস্কার।" সেই গুলি নরেন্দ্রের বামদিকের পাঁজ্‌রা ভেদ করিল। শক্তিমান নরেন্দ্র গোঁসাই ঘর হইতে ছুটিয়া বারান্দায় বাহির হইলেন। কানাইও তাঁহার পিছু পিছু ছুটিতে লাগিলেন। নরেন কানাইয়ের ঘর হইতে বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ বসু পাশের ঘর হইতে রিভলবার লইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিয়া নরেনকে গুলি করিলেন। সেই গুলি যাইয়া একটি ইউরোপিয়ান্ ওয়ার্ডারের বাম হাত বিদ্ধ করিল। ওয়ার্ডারগণ কানাইকে ছাড়িয়া সত্যেনকে ধরিতে গেল। সেই সুযোগে কানাই দত্ত পলায়মান নরেন্দ্রের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে কানাই দত্ত নরেন্দ্রের ডান পায়ে আর একটি গুলি করিলেন। তখনও কিন্তু নরেন্দ্র ঊর্দ্ধশ্বাসে জেলের প্রাঙ্গন দিয়া ছুটিতেছিলেন আর পশ্চাতে ছুটিতেছিলেন কানাই দত্ত। এইরূপ অবস্থায় জেলের পাগ্‌লা ঘণ্টা বাজিয়া

উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রহরীগণ একযোগে গুলিবর্ষণ সুরু করিল এবং জেল প্রাঙ্গন ধূমে পরিপূর্ণ হইল। সেই ধূমায়িত অন্ধকারের মধ্যে কানাই দত্ত নরেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া আরও তিনটি গুলি ছুড়িলেন। এইবার নরেন্দ্র ভূতলশায়ী হইলেন। তখন কানাই দত্ত ছুটিয়া গিয়া তাঁহার বক্ষের উপর উঠিয়া বসিয়া, রিভলবারের শেষ গুলিটি নরেন্দ্রের বক্ষে বিদ্ধ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার।" সেই অবস্থায় কানাই ক্লান্ত হইয়া নরেন্দ্রের বক্ষের উপর বসিয়া রহিলেন। তাঁহার তখন প্রবল জ্বর আসিয়াছে। তাঁহাকে সেই অবস্থায় পাইয়া জেল সুপারিণ্টেন্ডেণ্ট ও ওয়ার্ডারগণ তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। কানাই দত্ত পিপাসায় বড় কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি একটু জল চাহিলে জেলার তাঁহাকে নির্ম্মভাবে প্রহার করিতে থাকেন। ইহাতে তিনি অচৈতন্য হইয়া লুটাইয়া পড়িলেন। কানাই দত্ত যখন কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন তখন তাঁহাকে বিচারের জন্য আদালতে হাজির করা হইল। কিন্তু কানাই দত্ত বলিলেন—"আমার কিছু বলিবার নাই আমি ইংরাজের আদালতে কোন বিচারের প্রত্যাশা করি না। নরেন্দ্রকে আমিই মারিয়াছি সত্যেন কিছুই করে নাই। আমার কবে ফাঁসি হইবে তাহাই মাত্র জানিতে চাই।" কিছুদিন পরে কানাই দত্ত ও সত্যেন্দ্রের যথারীতি বিচার হইল। জজ সাহেব কানাই দত্ত ও সতেন্দ্রকে ফাঁসির হুকুম দিলেন। ইহাতে কানাই দত্ত কোনরূপ আপত্তি করিলেন না—কাজেই বিচারের সাতদিন পরে আলিপুর জেলে তাঁহার ফাঁসির দিন ধার্য্য হইল। কিন্তু সত্যেন্দ্র তাঁহার মাতা ও ভ্রাতার অনুরোধে হাইকোর্টে আপীল করিলেন। কিন্তু হাইকোর্ট তাহার পূর্ব্ব দণ্ডাদেশ বাহাল রাখিল। কানাই দত্তের ফাঁসির দুইমাস পরে আলিপুর জেলে সত্যেন্দ্রের ফাঁসি হইয়াছিল।

জেলের ভিতর এইরূপ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইল বলিয়া জেল কর্তৃপক্ষ বোমার মামলার আসামীদের জন্য বিশেষ কড়া ব্যবস্থা করিলেন। প্রত্যেক আসামীকে পৃথক পৃথক নির্জ্জন কুঠুরীতে রাখার ব্যবস্থা হইল। কানাই দত্ত ও সত্যেন্দ্র ফাঁসির আসামী। কাজেই তাঁহাদের হাতে হাতকড়া ও পায়ে বেড়ি পরাইয়া রাখা হইল। কানাই দত্ত সেই নির্জন কুঠুরীতে ফাঁসির হুকুমের পর যে সাতটি দিন ছিলেন সেই সাতটি দিনে প্রতিদিন দুই পাউণ্ড করিয়া ওজনে বাড়িয়াছেন। ইহা দেখিয়া জেলার জেলসুপারিন্টেন্ডেণ্ট, জেলার, ডাক্তার প্রভৃতি বিস্মিত হইয়াছিলেন। কানাই দত্ত প্রত্যহ স্নান আহ্নিক সারিয়া গীতা ভাগবদাদি পাঠ করিয়া জেলের কদর্য্য আহার গ্রহণ করিতেন। সর্ব্বদা নির্জন কুঠুরীতে আবদ্ধ তথাপি রাত্রে কানাই দত্ত গভীর নিদ্রায় মগ্ন থাকিতেন। তাঁহার ভিতর কোন চিন্তাই ছিল না। শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র মহাসমরে তাঁহার প্রিয় সখা অর্জ্জুনকে

গীতামৃত দান করিয়াও তাহার মোহ অপনোদন করিতে পারেন নাই, শেষে তাঁহাকে বিশ্বরূপ দেখাইয়া তবেই যুদ্ধে নিয়োগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, আর এই কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সখা অর্জ্জুন অপেক্ষা বড় বীর, "দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনাঃ, সুখেষু বিগতস্পৃহঃ" বীর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন দেখিয়া সকলেই কানাইকে কলির শ্রীকৃষ্ণ অবতার বলিয়া মনে করিতে লাগিল। আলিপুরের জল্লাদ কানাইকে ফাঁসি দিবার ভয়ে কাজ ছাড়িয়া চলিয়া গেল। মজঃফরপুরে যে জল্লাদ শহীদ্ ক্ষুদিরামকে ফাঁসি দিয়াছিল - তাহাকেই কানাই দত্তকে ফাঁসি দিবার জন্য টেলিগ্রাফ করিয়া আনা হইল।

১০ই নভেম্বর, ১৯০৮ সাল। ভোর হইবার সঙ্গে সঙ্গে কানাই দত্ত ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিবেন। ৯ই ডিসেম্বর সারা দিন রাত্রি ডাক্তার কানাইকে পরীক্ষা করিয়া রিপোর্ট লিখিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার সময় কানাই দত্ত ডাক্তারকে বলিলেন— 'আমার একটি অনুরোধ আছে। সাধারণতঃ আমার ঘুম চারিটার আগে ভাঙে না—আমাকে রাত্র তিনটায় ডাকিয়া দিতে হইবে।" ডাক্তার ইহাতে রাজি হইলেন কিন্তু কানাইয়ের শান্তির নিদ্রা ভাঙ্গাইতে তাঁহার সাহস হইল না। চারিটায় কানাই দত্ত নিদ্রা হইতে উঠিয়াই প্রশ্ন করিলেন—"ডাক্তার ক'টা বেজেছে?" ডাক্তার বলিলেন—"চারিটা"। তখন কানাই দত্ত ডাক্তারকে বলিলেন—"আমার শেষ অনুরোধ রাখিলে না? আর দুই ঘণ্টা পরেই আমার ফাঁসি। এই অল্প সময়ে আমি কি করিয়া স্নান আহ্নিক ও আহারাদি সারিয়া ফাঁসি কাঠে যাইব?।" যাই হোক তখন জেল কর্ত্তৃপক্ষ তাড়াতাড়ি করিয়া কানাই দত্তের স্নান আহ্নিকের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন এবং খাদ্য আনিয়া মজুত রাখিলেন। কানাই দত্ত স্নান আহ্নিক সারিয়া, গীতা ভাগবদাদি পাঠ করিয়া আহারাদি করিলেন। তারপর গীতা ও ভাগবত্ হাতে লইয়া জেল সুপারিন্‌টেনডেণ্ট্ সাহেবকে বলিলেন—"আমায় ফাঁসিমঞ্চে লইয়া চলুন।" তখন আধঘণ্টার উপর সময় আছে। এজন্য সকলে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল—কিন্তু ফাঁসির আসামীর শেষ অনুরোধ রক্ষা করা হইল।

জেল সুপারিন্‌টেনডেণ্ট্ ছিলেন একজন আইরিশ সাহেব। তিনি কানাই দত্তের বীরত্ব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। এদিকে কানাই দত্ত ফাঁসির ঘরে আসিয়া ফাঁসির ব্যাপারগুলি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া লইলেন। ফাঁসির মঞ্চ ও ফাঁসির দড়ি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে দড়িটি একটু কষা আছে, উহাকে কিঞ্চিৎ মাজিয়া দিতে পারিলে ভাল হয়। অতঃপর ফাঁসিমঞ্চ হইতে নামিয়া তিনি উপস্থিত সকলের সহিত রহস্যালাপে নিযুক্ত হন। তাহার পরই ফাঁসির ঘণ্টা বাজিল। কানাই দত্ত চোখ হইতে চশমা খুলিয়া জেল কর্ত্তৃপক্ষের

হস্তে দিয়া বলিলেন "এই চশমাটি আমার দাদাকে দিয়া দিবেন।" এই বলিয়া তিনি গীতা ও ভাগবৎ বুকে করিয়া নির্ভীকচিত্তে ফাঁসি মঞ্চের উপর আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই কানাইদত্তের দেহ ফাঁসি মঞ্চ হইতে নিচে নামিয়া আসিল। ফাঁসি হইয়া গেলে কানাই দত্তের দাদা শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত ও চন্দননগরের শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় প্রভৃতি মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া গিয়া দাহ করিবার অনুমতি চাহিয়া দরখস্ত করিলেন। বেলা ৭টার সময় মৃতদেহকে জেলের বাহির করা হইল।

কানাই দত্তের ফাঁসীর পূর্ব্বদিন রাত্রি হইতে দলে দলে যুবক আসিয়া জেলের বাহিরের প্রশস্ত মাঠে সমবেত হইতে লাগিল। সকলেই পুষ্পমাল্য লইয়া প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে—অমর শহীদ্‌কে শেষ সম্মান দেখাইবার জন্য। মৃতদেহ বাহিরে আনীত হইবামাত্র সকলে যাইয়া অস্ফুট বন্দেমাতারম্ ধ্বনি সহকারে মৃতদেহকে মাল্য-ভূষিত করিল। অচিরে মৃতদেহ ঘিরিয়া জনসমুদ্র উদ্বেল হইয়া উঠিল। সমবেত-জনতা ধীর অথচ উদাত্ত কণ্ঠে এই সঙ্গীতটি গান করিতে লাগিলেন—

"মাতৃভূমির তরে যেই অকাতরে
নিজ প্রাণ দিতে কভু নাহি ডরে.
অপঘাত ভয় খণ্ডে তার যায়
মরণে গোলকে যায় সেজন।"

ফাঁসির দরুণ মৃত দেহ এতটুকুও বিকৃত হয় নাই। মুখ হইতে জিহ্বা নির্গত হয় নাই। কোঠর হইতে চক্ষু বাহিরে ঠেলিয়া আসে নাই। বুকের উপর গীতা ও ভাগবত খানি তখনও আঁকড়াইয়া ধরা আছে। উহা দেখিয়া সকলেই বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল। বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে জনতা আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পুলিশের ভয় তুচ্ছ করিয়া হাজার হাজার লোক পুষ্পমাল্য হাতে করিয়া আলিপুরের চিঁড়িয়াখানা পর্য্যন্ত ভিড় করিয়া রহিল। রাস্তার উভয় পার্শ্বের গাছগুলি লোকে ভরিয়া গেল। ঐ সকল বৃক্ষের উপর হইতে অবিরল ধারায় শবাধারের উপর পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। সকলের মুখেই শুধু "বন্দে-মাতারম্" ধ্বনি।

কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে পৌঁছাইয়া ভিড় নিয়ন্ত্রণ করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। মতিলাল রায় প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ভলান্টিয়ার দল গঠন করিয়া জনতা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। একপার্শ্ব দিয়া পুরুষ ও একপার্শ্ব দিয়া স্ত্রীলোকের যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হইল। শুনিতে পাওয়া যায়, ঐ দিন কালিঘাটের মা কালী তাঁহার সেবাইতদের স্বপ্ন দিয়াছিলেন যে তাঁহার পূজা বন্ধ রাখিয়া সেই উপকরণে কানাইয়ের অন্তিম পূজা করিতে। কাজেই দেবীর

অখণ্ড-ভারতে অখণ্ড-স্বাধীনতা ও
ভারত জাতীয়তার ঋষি—
শ্রীঅরবিন্দ

অহিংস আন্দোলনের ঋষি ও নায়ক—
মহাত্মা গান্ধী

আদেশে সেবাইতগণ পূজার উপচার ফুল চন্দন ও ঘৃত ইত্যাদি লইয়া কানাই দত্তের পূজা করিলেন। তাহার পর হইতেই দলে দলে লোক আসিয়া পূজা আরম্ভ করিয়া দিল। একদল যায় পুনরায় নূতনদল আসে। এ পূজার বিরাম নাই,—বিশ্রাম নাই। অবশেষে মতিলাল রায় মহাশয় কাহারও মনঃক্ষুণ্ণ না করিয়া বেলা ৩টার সময় উপস্থিত জনতার নিকট একটি বক্তৃতা করিলেন তাহার পর সকলের অনুমতি লইয়া শবদেহ চিতার উপর রক্ষা করিলেন। দেখিতে দেখিতে অগ্নিদেব লেলিহান শিখা বিস্তার করিলেন। ঘৃত ও চন্দনের সহযোগে একঘণ্টার মধ্যে অমর শহীদের নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হইয়া গেল। তখন মতিলাল রায়, চারুচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি চিতাভস্ম লইয়া চন্দননগরে কানাই-জননীর নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের আসিতে দেখিয়া বীর-প্রসবিনী প্রাঙ্গনে লুটাইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহারা এই রত্নগর্ভা রমণীর সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। এদিকে শ্মশান-ঘাটে চিতাভস্ম সংগ্রহ করিবার ধূম পড়িয়া গেল। সারারাত্র ধরিয়া সকলে চিতাভস্ম সংগ্রহ করিলেন। কালিঘাটের সমস্ত দোকানের সিঁদুর কৌটা চিতাভস্ম লইবার জন্য ফুরাইয়া গেল। এইরূপে বীর-সন্তান, অমর-শহীদ্, নির্ভীক-বিপ্লবী, দেশমাতৃকার একনিষ্ঠ ভক্ত ও স্বাধীনতা সংগ্রামের মহারথী কানাই দত্তের গৌরবময় সংক্ষিপ্ত জীবনের অবসান হইল।

কানাই দত্তের শব বহনের সময় যে উন্মাদনা গভর্ণমেণ্ট লক্ষ্য করিয়াছিলেন সেই কারণে ইহার ঠিক দুইমাস পরে সত্যেন্দ্রের ফাঁসি হইলে তাঁহার পবিত্র-দেহ বাহিরে দাহ করিবার অনুমতি দেওয়া হইল না। তখন হইতে অন্য কোন ফাঁসির আসামীর মৃতদেহ বাহিরে দাহ করিবার ব্যবস্থা বন্ধ হইয়া গেল।

এই সময় হইতে কলিকাতায় পুলিশি-উপদ্রব আরও বাড়িয়া গেল। কোনরূপ সভা-সমিতির অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ হইয়া গেল। কেবলমাত্র মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন ১০।১২টি ছেলে লইয়া "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি করিয়া পুনঃ পুনঃ কারাবরণ করিতে লাগিলেন। পুলিশ তখন যুবক দেখিলেই সন্দেহ করে। একে জেলের ভিতর এইরূপ হত্যাকাণ্ড, তাহার উপর ঠিক ঐ সময়েই পশ্চিম বঙ্গের ছোট লাট ফ্রেজার সাহেবের আবার প্রাণহানি করিবার চেষ্টা করা হয়। এবার যে যুবক ফ্রেজার সাহেবের উপর গুলি করে, তিনি আড়বালিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, স্কটিশচার্চ কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিকি শ্রেণীর ছাত্র। যুবক জিতেন্দ্রনাথ ওভারটুন হলের দরজায় দাঁড়াইয়া ৬ই নভেম্বর, ফ্রেজার সাহেবের বুকের উপর রিভলভার ধরিয়া পর পর তিনবার গুলি করিলেন, কিন্তু গুলি বাহির হইল না। বর্দ্ধমানের মহারাজা আসিয়া প্রথমে জিতেন্দ্রকে ধরিলেন। জিতেন্দ্র রিভলভারের বাঁট দিয়া বর্দ্ধমানের মহারাজকে ও পুলিশ প্রহরীদের মারিতে লাগিলেন।

তারপর পরাজিত হইয়া ধরা পড়িলেন। ঠিক এই সময়ে অর্থাৎ ৯ই নভেম্বর, নন্দলাল ব্যানার্জ্জি নামক যে পুলিস ইনসপেক্টর ক্ষুদীরামকে ধরিয়াছিল তাহাকে হত্যা করা হইল। ঐ মাসেই ঢাকায় সুকুমার নামে এক গোয়েন্দাকে হত্যা করা হয়। বিচারে জিতেন্দ্র নাথের ১০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। জিতেন্দ্র সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পদ্যটী ছাপাইয়া বিলি করা হয়।

"বিপিন যখন জেলে, সুশীল রতন
বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত, স্তম্ভিত জগৎ যত,
বিচারে যখন এলো ঘোর প্রহসন,
তখন ভাবিলে তুমি ফ্রেজার হনন।

মৌলভী প্রাচীন সেই স্বদেশীর ধন,
কুচক্রে পড়িয়া হায়, শত্রু কারাগারে যায়,
লঘু পাপে গুরু দণ্ড হইল যখন,
তখন ভাবিলে তুমি ফ্রেজার হনন।

ছুটিলে পিস্তল করে ওভারটুন হ'লে,
রহিয়া দুয়ার দেশে মূর্ত্তিমান বীরবেশে,
সম্মুখে স্বদেশ শত্রু ভীত না হইলে,
টানিলে পিস্তল-ঘোড়া জয় শ্যাম বলে'।

হায়রে না জানি কিবা মায়ের কপাল,
একবার দুইবার ঘোড়া ফেলি তিনবার,
ব্যর্থ মনোরথ হ'লে বাদী হলো কাল,
রহিল অক্ষত দেহে বঙ্গের ভূপাল।

তারপর কি আশ্চর্য্য অসংখ্য অরাতি
বেড়িয়াছে শত পুর, ভীত তবু নহ সুর,
যুঝিলা অক্লান্ত দেহে মার মত্ত হাতী,
উঠিলা দিগন্ত দিকে তব জয় ভাতি!

জেলে যাও হে জিতেন্দ্র, কিম্বা দ্বীপান্তরে,
বাঙ্গালী তোমার স্মৃতি পূজিবে হে নীতি নীতি,
তুমি হে আরাধ্যদেব রহিবে অন্তরে,
বাঙ্গালীর হৃদে রবে, রবে না অন্তরে।"

ইহার পর হইতে যুবকগণের উপর অকথ্য ও অমানুষিক পুলিশি-জুলুম চলিতে লাগিল। পুলিশ এখন "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি শুনিলে ক্ষেপিয়া যায় এবং যুবকগণকে প্রহার করিতে আরম্ভ করে, অবশেষে পুলিশ ধরিয়া লইয়া যায়। ইংরাজগণও এই "বন্দেমাতরম্" ধ্বনির এক অপূর্ব্ব অর্থ করিলেন। তাঁহারা "বন্দেমাতরমের" অর্থ করিলেন "বেঁধে মারো।"

এদিকে আলিপুরের বোমার মামলা যথারীতি চলিতে লাগিল। মামলার আসামীদের উপর কর্তৃপক্ষের আচরণ ইতোপূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু আসামীগণ ক্রমেই অধৈর্য্য হইয়া পড়িতে লাগিলেন। একমাত্র আদালতের কয়েক ঘণ্টা সময় তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের সহিত আলাপ করিতে পারিতেন। বাকী অন্য সব সময় তাঁহাদিগকে নির্জ্জন কারাকক্ষে অতিবাহিত করিতে হইত। উল্লাসকর, হেমচন্দ্র ও বারীন্দ্র প্রমুখ বিপ্লবীগণ ক্ষেপিয়া গিয়া নর্টন ও ইন্স্পেক্টর্ সাম্‌সুল আলামকে শাসাইতে সুরু করিলেন। ঠিক এই সময়েই ১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৯০৯ সাল, আদলত প্রাঙ্গনে বোমার মামলার সরকারী উকিল শ্রীযুক্ত আশুতোষ বিশ্বাস মহাশয় দক্ষিণহস্তে পক্ষাঘাতগ্রস্ত এক যুবক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক নিহত হন। শুনিতে পাওয়া যায় আশুতোষ বাবুর এই মামলা করিবার আদৌ ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু যেহেতু তিনি পাব্লিক প্রসিকিউটর সেইজন্য বাধ্য হইয়া তাঁহাকে এই মামলা পরিচালনা করিতে হইয়াছে।

এই সময় ভারতের সর্ব্বত্র ডাকাতি ও হত্যা আরম্ভ হইয়া গেল। এই সময় পুলিশ সাহেব লোম্যানকে হত্যার চেষ্টায় বিনয় বসু নামক একজন যুবক ধৃত হইয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। তাহার পরই যশোহরে, হলুদবাটি নামক স্থানে ডাকাতি হইল। ঢাকায় বাহরা ডাকাতিতে ৩০০০০৲ টাকা, আর রামেন্দ্রপুর ট্রেণ ডাকাতিতে ২০০০০৲ টাকা লুণ্ঠিত হইল। এই সব ডাকাতির আসামীদের অনেকেরই দ্বীপান্তর ও দীর্ঘ মেয়াদী সশ্রম করাদণ্ড হইল।

আলিপুরের বোমার মামলায় ধৃত আসামীদের প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে বাঁকুড়ার রজনী নামে একটি ছেলে পুলিশের চর হইয়া ছদ্মবেশে যুগান্তর পত্রিকা অফিসে কার্য্য করে এবং গোপনে গোপনে সকল আসামীর সম্বন্ধে পুলিশকে সংবাদ দেয়। কাজেই এতগুলি আসামীকে একত্রে ধরা পুলিশের পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল। যখন মামলা চলিতেছিল তখনই শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ এই বিশ্বাসঘাতকের বাঁকুড়াতেই ভবলীলা সাঙ্গ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

আলিপুর বোমার মামলার বিচারক ছিলেন জাষ্টিস বিচ্‌ক্র্যাফ্‌ট্। এই বিচক্র্যাফ্‌ট

ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় শ্রীঅরবিন্দের নিম্নের স্থান আধিকার করেন। শ্রীঅরবিন্দের সহিত তিনি বিলক্ষণ পরিচিত ছিলেন, শ্রীঅরবিন্দের ব্যবহার তাঁহার আপনভোলা সন্ন্যাসী মূর্ত্তি দেখিয়া বিচ্‌ক্র্যফ্‌ট্‌ মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না শ্রীঅরবিন্দ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া এমন যুদ্ধেব আয়োজন করিতে পারেন। তাই তিনি যখনই দেখিয়াছেন গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে শ্রীঅরবিন্দকে জড়াইবার পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তখনই তিনি একটি প্রতিবাদ খাড়া করিয়া দিয়া শ্রীঅরবিন্দের পক্ষ সমর্থনকারী চিত্তরঞ্জন দাসকে সে সম্বন্ধে পরিষ্কার বুঝাইয়া দিতে বলিয়াছেন। তিনি ধারণা করিয়াছিলেন, "অবিনাশই অরবিন্দের সংসারের ম্যানেজার ও শরীর রক্ষক, আবার এই অবিনাশ যুগান্তর অফিস খুলিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়া বোমা তৈয়ার ও অস্ত্রশস্ত্র আনাইবার জন্য বারীন্দ্রকে দিতেন। বারীন্দ্রও মধ্যে মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের নিকট পারিবারিক কুশল জিজ্ঞাসা করিতে আসিতেন। বারীন্দ্র ও অবিনাশ শ্রীঅরবিন্দকে কিছু না জানাইয়াই তাঁহার নামে প্রচার কার্য্য চালাইতেন। তবে দুই একখানি চিঠি পত্রে শ্রীঅরবিন্দ দেশের স্বাধীনতা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা সত্য। কাজেই শ্রীঅরবিন্দের স্বাধীনতা-প্রিয়তা জন্মগত হইলেও তিনি সক্রিয় বিপ্লবে উৎসাহী এ কথা বলা চলে না। তাহার পর চিত্তরঞ্জন দাস আসামী পক্ষের সওয়াল শেষ করিবার সময় যাহা বলিয়াছেন তাহাই সত্য। চিত্তরঞ্জন শ্রীঅরবিন্দের সওয়াল শেষ করিয়া বলিয়াছেন—"Long after this controversy is hushed to silence, long after this turmoil this agitation will have ceased, long after he is dead and gone. But he is the Poet of Patriotism, Prophet of Nationalism and Lover of Humanity. His words will be echoed and re-echoed not only in India but over the distant seas and distant lands."

১৯০৯ সালের ৬ই মে, একবৎসর চারিদিন মামলা চলিবার পর, আলিপুর বোমার মামলার রায় দিবার জন্য জাষ্টিস্ বিচ্‌ক্র্যফ্‌ট্‌ আদালতে আসন গ্রহণ করিলেন। "বন্দেমাতরম্" ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া প্রহরী পরিবেষ্টিত হইয়া বন্দীদের গাড়ীতে আসামীরা আদালতে উপস্থিত হইলেন। প্রথমতঃ একে একে সকলকে অবতরণ করাইয়া দুইজনকে একত্রে হাতকড়া লাগাইয়া আদালত গৃহের লৌহ খাঁচার মধ্যে আনিয়া আসামীগণকে বসান হইল। আদালত গৃহ, বাহিরের প্রাঙ্গন, রাস্তা, লোকে-লোকারণ্য হইয়া গেল। কিন্তু কাহারও মুখে শব্দ নাই, সকলে মৃত্যুর ন্যায় ধীর, স্থির ও নিস্তব্ধ। সকলেই ভাবী অমঙ্গলের বার্ত্তা শ্রবণ করিবার জন্য রুদ্ধশ্বাসে

প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। ঠিক এই সময় আদালতগৃহের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া উল্লাসকর তাঁহার চিরাচরিত প্রথায় সি, আই, ডি, ইন্‌স্পেক্টর সামসুল আলামকে (ইনি এই মামলা চালাইবার পুরস্কার স্বরূপ পরে ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদ লাভ করেন) উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"এইবার ফাঁসির হুকুম হইবে, শীঘ্র পান সিগারেট খাওয়াও, নতুবা তোমায় শেষ করবো।" হেমচন্দ্র দাসও আসিয়া উল্লাসের সহিত যোগ দিলেন। তখন সামসুল আলাম হাসিয়া বলিলেন "দাঁড়াও দাদা, রায় বাহির হইলেই পান সিগারেট খাওয়াইব।" তাহারপরই আবার সব নিস্তব্ধ হইয়া গেল। পুলিশ, উকিল, ব্যারিষ্টার সকলেই নীরবে অবস্থান করিতে লাগিল। সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া জাষ্টিস্ বীচ্‌ক্র্যফ্‌ট্ বলিতে লাগিলেন—"সুদীর্ঘ রায় এখন পাঠ করিবার সময় নহে—তাই আমি এখন অভিযুক্ত আসামীদের মধ্যে কাহারা দোষী এবং কাহারা নির্দ্দোষ তাহাই বলিব। সকল চার্জে (১২১, ১২১ক, ১২২, ১২৩, ১৯এফ ধারায়) অভিযুক্ত করিয়া আমি বারীন্দ্র ও উল্লাসকরকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিলাম। ইহারা ইংরাজ-রাজত্ব উচ্ছেদ করিবার ষড়যন্ত্রের মূল।" এই সময় উল্লাসকর, লৌহ পিঞ্জরের ভিতর হইতে বারীন্দ্র এবং সকল সহকর্ম্মীদের উৎসাহিত করিবার জন্য চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"বারীনদা, শালাদের মেরে দিয়েছি।" (তাহার অর্থ উল্লাসকরের পূর্ব্বে ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছিল—ফাঁসির হুকুমে সে দণ্ড আর ভোগ করিতে হইবে না।) সামসুল আলাম, কোর্ট ইন্‌স্পেক্টর ও প্রহরীরা আসিয়া উল্লাসকরকে বুঝাইয়া তাঁহার আনন্দ-উল্লাস প্রশমিত করিলেন। তখন জজ সাহেব পুনরায় পাঠ আরম্ভ করিলেন—"হেমচন্দ্র দাস, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—যদিও ইহারা ইংরাজ রাজত্ব উচ্ছেদ কল্পে পূর্ণ সহায়তা করিয়াছেন তথাপি প্রত্যক্ষ হত্যাকাণ্ড করিয়াছেন বলিয়া কোন প্রমাণ নাই, এজন্য ইহাদের অপরাধ বারীন্দ্র ও উল্লাসকর হইতে কিছু কম। তাই এই দুইজনকে ঐ সমস্ত ধারায় অভিযুক্ত করিয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিপ্লবের সূচনা হইতে বারীন্দ্রকে সর্ব্ব প্রকারে সাহায্য করিয়াছেন—এবং হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল, ইন্দুভূষণ রায়, সুধীর সরকার, শৈলেন্দ্রনাথ বসু, বিভূতিভূষণ সরকার, প্রভৃতি আরও এই কয়েক জন গোড়া হইতে বিপ্লব কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন এজন্য ইহাদেরও ১২১ক, ১২২, ১২৩ ধারায় অভিযুক্ত করিয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করিলাম। আর ৮ জন অল্পদিন হইল ইহাদের সহিত যোগ দিয়াছেন সেজন্য ইহাদের ১০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিলাম। আরবিন্দ ঘোষ, দেবব্রত বসু, দীনদয়াল বসু, শচীন সেন, শচীন

সেনগুপ্ত, পূর্ণ সেন, নলিনী গুপ্ত, বিজয় নাগ, প্রভৃতি বাকী কয়েকজনকে অভিযুক্ত করিবার মত প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য ও প্রমাণ না থাকায় ইঁহাদের আমি বেকসুর মুক্তি দিলাম" ইত্যাদি।

এই রায় শ্রবণ করিবার পর আদালত গৃহে ভীষণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। যাঁহারা খালাস পাইলেন তাঁহারা দণ্ডিত আসামীদিগের জন্য হা-হুতাশ করিতে লাগিলেন। এতাবৎ ঋষি শ্রীঅরবিন্দ ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়াছিলেন। যখন বারীন্দ্র আসিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন তখন শ্রীঅরবিন্দ বলিয়া উঠিলেন "ভয় কি তোমার ফাঁসি হ'বে না।" তাঁহার দক্ষিণ হস্ত অবিনাশচন্দ্র যখন তাঁহার নিকটে আসিলেন তখন তিনি তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন "তোমার সাত বৎসরের বেশী কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে না।" তারপর মুক্ত আসামীরা তাঁহাদের আত্মীয় স্বজনের সহিত বাড়ী ফিরিলেন। আর দণ্ডিত আসামীদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া প্রহরীরা বন্দী গাড়ীতে উঠাইল। চতুর্দ্দিক হইতে পুনরায় "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি উত্থিত হইল। আর সঙ্গে সঙ্গে গান আরম্ভ হইল—"তোরা দেখে যা' বাঙ্গালীর আত্মবলিদান, বারীন্দ্র উপেন্দ্র, উল্লাস, ইন্দু, হেমচন্দ্র দাস, ইত্যাদি।"

আলিপুরের বোমার মামলার আপীল হাইকোর্টে যাইবার পূর্ব্বেই বারীন্দ্র ও উল্লাসকরের আপীল করা প্রয়োজন হইল। কারণ তখনকার নিয়মানুসারে ফাঁসীর আসামীর রায় বাহির হইবার সাত দিনের দিন ফাঁসি হইয়া থাকে। বারীন্দ্রবাবু আপীল করিতে রাজী হইলেন, কারণ শ্রীঅরবিন্দের ভবিষ্যদ্বাণীতে তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ছিল। কিন্তু উল্লাসকর আপীল করিতে রাজী হইলেন না। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস প্রভৃতি আইনজীবীরা মিলিয়া উল্লাসকরকে আপীলের দরখাস্তে সহি করাইতে পারিলেন না। ফাঁসীর দুই একদিন আগে উল্লাসকরের মা ও বাবাকে আনাইয়া বহুকষ্টে উল্লাসকরকে আপীলে সহি করান হইল। এদিকে বারীন্দ্রের ও উল্লাসকরের ফাঁসীর মঞ্চ পরিষ্কৃত হইতেছিল। জল্লাদও প্রস্তুত হইয়া ছিল। কিন্তু ফাঁসীর দুই দিন পূর্ব্বে দরখস্তে সহি করাইয়া ফাঁসী বন্ধ করা হইল সকলেই এই দুই ব্যক্তির জীবন কামনা করিতেছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের আন্তরিক চেষ্টায় ও পরিশ্রমে সকলের জন্যই হাইকোর্টে আপীল করা হইল।

হাইকোর্টের চীফ্‌জষ্টিস্ জেঙ্কিনস্ ও জষ্টিশ কারানড্রফ উভয়ে মিলিয়া ইঁহাদের পুনর্বিচার আরম্ভ করিলেন। কয়েক মাস ধরিয়া মামলা চলিল। এই মামলা হাইকোর্টে চলিবার সময় একদিন পুলিশের ডেপুটি সুপারিনটেন্‌ডেণ্ট সামসুল আলাম যেমন মামলার কাজ শেষ করিয়া আদালত গৃহের সিঁড়িতে অবতরণ করিবেন (২৪শে জানুয়ারী, ১৯১০ সাল) অমনি বীরেন্দ্র দত্তগুপ্ত নামে এক যুবক তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "Are you Samsul Alam"?

উত্তর হইল "Yes" "পাকড়াও, পাকড়াও" সঙ্গে সঙ্গে গুড়ুম গুড়ুম করিয়া আওয়াজ হইল। সামসুল আলাম মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। বীরেন্দ্র সিঁড়ি বাহিয়া ছুটিলেন কিন্তু কিছুদূর গিয়া ধরা পড়িলেন। বীরেন্দ্রকে দিয়া তৎকালীন বিপ্লবী নেতা যতীন্দ্র মুখার্জ্জিকে জড়াইতে পুলিশ চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহা ব্যর্থ হইয়াছিল। বীরেন্দ্রের ফাঁসী তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী শহীদদের মত বন্ধুবান্ধবহীন কারাগারে অনুষ্ঠিত হইল।

ক্রমে হাইকোর্টের রায় বাহির হইল। ২।৩ জন মুক্তি পাইলেন। কয়েক জনের দণ্ডের মিয়াদ কমিয়া গেল। বারীন্দ্র ঘোষ ও উল্লাসকরের ফাঁসীর পরিবর্ত্তে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হইল। হেমচন্দ্র ও উপেন্দ্রের পূর্ব্ব সাজাই (যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর) বহাল রহিল। অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও বিভূতিভূষণ প্রভৃতি কয়েক-জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের পরিবর্ত্তে ৭ বৎসর ও হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল, ইন্দুভূষণ রায় প্রভৃতি কয়েকজনের দশ বৎসর দ্বীপান্তর হইল। শৈলেন্দ্র বসুর ৫ বৎসর মাত্র জেল হইল।

তখনও বাংলার চতুর্দ্দিকে যুবকেরা লুকাইয়া লুকাইয়া গান করিতে লাগিল "তোরা দেখে যা বাঙ্গালীর আত্মবলিদান।" এই ঘটনা হইতে সমগ্র দেশ বিষাদাচ্ছন্ন হইল। অভিভাবকেরা সর্ব্বদাই ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন। সকলেই নিজের নিজের ছেলেদের সাবধান করিতে লাগিলেন। "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি ও স্বদেশী দ্রব্য বিক্রয় পর্য্যন্ত বন্ধ হইল। সেই সময় জেল হইতে বাহির হইয়া একমাত্র মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন খাঁ প্রত্যহ বৈকালে ৫।৭টি ছেলে লইয়া "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি করিতে লাগিলেন এবং স্বদেশীদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য প্রচার সুরু করিলেন। আর ইহারই ফলে তাঁহার বার বার কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইল।

ইংরাজি "কর্ম্মযোগিন" ও বাংলা "ধর্ম্ম" পত্রিকা

শ্রীঅরবিন্দ জেল হইতে বাহির হইয়া তাঁহার মেশো মহাশয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্রের বাসায় উঠিলেন। কৃষ্ণকুমার মিত্র তখনও নির্ব্বাসন দণ্ড ভোগ করিতে ছিলেন। তাঁহার বন্ধুদের মধ্যে শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, সুবোধ মল্লিক তখনও নির্ব্বাসিত। বিপিনচন্দ্র পাল বিলাতে গিয়া "স্বরাজ" নাম দিয়া একখানি ইংরাজি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। দেশের রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ম্যাঞ্চেষ্টারে ও ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র ভারতের স্বাধীনতার দাবী জানাইয়া ও ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি এই প্রচার করিতে লাগিলেন যে ভারতে বিপ্লব থামাইবার জন্য শাসন সংস্কারের আশু প্রয়োজন।

এদিকে ভারতবর্ষে সকলেই ভয়ে বিহ্বল। কেহ কাহারও সহিত সাক্ষাৎ

পর্য্যন্ত করিতে সাহস করেন না, পাছে পুলিশের সন্দেহ দৃষ্টিতে পড়িয়া তাঁহারা অহেতুক নির্যাতন ভোগ করেন। দেশের সর্ব্বত্র মিটিং ও বক্তৃতা একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। অবশ্য এই সময়ে বিপ্লববাদীদের মধ্যে যতীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাসবিহারী বসু প্রভৃতি গোপনে গোপনে শ্রীঅরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরামর্শ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ বুঝিতে পারিলেন কর্ম্মপন্থার পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। বিপ্লববাদীদের আর এখন উত্তেজনার বশে কাজ করিলে চলিবে না, উহাদের এখন উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। অতএব এই সকল বিপ্লববাদীদের এখন কর্ম্মযোগ অভ্যাস করা প্রয়োজন। শ্রীঅরবিন্দ চাহিলেন এদেশে এমন একটি ত্যাগী কর্ম্মী-দল যাহারা ভারতের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিবে। তিনি হৃদয়ঙ্গম করিলেন যে গীতা ধর্ম্মের আশ্রয় না লইলে ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতা আসিবে না, বা ভারতের স্বাধীনতা রক্ষা করা যাইবে না। আর যদি তিনি উত্তেজনা পূর্ণ বক্তৃতা দিয়া পূর্ব্ববৎ আন্দোলন চালাইবার ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাহাও ব্যর্থ হইবে, কারণ সেক্ষেত্রে পুলিশে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে। ফলে কোন কাজ হইবে না। দেশকে সংগঠিত করা যাইবে না।

সেইজন্য তিনি ১৯০৯ সালের জুন মাসে, ইংরাজিতে "কর্ম্ম যোগিন" পত্রিকা বাহির করিলেন। ঐ পত্রিকার কর্ম্মকর্ত্তা হইলেন শ্রীযুক্ত গিরিজাসুন্দর চক্রবর্ত্তী। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মজুমদার, নলিনী গুপ্ত প্রভৃতি কয়েকজন যুবক তাঁহাকে এই কার্য্যে সহায়তা করিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ কর্ম্মযোগিনের সংবাদাদি লিখিবার ভার গ্রহণ করিলেন। 'কর্ম্মযোগিন' বাহির হইবা মাত্র ভারতের সর্ব্বত্র আবার নবযুগের সূচনা হইল। ইতোমধ্যে শ্রীঅরবিন্দ বাংলার কয়েকস্থানে সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতাদি করিয়া জনমত গঠন করিতে লাগিলেন। ইংরাজি কর্ম্মযোগিন পত্রিকা হাজারে হাজারে বিক্রয় হইতে লাগিল। তখন উত্তরপাড়ার শ্রমজীবী সমবায়ের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন যুবক আসিয়া শ্রীঅরবিন্দের নিকট হইতে 'কর্ম্মযোগিনের' অনুবাদ বাহির করিবার অনুমতি লইয়া হাওড়ার কর্ম্মযোগ প্রেস হইতে বাংলা "কর্ম্মযোগিন" বাহির করিতে লাগিলেন। এই কাগজখানিও বাংলার ঘরে ঘরে সমাদৃত হইল। এই কাগজের সহিত শ্রীরামপুরের শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সিংহ ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রভৃতি বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই সময়ে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার, স্বদেশী গান সমূহ একত্র করিয়া "বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত" নাম দিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। তারপর শ্রীঅরবিন্দ কর্ম্মযোগিন অফিস হইতে "ধর্ম্ম" নামে আর একখানি বাংলা পত্রিকা নিজেই বাহির করিলেন।

এই সময় চন্দননগরের শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়ও "প্রবর্ত্তক" বাহির করেন।

শ্রীঅরবিন্দ বাংলাতে কথা বলিতে পারিতেন না। কিন্তু বরোদায় বসিয়া তিনি বাংলাভাষা যাহা শিক্ষা করিয়াছিলেন তাহার উপর নির্ভর করিয়া "ধর্ম্ম" পত্রিকার সম্পাদনার ভার লইলেন। কিন্তু তাঁহার প্রতিভা সব কিছুই সুন্দর করিয়া তুলিত। কাজেই অচিরকাল মধ্যে "ধর্ম্ম" পত্রিকা বাংলা দেশের ঘরে ঘরে স্থান পাইল। এই পত্রিকার মধ্য দিয়া শ্রীঅরবিন্দ ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া তিলে তিলে মরিবার শক্তি অর্জ্জন করিবার শিক্ষা বাঙ্গালীকে দিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি তাহাদের শিখাইলেন যে কর্ম্মের মধ্যে নামের মোহ থাকা উচিত নয়, কারণ তাহা থাকিলে কোন কর্ম্মই সুসম্পন্ন হয় না। বিনা সংযমে, বিনা সাধনায় যে কাজ সম্পন্ন তাহা স্থায়ী হয় না। সেইজন্য তিনি বাঙ্গালীকে নামের মোহ পরিত্যাগ করিয়া শক্তি-সাধক হইয়া শক্তিপূজায় ব্রতী হইতে উপদেশ দিলেন।

তিনি যখন এইরূপ প্রচারকার্য্য চালাইতেছিলেন তখন দেশে বৈপ্লবিক আন্দোলন বন্ধ হইয়াছিল সত্য কিন্তু স্বদেশী ডাকাতি সমানভাবে চলিতেছিল। শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উত্তরপাড়ায় শ্রমজীবী সমবায় স্থাপন করিয়াছিলেন। এইরূপ এক একটি সংস্থাকে অবলম্বন করিয়া গোপনে গোপনে বৈপ্লবিক আন্দোলনও চলিত। তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড মিণ্টো বহু চেষ্টা করিয়াও এই অশান্তি দমনে কৃতকার্য্য হইলেন না। তখন তদানীন্তন ভারত-সচিব মর্লে ভারতের জন্য একটা শাসন সংস্কারের খসড়া প্রণয়ন করিয়া ভারতে প্রেরণ করিলেন। মডারেট দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ সেই খসড়ার কিঞ্চিদ্ রদবদল করিয়া গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। তখন নিম্নলিখিত নেতাদের মুক্তি দেওয়া হইল:—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দাস ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

যখন শ্রীঅরবিন্দ দেখিলেন মডারেট দল মর্লে-মিণ্টো শাসন-সংস্কার মানিয়া লইতেছে, তখন তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহার সম্পাদিত ইংরাজি কর্ম্মযোগিন্-এ "An open letter to my countrymen" বলিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিলেন। উহাতে তিনি দেশের মডারেট মনোবৃত্তি সম্পন্ন লোকদের সতর্ক করিয়া দিয়া এই সাবধান বাণী উচ্চারণ করিলেন—"এই ভূয়া-সংস্কার গ্রহণ করিলে দেশের প্রভূত ক্ষতি হইবে। তবে যদি ইংরাজদের বস্তুতঃ সদিচ্ছা আছে এইরূপ বিশ্বাস তাঁহাদের থাকে, তাহা হইলে ইংরাজ যে বলে

ভারতবাসী উপযুক্ত হয় নাই—সেই কথার অসারতা প্রমাণ করিবার জন্য আপনারা দেশের শিক্ষাটি ইংরাজের শাসন বর্জ্জিত করিয়া নিজ হাতে লইয়া দেখান ভারত-বাসী উপযুক্ত কি না? এখন ইংরাজেরা যাহা দিতে চাহিতেছে তাহা পাকা গোলামি ছাড়া আর কিছুই নহে।" গরমদলের সমর্থকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "ইংরাজেরা মনে ভাবিতেছে শুধু দমনে কোন ফল হইবে না! তাই তাহারা দুমুখো শাসনের ব্যবস্থা করিতেছে। ইহাতে দেশের কতকগুলি লোক প্ররোচিত হইলেও গরমদলের কেহই ইহা গ্রহণ করিবে না। যদিও ইংরাজ ভাবিতেছে গরমদলকে শেষ করিয়া দিয়াছে—কিন্তু তাহা আসলে সত্য নয়। ইহারা 'গোকুলে' দিনে দিনে বাড়িয়া চলিযাছে। এখন শুধু নেতার জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। এই নেতাও জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; ইনি যেদিন কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন সেইদিন ইংরাজ রাজত্বের অবসান হইবে।"

ইহার কিছুকাল পরে স্বামী বিবেকানন্দের একান্ত অনুগতা শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা শ্যামপুকুরের "কর্ম্মযোগিন" অফিসে মতিলাল রায় প্রভৃতি কয়েকটি যুবককে লইয়া আবির্ভূতা হইলেন। শ্রীঅরবিন্দ তখন শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মজুমদার, নলিনী গুপ্ত, বিজয়কৃষ্ণ নাগ প্রভৃতির সহিত তাস খেলায় বিভোর ছিলেন। যদিও শ্রীঅরবিন্দ কথাবার্ত্তা খুব কম কহিতেন এবং তাঁহার সামনে বয়স্কেরাও কথা কহিতে ভয় পাইতেন, তথাপি তাঁহার সরল ব্যবহারে বিশেষতঃ ছেলেদের সহিত ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইত। ভগিনী নিবেদিতা আসিবামাত্রই তাস খেলা বন্ধ হইয়া গেল। নিবেদিতা শ্রীঅরবিন্দকে বলিলেন আপনার লেখা "An open letter to my countrymen" দেখিয়া কর্তৃপক্ষ বিলক্ষণ অসন্তুষ্ট হইয়াছে। কিন্তু এই প্রবন্ধে রাজদ্রোহিতার অপরাধে আপনাকে শাস্তি দিতে পারিবে না বলিয়া পুলিশের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট সামসুল আলামের হত্যার সহিত আপনাকে জড়িত করিয়া আপনার নামে চার্জ্জ দিয়া আপনাকে নির্ব্বাসিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। আপনি আমার কথার প্রতিবাদ না করিয়া আমার সাথে আসুন। এই বলিয়া নিবেদিতা শ্রীঅরবিন্দকে সঙ্গে লইয়া উদ্বোধন অফিস অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তারপর তিনি শ্রীঅরবিন্দকে চন্দননগরে মতিলাল রায়ের নিকট কিছুকাল রাখিয়া পণ্ডিচেরিতে লইয়া গেলেন। ইহার দুই-চারিদিন পরে শ্রীঅরবিন্দের নামে গ্রেপ্তারি পরওয়ানা বাহির হইল। কিন্তু কেহই জানিল না শ্রীঅরবিন্দ কোথায়? যতীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাসবিহারী বসু প্রভৃতি তাঁহার অনুরক্ত যুবকদের মধ্যে কেহই একথা ১৯১৪ সালের ৪ঠা আগষ্টের পূর্ব্বে কাহাকেও বলেন নাই।

শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী নির্ব্বাসন হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া "অমৃতবাজার

পত্রিকায়” শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষের সহকারী হইয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন এবং ‘কর্ম্মযোগিনে’ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীঅরবিন্দের অনুপস্থিতিতে ‘কর্ম্ম-যোগিন্’ ও ‘ধর্ম্ম’ সম্পাদনার ভার শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দকে ধরিতে না পারায় পুলিশের কোপদৃষ্টি এই দুইখানি পত্রিকার উপর পড়িল। পুলিশ আসিয়া ‘কর্ম্মযোগিন’ ও ‘ধর্ম্ম’ পত্রিকার ছাপাখানায় তালাচাবি লাগাইয়া দিয়া শ্রীঅরবিন্দের সন্ধান করিয়া ফিরিতে লাগিল। বাংলা ‘কর্ম্মযোগিন’ খানিও পুলিশ বন্ধ করিয়া দিল। বলা বাহুল্য—১৯০৯ সালে “সন্ধ্যা, যুগান্তর, নবশক্তি, বন্দেমাতরম্” প্রভৃতি গরম দলের সব কাগজগুলি গবর্ণমেণ্ট বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

পরবর্ত্তী বৈপ্লবিক কার্য্য

পূর্ব্ববর্ত্তী বৈপ্লবিক যুগের বীরগণ তখন আন্দামান দ্বীপে কারাজীবন অতি-বাহিত করিতেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহারা কিরূপভাবে বন্দীজীবন যাপন করিতেন তাহার উল্লেখ না করিলে বিপ্লবীদের উপর ব্রিটিশ প্রভুদের মনোভাব সম্যগ উপলব্ধি করা যাইবে না। বারীন্দ্র, উপেন্দ্র, উল্লাস, অবিনাশ, হেমচন্দ্র, ইন্দুভূষণ হৃষিকেশ, সুধীর, বিভূতি ননীগোপাল, প্রভৃতি সকলেই আন্দামানে ঘানি টানিবার কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। প্রত্যহ এইরূপ ঘানি টানিয়া সকলের শরীর খারাপ হইতে লাগিল। বন্দীদের কোন বিষয়ে কোন কথা, ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় কিছুই বলিবার অধিকার ছিল না। কাজে কাজেই উল্লাসকর, ননীগোপাল, ইন্দুভূষণ প্রভৃতি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে জেল কর্ত্তৃপক্ষ যতই অত্যাচার করুক তাহারা কিছুতেই ঘানি টানিবেন না। উপেন্দ্র, হেমচন্দ্র প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত বয়োঃজ্যেষ্ঠ বন্দীগণ তাঁহাদের বহুপ্রকারে বুঝাইলেন—ভবিষ্যতের জন্য তাঁহাদের প্রাণ বাঁচাইয়া রাখা কত প্রয়োজন তাহা বলিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাদিগকে নিরস্ত করা গেল না। উল্লাসকরকে দাঁড় করাইয়া হাতে হাতকড়ি দিয়া (Standing hand-cuff) দিয়া সারাদিন রাত্রি অমানুষিক ভাবে প্রহার করা হইতে লাগিল। ইন্দুভূষণ ও ননীগোপাল অনুরূপ অকথ্য অত্যাচার সহ্য করিতে লাগিলেন। ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া ইন্দুভূষণ তাঁহার জাঙ্গিয়া ছিঁড়িয়া গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিয়া সকল অত্যাচারের হাত এড়াইলেন। উল্লাসকর নির্য্যাতন ভোগ করিয়া প্রবল জ্বরে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। কিন্তু ইহার উপর জেল ওয়ার্ডার তাহার ঘাড় ধরিয়া এইরূপ মচ্‌কাইয়া দিল যে তাঁহার চৈতন্য লোপ পাইল। চিকিৎসার পর যখন তাঁহার জ্বর বন্ধ হইল তখন দেখা গেল উল্লাসকর একেবারে

উন্মাদ হইয়া গিয়াছেন। ইংরাজ প্রভুগণ যে বিপ্লবীবীরকে ফাঁসি দিয়া ভারত হইতে বিপ্লববাদ মুছিয়া ফেলিতে চাহিয়াছিল আজ সেই বীরকে কৌশলে উন্মাদ করিয়া দিয়া—"ভদ্রলোকের এককথা" এই প্রবাদের মর্য্যাদা রক্ষা করিল। ননীগোপাল ৭২ দিন জ্ঞানতঃ মুখ দিয়া কোন আহার্য্য গ্রহণ না করিয়া তিলে তিলে মৃত্যুকে বরণ করিতে লাগিলেন। এই সময় বিলাত হইতে সার রেজিন্যাল্ড ক্রাড্‌ক্‌ আন্দামানে বন্দীদের দেখিতে আসিলেন। তিনি অন্যান্য বিপ্লবীদের ঘানি টানার পরিশ্রম হইতে অব্যাহতি দিয়া নারিকেল দড়ি তৈয়ারীর কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

১৯১০ সালের প্রথম দিকে ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা আরম্ভ হয়। এই মামলায় লাঠিয়াল পুলিনচন্দ্র দাস ও তাঁহার অন্যূন ৪০ জন সহকারী জড়িত হইয়া পড়েন। পুলিন দাস তখন সবেমাত্র নির্ব্বাসন হইতে ফিরিয়াছেন। পুনরায় এই মামলায় জড়িত হইয়া ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। তাঁহার অধিকাংশ শিষ্য বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। পুলিন দাসের কারাদণ্ডের পর, অনুশীলন সমিতির কর্ত্তৃত্বভার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দত্ত (গিরিজাবাবু) ও মাখনলাল সেন গ্রহণ করেন। পরে এই নগেন্দ্রনাথ দত্তই বেনারস ষড়যন্ত্রের মামলায় অন্যান্য আসামীদের সহিত ধৃত হইয়া দণ্ডিত হন।

স্বদেশী আন্দোলনকে উৎসাহিত করিবার উদ্দেশে যে সমুদয় পুস্তক তৎকালে প্রকাশিত হইয়াছিল পুলিশ তাহাদের সব কয়খানিই বাজেয়াপ্ত করিয়াছিল এবং তাহাদের পুনঃ প্রকাশ বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। ইহার মধ্যে শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত "বর্ত্তমান রণনীতি" ও "মুক্তি কোন পথে?" প্রভৃতি বিখ্যাত পুস্তকগুলি (যাহা যুগান্তর পুস্তকালয় হইতে বাহির হইয়াছিল) অবিনাশ-বাবুর আলিপুর বোমার মামলায় দণ্ড হইবার আগেই বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল (২রা মে; ১৯০৮ সাল)। ১৯১০ সালে, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এসব পুস্তকের অনুকরণে "কঃ পন্থা" নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। পুলিশ তৎক্ষণাৎ এই পুস্তকখানি বাজেয়াপ্ত করে। কিরণবাবু ১২৪ (ক) ধারায় অভিযুক্ত হইয়া দণ্ডলাভ করেন।

এই সময়ে বিখ্যাত গার্ডেনরীচ ডাকাতি হয়—ইহা উপলক্ষ্য করিয়া হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা আরম্ভ হয়। এই ডাকাতিতে সংশ্লিষ্ট নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (মানবেন্দ্রনাথ রায়), যতীন মুখার্জ্জি (বাঘা যতীন), সুরেশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের বহুযুবক ধৃত হন। বহুদিন ধরিয়া এই মামলা চলে এবং পরিশেষে অনেকেই মুক্তিলাভ করেন।

যখন বাংলার এইরূপ অবস্থা, তখন সুদূর মহারাষ্ট্রে মহারাষ্ট্র তিলক বালগঙ্গাধর

তিলক কারাগারের অন্তরালে আবদ্ধ। পাঞ্জাবের বীরকেশরী লালা লাজপত রায়, সর্দ্দার অজিত সিং নির্ব্বাসিত। কাথিয়াবাড়ের অধিবাসী স্বামিজী কৃষ্ণবর্ম্মা লণ্ডনে "ইণ্ডিয়া হাউস" নাম দিয়া একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই প্রতিষ্ঠান বৃত্তি দিয়া মহারাষ্ট্রিয় যুবকগণকে বিলাতে শিক্ষালাভের জন্য আনয়ন করিত। এই বৃত্তি লাভ করিয়া মদনমোহন ধিংড়া ও বিনায়ক দামোদর সাভারকর তখন বিলাতে ব্যারিষ্টারি পড়িতেছিলেন। এই সময়ে কামাথ নামে একজন পার্শি মহিলাও এই প্রতিষ্ঠানের সংশ্রবে আসেন। বিনায়ক দামোদর সাভারকরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গণেশ দামোদর সাভারকর পুণা হইতে "লঘু অভিনব ভারত মেলা" নাম দিয়া বিপ্লববাদীদের জন্য একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। ইহার অনিবার্য্য ফলস্বরূপ গণেশ সাভারকরের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। ইহাতে স্বামিজী কৃষ্ণবর্ম্মার বিলাতের ছাত্রগণের মধ্যে এক নিদারুণ বিক্ষোভ ও অশান্তির সৃষ্টি হয়। লণ্ডনেই ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। মদনমোহন ধিংড়া প্রতিহিংসা পরায়ণ হইয়া লণ্ডন সহরে সার কার্জ্জন ওয়ালিকে হত্যা করেন। লালকাকাকেও এই সময় হত্যা করা হয়। মদনমোহন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া বিলাতেই ফাঁসী-কাষ্ঠে প্রাণ উৎসর্গ করিলেন। ইহাতে বিপ্লব বন্ধ হইল না। ভারতে নাসিক জেলায় ম্যাজিষ্ট্রেট্ জ্যাক্সন সাহেব বিপ্লবীদের হস্তে নিহত হইলেন। ভারতের তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড মিণ্টোকে আমেদাবাদে হত্যা করিবার চেষ্টা হয়। এই উপলক্ষে আরও তুইজন বিপ্লবী যুবকের প্রাণদণ্ড হয়। সুদূর লণ্ডনে অবস্থানকারী বিনায়ক দামোদর সাভারকর এই সমুদয় হত্যাকাণ্ডে জড়িত আছেন এই সন্দেহে লণ্ডনের পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া ভারতবর্ষে প্রেরণ করে। কিন্তু যে জাহাজে তিনি ভারতবর্ষে আসিতেছিলেন সেই জাহাজ যখন দক্ষিণ ফ্রান্সের উপকূলে আসিয়া পৌছাইল তখন বিনায়ক দামোদর সাভারকর সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া ফ্রান্সের মার্সাই বন্দরে উঠেন। ফ্রান্সের পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া পুনরায় ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দেয়। ভারতবর্ষে আনিয়া বিনায়ক দামোদরের বিচার হয়; ও বিচারে তাঁহার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হয়। শুনা যায় এবারেও তাঁহাকে যখন জাহাজে করিয়া আন্দামানে লইয়া যাওয়া হইতেছিল তখন তিনি হাতের হাতকড়া ভাঙ্গিয়া, কোমরের দড়ি ছিঁড়িয়া, সশস্ত্র পুলিশের চোখে ধূলি দিয়া পুনরায় সমুদ্রে লাফাইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত অকৃতকার্য্য হইয়া আন্দামানে নীত হন। আন্দামানে আসিয়া তাঁহার অগ্রজ গণেশ দামোদর সাভারকর এবং বাংলার বিপ্লবীবীর বারীন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির সহিত পোর্টব্লেয়ারের সেলুলার জেলে ঘানি ঘুরাইবার কাজ পান্। এই সময় গোয়ালিয়র ও সাতরার ষড়যন্ত্রে বহুযুবক কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া এই স্থানে নীত

হন। এই সময় পাঞ্জাবের বিপ্লবী নেতা হরদয়াল আমেরিকায় গিয়া বিপ্লবের কার্য্য করিতে থাকেন। তিনি তথায় "গদর দল" গঠন করিয়া ভারত ও ভারতের বাহিরে সকল ভারতীয় বিপ্লবীদের সহিত সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেন। তাহার পর ১৯১৪ সালের ৪ঠা আগষ্ট, পৃথিবীব্যাপী মহাসমরের সূত্রপাত হয়। এই সময় হরদয়াল জার্ম্মাণীতে গমন করিয়া জার্ম্মান সম্রাট কাইজারের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করেন, ও ভারতে বিপ্লব চালাইবার সম্পর্কে কথাবার্ত্তা চালাইতে লাগিলেন। হরদয়াল এই সময় জার্ম্মানিতে অধ্যাপনায় নিযুক্ত বিপ্লবী শ্রীযুক্ত তারকনাথ দাসের সংস্পর্শে আসিলেন। শ্রীযুক্ত তারকনাথ দাস মহাশয় হরদয়ালকে তাঁহার বিপ্লবী আন্দোলনে যথেষ্ট সাহায্য করিতে লাগিলেন।

সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের ভারত আগমন ও বঙ্গভঙ্গ রদ

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯১১ সাল একটি স্মরণীয় বৎসর। ঐ বৎসরে পর পর অনেকগুলি বিপ্লবাত্মক কার্য্যের অনুষ্ঠান হয় এবং বহু যুবক দণ্ডিত হন। মর্লি-মিণ্টো রিফর্ম ব্যর্থ হইল। সম্রাট এডওয়ার্ডের মৃত্যুর পরেই তাঁহার পুত্র সম্রাট পঞ্চম জর্জ ভারতসম্রাট হইয়া ভারতের তদানীন্তন রাজধানী কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন। কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াই সম্রাট বঙ্গভঙ্গ রদ করিয়া দিলেন এবং কলিকাতা হইতে রাজধানী দিল্লীতে লইয়া যাইবার আদেশ দিলেন। মর্লির Settled fact এতদিন পরে Unsettled হইয়া গেল। ঠিক সেইদিনেই পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর মনোমোহন ঘোষ বরিশালে আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। আবার রাজকুমার নামক এক যুবক মৈমনসিংহের ইন্‌স্পেক্টরকে গুলি করেন।

১৯১২ সালের প্রারম্ভে ভারতের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লী নগরীতে স্থানান্তরিত করা হইল। ইহার কিছু পূর্ব্বে রাজাবাজার বোমার মামলা, বরিশাল ষড়যন্ত্রের মামলা, খুলনা ডাকাতি ও ষড়যন্ত্রের মামলা আরম্ভ হয়। এই সময় বাংলায় বিপ্লবীদের কার্য্য পূর্ণ উদ্যমে চলিতে আরম্ভ হইল। আর এই বিপ্লবী-দলকে পরিচালনা করিতে লাগিলেন বাংলার বিপ্লবী সন্তান শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বসু, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। এই তিনজন নেতা অপূর্ব্ব কৌশলে পুলিশের চোখে ধূলি দিয়া এই বিপ্লব পরিচালনা করিতেন ও প্রকাশ্য স্থানে সমবেত হইতেন। তাঁহাদের মিলন স্থান ছিল ১।১ কলেজ স্কোয়ার শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসের বাহিরের ঘর। সেইস্থানে তাঁহারা মিলিত হইয়া প্রেসের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদারের সম্মুখে সর্ব্ব বিষয়ে

আলোচনা ও পরামর্শ করিতেন। কখনও কখনও বৈকালের দিকে তাঁহারা ওভারটুন হলের নীচে অবস্থিত শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের "শ্রমজীবি সমবায়ে" মিলিত হইয়া শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মজুমদার ও অমর বাবু প্রভৃতির সহিত আলোচনাও করিতেন। কখনও কখনও কমলালয়ে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর নিকট খরিদ্দার হিসাবে গিয়া আলোচনা চলিত। শ্রীযুক্ত যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বিপ্লবীরা ক্রেতা হিসাবে এইসব স্থানে উপস্থিত হইয়া পরস্পরের সন্ধান ও সংবাদ গ্রহণ করিতেন। রাসবিহারী বসু তাঁহার সহপাঠী শ্রীযুক্ত উল্লাসকর দত্তের নিকট বোমা তৈয়ারীর ফরমুলা যাহা পূর্ব্বে তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা লইয়া চন্দননগরে গিয়া শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়ের নেতৃত্বাধীনে বোমা তৈয়ার আরম্ভ করিয়া দিলেন। আর চন্দননগর হইতে বৈপ্লবিক কার্য্যের জন্য বহু রিভলবার সংগ্রহ করিলেন। এই সময়েই রাসবিহারী বসু কাশীতে গমন করিয়া একটি বোমার কারখানা নির্ম্মাণের জন্য শচীন্দ্রনাথ সান্ন্যালের সাহায্য গ্রহণ করেন এবং অচিরে সেখানেও একটি বিপ্লবী দল গঠন করিয়া আসেন।

১৯১২ সালে ভারতের তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড হার্ডিং নূতন রাজধানীতে প্রবেশ করিতে মনস্থ করিলেন। এই রাজধানী প্রবেশের দিনটি অতি স্মরণীয়। এইদিনে বীর বিপ্লবী রাসবিহারী বসু হার্ডিংএর উপর বোমা নিক্ষেপ করিয়া সহস্র পুলিশ ও সৈনিকের সন্ধানী দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়া পলায়ন করেন। ঘটনার বিবরণটি বড় চমকপ্রদ।

নির্দ্ধারিত দিনে সমস্ত ভারতীয় রাজন্যবর্গ ও লক্ষ লক্ষ সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়া হস্তীপৃষ্ঠে তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে লইয়া লর্ড হার্ডিং নূতন রাজধানীতে প্রবেশ করিতেছেন। রাসবিহারী বসু বহুদূরে অবস্থান করিয়া একটি দড়ির সাহায্যে সুকৌশলে তাঁহার উপর বোমা নিক্ষেপ করিলেন। বোমাটি সকলকে চমকিত করিয়া বিদীর্ণ হইল। সঙ্গে সঙ্গে বহুমূল্য হাওদা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। হস্তীচালক তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইল। লাঠপত্নী হস্তীপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পড়িয়া গেলেন। স্বয়ং বড়লাট আহত অবস্থায় হস্তীপৃষ্ঠেই পতিত হইলেন। কিন্তু তিনি অচৈতন্য হইবার পূর্ব্বেই আদেশ দিলেন যেন কাহারও উপর কোন অত্যাচার না হয়। পুলিশ তন্নতন্ন করিয়া দিল্লীর প্রত্যেক বাড়ী অনুসন্ধান করিল, নবাগতের তালিকা লইয়া অনুসন্ধান চলিল, কিন্তু রাসবিহারীর কোন সন্ধান মিলিল না। রাসবিহারী পুলিশকে ফাঁকি দিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন। রাসবিহারীকে গ্রেপ্তারের জন্য তখনই ২০০০০৲ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হইল। আর দুইজনকে সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করিয়া ফাঁসি দেওয়া হইল।

বৰ্দ্ধমান বন্যায় বিপ্লবীদের মিলন

১৯১৩ সালে বৰ্দ্ধমানে ভীষণ প্লাবন হইল। বাংলার যুব আন্দোলন আরম্ভ হইবার পর এই প্রথম ব্যাপক সেবাকার্য্যের সুযোগ মিলিল। বৰ্দ্ধমান প্লাবিত হইয়া গিয়াছে এই সংবাদ পাইবামাত্র বাংলা, আসাম ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে দলে দলে যুবক সেবাকার্য্য করিবার জন্য খাদ্য ও পরিধেয় লইয়া বৰ্দ্ধমান অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রামকৃষ্ণ মিশন, মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটি হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট বড় নানান্ প্রতিষ্ঠানের তরফ হইতে স্বেচ্ছাসেবক ও সাহায্য প্রেরণ করা হইতে লাগিল। মাড়োয়ারী, বাঙ্গালী এমনকি সকল সম্প্রদায়ের যুবক বৰ্দ্ধমানে আসিয়া মিলিত হইলেন। দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, মুন্সেফ্ অবিনাশ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি এই সেবাদলের সহিত বৰ্দ্ধমানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেবাকার্য্যের জন্য চাউল, চিঁড়া, কলা, কাপড় হাজার হাজার বস্তা প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু বৰ্দ্ধমানে উপস্থিত হইয়া সকলে দেখিলেন রেলওয়ে প্লাটফর্ম অবধি জলে জলময়। চতুর্দ্দিকে জল থৈ থৈ করিতেছে। স্বেচ্ছাসেবকে ও জিনিস পত্রে প্ল্যাটফরম ভর্ত্তি হইয়া গেল, গাড়ীও ভর্ত্তি রহিল, কিন্তু কোন সেবাকার্য্য চলিল না। দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা কি করিয়া সেবাকার্য্য করা যাইবে তাহা ভাবিয়া আকুল হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা যুবকগণের সহিত এই বিষয়ে পরামর্শ আরম্ভ করিলেন। এদিকে যাঁহারা ট্রেনের কামরার মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন তাঁহারা কিছু করিবার না পাইয়া চায়ের আড্ডা জমাইয়া পরস্পরের সহিত পরিচয় করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। এই পরিচয়ের ফলে দেখা গেল পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তরবঙ্গ এমন কি আসামের কয়েকটি ছেলেও এই দলে রহিয়াছেন। ইহা ছাড়া মাড়োয়ারী, মাদ্রাজী, বিহারী প্রভৃতিও এই দলে আছেন। এই পরিচয় সূত্র ধরিয়া তখন সকলে পরামর্শে প্রবৃত্ত হইলেন—কেমন করিয়া সকলের সহিত একটা সম্বন্ধ ও যোগাযোগ রক্ষা করা যায়। এই দুরূহ কার্য্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন শ্রীযুক্ত মাখনলাল সেন। সেই সময়ে বিপ্লবীদলের নিম্নলিখিত বিশিষ্ট যুবকগণ উপস্থিত ছিলেন:—ডাঃ অমূল্য উকিল, রাসবিহারী বসু (ছদ্মবেশে), যতীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি (ছদ্মবেশে), যাদুগোপাল মুখার্জ্জি, অতুল ঘোষ, অমর ঘোষ, নরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য (ছদ্মবেশে), সুরেশ মজুমদার, মনোমোহন ভট্টাচার্য্য, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মতিলাল রায়, ঢাকার হেমেন্দ্র ঘোষ, চট্টগ্রামের সূর্য্য সেন, নোয়াখালির হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত, সত্যেন মিত্র, নগেন্দ্রনাথ গুহরায়, কুমিল্লার বসন্ত মজুমদার, কলিকাতার বিপিন গাঙ্গুলি, গিরীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুকুল মুখার্জ্জি, হরিকুমার চক্রবর্ত্তী,
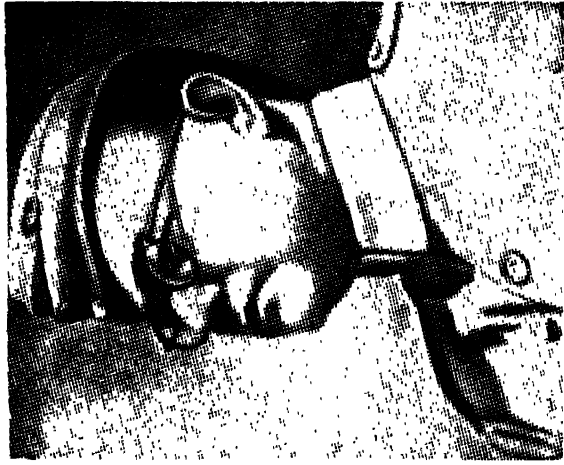
স্বাধীনতা সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ নায়ক—
নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু

স্বাধীন ভারতের প্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্রী—
পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু

মাদারিপুরের পূর্ণদাস, মৈমনসিংহের সুরেন ঘোষ, বরিশালের প্রজ্ঞানন্দ স্বামী, রামকৃষ্ণ মিশনের গণেন মহারাজ, হিন্দুস্থান ইন্স্যুরেন্সের শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার, বেঙ্গলী কাগজের আর, এস্, শর্ম্মা প্রভৃতি। তখন শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্রের আদেশে শ্রীযুক্ত মাখনলাল সেন সকল দলকে লইয়া বর্দ্ধমানের মানচিত্র তৈয়ার করিয়া কিভাবে সেবাকার্য্য করা যাইবে তাহার একটি বিশদ কর্ম্মপদ্ধতি প্রণয়ন করিলেন। ইহার ফলে সকলদলের জিনিষপত্র মাখনলাল সেন ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের তত্ত্বাবধানে আসিয়া পড়িল। তখন হইতে সুনির্দ্দিষ্ট, সুচিন্তিত ও সুনিয়ন্ত্রিত পথে অতি দক্ষতার সহিত সেবাকার্য্য আরম্ভ হইল। সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের জাগ্রত দৃষ্টি এই যুবক সম্প্রদায়ের উপর পতিত হইল। বন্যার পঞ্চম দিবস অবধি বর্দ্ধমানের ষ্টেশন ও সহর ছাড়া সর্ব্বত্র এক বুক জল ছিল। কর্ম্মীদের বুক জল ভাঙিয়া প্রত্যহ ১০ মাইল পর্য্যন্ত সেবাকার্য্যে যাইতে হইত।

কোমাকাটামারুর বিদ্রোহ

আমেরিকার গদর পার্টির কাজ পূর্ণ উদ্যমে চলিতে লাগিল। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ও যে সকল বাঙ্গালী তখন আমেরিকায় অবস্থান করিতেছিলেন তাঁহারা সকলেই গদরপার্টির সভ্য হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত আমেরিকায় গিয়া প্রথমে সেখানে "যুগান্তর" আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার পর এই যুগান্তর আশ্রমের দল গদর পার্টির সহিত মিলিত হইল। গদর পার্টির নেতা হরদয়াল জার্ম্মান সম্রাটের নিকট অর্থ সাহায্য ও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ভারতীয় বিপ্লববাদীদের দ্বারায় ভারতের সর্ব্বত্র বিদ্রোহ আরম্ভ করিতে মনস্থ করিলেন। এই সময় ২শত ডলার না দিলে কোন ভারতীয়কে কানাডায় নামিতে দেওয়া হইত না। মালয়ের গুরুদিৎ সিং একখানি জাপানী জাহাজ ভাড়া করিয়া কানাডায় যাইবার সকল্প করিলেন। সেই জাহাজখানির নাম ছিল "কোমাকাটামারু"। এই জাহাজ কলিকাতা ও সিঙ্গাপুর হইতে বহুযুবক লইয়া কানাডায় আসিয়া উপস্থিত হইল কিন্তু কানাডায় তাহাদিগকে অবতরণ করিতে দেওয়া হইল না। তখন সেই জাহাজখানি কানাডার উপকুল ত্যাগ করিয়া সিঙ্গাপুরে আসিল কিন্তু সেখানেও কাহাকেও নামিতে দেওয়া হইল না। কাজেই "কোমাকাটামারু" যুবকদলকে লইয়া বজবজে আসিয়া উপস্থিত হইল। গবর্ণমেণ্ট এই জাহাজের যাত্রীদের বিপ্লবী মনে করিয়া এইস্থানে অবতরণ করিতে না দিয়া সরাসরি পাঞ্জাবে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। যাত্রীরা ইহাতে ক্ষুব্ধ হইল। তাহারা কেহই গভর্ণমেণ্টের এই অন্যায় আদেশ পালন করিতে স্বীকৃত হইল না। ফলে পুলিশের সহিত যাত্রীগণের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। এই সংঘর্ষে বহুব্যক্তি হতাহত হইল। গুরুদিৎ সিং এবং অন্যান্য বহুযাত্রী

পলায়ন করিল, আর অনেকেই ধৃত হইল। পাঞ্জাবেব কর্ত্তার সিং পাঞ্জাবে একটি বিপ্লবীদল ইহার পূর্ব্বেই গঠন করিয়াছিলেন। এই কোমাকাটামারুতে তাঁহার দলের বহু বিপ্লবীও ছিল। এই সমুদয় বিপ্লবীর সহিত তিনশত শিখকে বন্দী করা হইল। ইহাতে পাঞ্জাবে বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। সেই বিদ্রোহের নৈতৃত্ব গ্রহণ করিলেন রাসবিহারীবাবু, ভাই পরমানন্দ, ও পিংলে। এই সময় মহারাষ্ট্র তিলক মুক্তি লাভ করিলেন এবং কংগ্রেসকে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করাইবার জন্য ১৯১৫ সালের কংগ্রেসে যোগ দিলেন। এই সময়ে বাংলার বিপিনচন্দ্র পালের বিলাতের "স্বরাজ" পত্রিকাখানি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট বন্ধ করিয়া দিলেন। কাজেই বিপিনবাবুকে ভারতবর্ষে ফিরিতে হইল। কিন্তু বোম্বাইতে পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে বন্দী করা হইল। একমাস কারাভোগের পর তিনি মুক্তি লাভ করিলেন। এই সময় লালা লাজপত রায় ও অজিত সিং আমেরিকা হইতে দেশে ফিবিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু যেহেতু ভারতে পদার্পণ করিলেই তাঁহাদের নির্ব্বাসন দণ্ড ভোগ করিবার আশঙ্কা ছিল, সেইহেতু তাঁহাদের তখনকার মত আমেরিকা ত্যাগ করা হইল না।

জার্ম্মাণ-ভারতীয় ষড়যন্ত্র ও পৃথিবীব্যাপী মহাসমর

পূর্ব্বেই প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা হইয়াছে কেমন করিয়া হরদয়াল জার্ম্মাণ সম্রাটের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহার পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হইতেছে। যখন আমেরিকায় লালা লাজপত রায় ও সর্দ্দার অজিত সিং ভারতীয় বিপ্লবাদেব সহিত কার্য্য করিতেছেন সেই সময় রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ আফ্‌গানিস্থানে গিয়া স্বাধীন-ভারত-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য রাশিয়ার সাহায্যের আশায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ আফগানিস্থানে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিয়া অস্থায়ী ভারত গবর্ণমেণ্ট স্থাপন করেন। কিন্তু রাশিয়া জার্ম্মানীর সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইবার সঙ্কল্প করিতেছে জানিয়া এবং সে ক্ষেত্রে রাশিয়ার সাহায্য পাওয়া দুরাশামাত্র বিবেচনা করিয়া রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ আমেরিকায় আসিয়া লালা লাজপত রায় ও সর্দ্দার অজিত সিংহের সহিত মিলিত হইলেন। ভাই পরমানন্দ ও পিংলে আসিয়াও তাঁহাদের সহিত যোগদান করিলেন। বিপ্লবী তারকনাথ দাস তখনও জার্ম্মানীতে অধ্যাপনার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

তাহার পব ১৯১৪সালের ৪ঠা আগষ্ট, পৃথিবীব্যাপী মহাসমর আবম্ভ হইল। হরদয়াল আমেরিকা হইতে জার্ম্মানীতে আসিলেন। তারকনাথ দাসের চেষ্টায় জার্ম্মান সম্রাট হরদয়ালকে সকল রকম সাহায্য দিতে স্বীকৃত হইলেন। জার্ম্মানী প্রথমে বেলজিয়াম দখল করিয়া একে একে ফ্রান্স ও রাশিয়ার বহুস্থান

দখল করিয়া লইলেন। এই সময় হরদয়াল জার্ম্মানীর নিকট হইতে টাকা লইয়া আমেরিকায় টাকা পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে গদর দলের কাজ পূর্ণ উদ্যমে চলিতে লাগিল। গদর দল শ্যাম ও বর্ম্মা সীমান্তে আন্দোলন সুরু করিলেন। এই দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ, বখরতউল্লা, বরেন চ্যাটার্জ্জি, তারকনাথ দাস ও চাপলঙ্কর। ইঁহারা প্রাচ্যের সকল বিপ্লবীদের সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়া চলিলেন। চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী ও হেরম্ব গুপ্ত আমেরিকা হইতে ভারতের সকল প্রদেশের বিপ্লবীদের সহিত সংযোগ স্থাপন করিবার ভার লইলেন।

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, বিপিন গাঙ্গুলি প্রমুখ বিপ্লবীগণ ১৯১৪ সালে রডা কোম্পানীর অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করিয়া বহু অস্ত্র শস্ত্র লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে বার্ড কোম্পানীর কুড়িহাজার টাকা ডাকাতি হইল। অর্থ ও অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ হইল। অবশ্য এই ডাকাতি উপলক্ষে শ্রীযুক্ত নিরোদ হালদার প্রভৃতি কয়েকজনের কারাদণ্ড হইল। আমেরিকা হইতে চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী ভারতীয় বিপ্লবী দলের সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে টাকাকড়ি ও অস্ত্র-শস্ত্র তাঁহারা জার্ম্মান সম্রাটের নিকট হইতে পাইবেন। তাহার দ্বারায় ১৯১৫ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ভারতব্যাপী বিদ্রোহ আরম্ভ করিতে পারা যাইবে। রাসবিহারী বসু ও শচীন সান্ন্যালের প্রচেষ্টায় ভারতীয় বিপ্লববাদীরা সকলে একযোগে কার্য্য আরম্ভ করিতে স্বীকৃত হইলেন। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি এই সময় বাংলার বিপ্লবীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী ও হেরম্ব গুপ্ত ঐ সময় একযোগে বর্ম্মা আক্রমণ করিবেন স্থির করিলেন। সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো ও বহুস্থান হইতে গদর দল শ্যামরাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সংবাদ দিলেন যে জার্ম্মানি হইতে একটি জাহাজ অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া ব্যাটেভিয়ায় আসিবে। তখন রাসবিহারী বসু জাপানে গমন করিলেন। সেই জাহাজ ভারতে আসিলে কোথায় কোন জিনিষ ডেলিভারি দিবে তাহা স্থির করিবার জন্য নরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য মার্টিন নাম গ্রহণ করিয়া ব্যাটেভিয়ায় গমন করিলেন। বাংলার জন্য যেসকল অস্ত্র-শস্ত্র আসিয়াছে সুন্দরবন হইতে তাহার ডেলিভারি লইবার জন্য বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি, যাদুগোপাল মুখার্জ্জি ও অতুল ঘোষ নিযুক্ত হইলেন। অস্ত্র পৌঁছাইবা মাত্র ইঁহাদের প্রথম ও প্রধান কার্য্য স্থির হইল ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ দখল করা। ভোলানাথ মুখার্জ্জি ব্যাঙ্ককে থাকিয়া সেখানকার অস্ত্র-শস্ত্র ডেলিভারি লইবার জন্য প্রস্তুত রহিলেন। স্থির হইল অবনীকান্ত মুখার্জ্জি জাপান হইতে মাল খালাস করিবেন। কিন্তু ভারতীয় পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ এই সমুদয় সংবাদ রাখিতেছিলেন। সুতরাং জাহাজখানি বন্দরে আসিবামাত্র ব্রিটিশের হাতে ধরা পড়িয়া গেল। ইহার পর সুরু হইল

দেশের ধরপাকড়। নরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য পলায়ন করিয়া জাপানে উপস্থিত হইলেন। রাসবিহারী বসু পূর্ব্ব হইতেই জাপানে অবস্থান করিতেছিলেন। ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। এই সময় শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তীকে বাংলার বিপ্লবী দলের নেতা বলিয়া গ্রেপ্তার করা হইল। তাঁহাকে একমাস দালাণ্ডা হাউসে নির্জ্জন করাবাসে রাখিয়া তাঁহার মুখ হইতে বিপ্লবীদলের সংবাদ আদায় করিবার বৃথা চেষ্টা করা হইল। তখন তাঁহাকে কালিমপঙে নির্ব্বাসিত করা হইল। দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ ইহাতে প্রবল আপত্তি করিলেন, তিনি পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেব ও তদানীন্তন বাংলার লাট কারমাইকেলকে বলিলেন "আমার ব্যারাকপুরের বাড়ীতে নির্ব্বাসিত কর। আমি শ্যামসুন্দরকে প্রত্যহ আমার নিজের সঙ্গে আফিসে আনিব এবং আফিস হইতে সঙ্গে লইয়া যাইব। তাহাতে টেগার্ড সাহেব বলিলেন, "কিছুদিন পরে আপনার কথা শুনিতে পারি"। কিন্তু এখন ঐরূপ করিলে বিপ্লববাদীরা প্রশ্রয় পাইবে। যাই হোক সুরেন্দ্রনাথের কথা গবর্ণর সাহেবও রক্ষা করিতে পারেন নাই। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ শেট ও তাঁহার ভাইদের পুলিশ ধরিল। তাঁহাদের অপরাধ তাঁহারা শ্যামসুন্দরের বিশিষ্ট বন্ধু। সঙ্গে সঙ্গে কত যুবক ধৃত হইলেন তাহার ইয়ত্তা নাই। ৫৩ জনকে নির্ব্বাসিত করা হইল। জার্ম্মানির অস্ত্র ডেলিভারি লইবার জন্য যতীন মুখার্জ্জি, চিত্তপ্রিয় প্রভৃতি কয়েকজন যুবক বালেশ্বরে আত্মগোপন করিয়া ছিলেন। অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, যাদুগোপাল মুখার্জ্জি প্রভৃতি কয়েকজন ছদ্মবেশে পুলিশের চোখে ধূলা দিয়া ফিরিতে লাগিলেন। মাখন সেন, বসন্ত মজুমদার, সত্যেন মিত্র, নগেন্দ্র গুহরায়, পূর্ণ দাস, অতুল ঘোষ, অমর ঘোষ, অনুকুল মুখার্জ্জি, সুরেন ঘোষ, প্রভৃতিকেও নির্ব্বাসিত করা হইল। দালান্দা হাউসে এইবার বহু বিপ্লবীর অন্তর বিনিময় হইল। তারপর সকলকে পৃথক পৃথক স্থানে পাঠান হইল। এইসময় মহারাষ্ট্রিয় যুবক পিংলে আমেরিকা হইতে জাপানে আসিয়া রাসবিহারী বসুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে জানাইলেন যে বহুযুবক আমেরিকা হইতে ভারতবর্ষে ফিরিয়া বিপ্লব আরম্ভ করিবেন স্থির করিয়াছেন। অতঃপর পিংলেও ভারতবর্ষে আসিলেন। ভারতে আসিয়া তিনি এক বাক্স বোমা লইয়া মীরাটের সৈন্যাবাসে প্রবেশ করিবার সময় ধরা পড়িলেন এবং যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। এইসময়ে মীরাট, দিল্লী ও লাহোর ষড়যন্ত্রের মামলা উপস্থিত হয়। এই মামলায় আমীর চাঁদ, অটলবিহারী, বালমুকুন্দ ও বসন্ত দাসের ফাঁসি হয় এবং ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বহুযুবক দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন।

ইহার পরই শচীন সান্ন্যাল, নগেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি বেনারস ও কাকোরী ষড়যন্ত্রের মামলায় ধৃত হন। এবং অনেকে দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন।

এই সময়ে নরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য জাপান পরিত্যাগ করিয়া আমেরিকায় গমন করেন ও সেখানকার ভারতীয় বিপ্লবীদের সহিত একযোগে কার্য্য আরম্ভ করেন। ভারতীয় বিপ্লবীদের মধ্যে পুলিশ যতীন মুখার্জ্জি, নরেন ভট্টাচার্য্য ও রাসবিহারীকে ধরিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিল—কিন্তু তাহাদের চেষ্টা সফল হয় নাই। তাহারা সন্ধান পাইল যে একদল বিপ্লবী জার্ম্মানীর নিকট হইতে অস্ত্র-শস্ত্র খালাস করিয়া লইবার জন্য বালেশ্বরে আত্মগোপন করিয়া আছে। এই সংবাদ পাইবামাত্র স্বয়ং পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেব সৈন্য সামন্ত লইয়া বালেশ্বরে উপস্থিত হইয়া তথাকার গভীর জঙ্গল ঘেরাও করিলেন। কয়েক দিন পরে বিপ্লবীদের সন্ধান পাওয়া গেল। তখন টেগার্ট সাহেব তাহাদের ধরিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিপ্লবীদল উপায়ন্তর না দেখিয়া পুলিশ ও সৈন্যদের সহিত সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমে চিত্তপ্রিয় পুলিশের গুলিতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। তাহার পর যতীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জিও সংঘাতিক ভাবে আহত হইলেন। নীরেন দাসগুপ্ত, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ও জ্যোতিষ টেগার্টের হাতে ধরা পড়িলেন। যতীন মুখার্জ্জিকে কটকের হাঁসপাতালে লইয়া যাইলে তথায় তাঁহার মৃত্যু হইল। নীরেন ও মনোরঞ্জনের ফাঁসি হইল এবং জ্যোতিষের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইল। ইহার মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বে কলিকাতার হেদুয়ার মোড়ে পুলিশ ইনস্পেক্টর সুরেশ ব্যানার্জ্জি বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত হন। এই উপলক্ষে সুরেশচন্দ্র দাস প্রমুখ অনেকগুলি যুবককে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছিল।

ভারতে এ্যানি বেসান্ত কর্ত্তৃক হোমরুল আন্দোলন

১৯১৬সালে এ্যানিবেসান্ত কংগ্রেসে যোগদান করিয়া হোমরুল লিগ আন্দোলন আরম্ভ করেন। ঐ লিগে বিপিনচন্দ্র পাল, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ বহু বিশিষ্ট নেতা যোগদান করিলেন। হোমরুল লীগ যখন উত্তরোত্তর প্রসার লাভ করিতে লাগিল তখন ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতীয়দের সন্তুষ্ট করিবার জন্য মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড রিফর্মের খসড়া প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। উহাতে স্থির হইল যে পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধশেষে ভারতীয় সৈন্যদের পুরস্কার স্বরূপ ভারতীয়দিগকে ডোমিনিয়ন সরকারের মত একটা শাসন ক্ষমতা দেওয়া হইবে। ঐযুদ্ধে শিখেরাই ইংরাজদিগকে রক্ষা করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিল এবং বহু ভারতীয় যুবক আহতদের সেবা করিয়াছিল। এইসময় স্বয়ং সম্রাট পঞ্চমজর্জ্জ শিখ সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য নিজে শিখের পোষাক পরিধান করিলেন, এবং অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া শিখ সৈন্যদের সহিত ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে কিছুকাল যুদ্ধ করেন। এই সময় আমেরিকায় জার্ম্মান ভারতীয়

ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে। নরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য আমেরিকা হইতে পলাইয়া জাপানে রাসবিহারী বসুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হন। রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ পলায়ন করিয়া প্রথমে তুরস্কে আসিয়া রাশিয়ার সাহায্য প্রার্থনা করেন কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইলে তিনি জাপানে চলিয়া আসেন। আমেরিকায় অবস্থিত বহুযুবক এক বৎসর হইতে দুই বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

মণ্টেগু চেম্‌স্‌ফোর্ড রিফর্ম যুদ্ধের পরেই চালু করা হইবে এবং মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা থাকিবে এইরূপ প্রচার করা হইতে লাগিল। ইহাতে ভারতীয় মুসলমানগণ খুসী হইলেন এবং অন্যান্য ভারতীয়েরাও কিছু আশা পোষণ করিতে লাগিলেন। এত আশা ভরসার মধ্যে ১৯১৭ সালে এ্যানিবেসান্তকে আমেরিকায় নির্ব্বাসিত করা হইল। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় জার শক্তি ধ্বংস হইলে লেনিন বল্‌শেভিক আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। তখনও প্রায় সমগ্র রাশিয়া জার্ম্মানির অধিকৃত। এই সময় নরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য জাপান হইতে রাশিয়ায় আগমন করেন ও লেনিনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

ঐ ১৯১৭ সালে কলিকাতার শাঁখারিটোলায় ডাকাতি হয়। ঐ উপলক্ষে যাদুগোপাল মুখার্জ্জিকে ধরিবার আপ্রাণ চেষ্টা হয় কিন্তু ধরিতে না পারায় গিরীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি, প্রভাস দে, প্রতুল গাঙ্গুলি প্রভৃতিকে নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস তখন (১৯১৬ সালের মাঝামাঝি) প্রেসিডেন্সি কলেজে বি, এ অধ্যয়ন করিতেন। সেই সময় উক্ত কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক ভারতীয়দের সম্বন্ধে কতকগুলি হীন উক্তি করায় সুভাষচন্দ্র বসু ও তাঁহার সহপাঠী অনঙ্গমোহন দাম ঐ অধ্যাপক ওটেন সাহেবকে জুতার দ্বারায় প্রহার করেন। ইহার শাস্তি স্বরূপ ইঁহাদিগকে কলেজ হইতে বিতাড়িত করা হইল এবং ইঁহাদের পড়াও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। এইসময় ইঁহারা ১নং কলেজ ষ্ট্রীটে "এডুকেসন্যাল ষ্টোর্স" নাম দিয়া একখানি পুস্তকের দোকান খুলিলেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের সাধন ভজনের দিকে মন যাওয়ায় তিনি তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়া পড়েন। ঐ সময়েই ঐ একই বাটীতে শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র গুহ এবং মনোরঞ্জন গুপ্ত প্রভৃতি মিলিয়া "সরস্বতী লাইব্রেরী" নাম দিয়া আর একটি পুস্তকের দোকান খুলিয়া বসেন। ১৯১৭ সালে অনঙ্গমোহন দাম, অরুণচন্দ্র গুহ, মনোরঞ্জন গুপ্ত প্রভৃতি যুবকদেরও নির্ব্বাসিত করা হয়। ইহার পরই নির্ম্মলচন্দ্র রায় নামে একটি বালক গ্রে ষ্ট্রীটের মোড়ে প্রকাশ্য দিবালোকে ট্রামের উপর চড়িয়া একজন পুলিশ ইনস্পেক্টরকে গুলি করিয়া হত্যা করেন। এই বালক ছিল ব্যারিষ্টার রজত রায়ের নিকট আত্মীয়। হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারদের পক্ষে নির্ম্মলের পিতা যখন রজত রায়ের সহিত

পক্ষের প্রধান ব্যারিষ্টার নর্টন সাহেব ইঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া বলিলেন "আমি নির্ম্মলকে বাঁচাইতে পারি।" তখন নির্ম্মলের পিতা নর্টন সাহেবকে তাঁহার আর্থিক অসচ্ছলতার কথা জানাইলেন। নর্টন সাহেব মাত্র দুইহাজার টাকা লইয়া নির্ম্মলকে বাঁচাইবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। ইহাতে সমস্ত উকিল ও ব্যারিষ্টার নর্টন সাহেবকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। এই সংবাদ পাইয়া বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধান এটর্নি হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বিনা পারিশ্রমিকে নির্ম্মলের মামলার তদ্বির করিতে আরম্ভ করিলেন। এই মাম্‌লা জাষ্টিস ষ্টিভেনস্ ও সাতজন ইংরাজ ও বাঙ্গালী জুরীর হাতে ছিল। নর্টন সাহেব প্রমাণ করিলেন স্বয়ং লাট সাহেব ও পুলিশ দেড়শত সাক্ষীকে ঘুস দিয়া এই মিথ্যা মাম্‌লা খাড়া করিয়াছেন। তাহাতে ৭জন জুরি নির্ম্মলকে নির্দ্দোষ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিলেন। তখন নর্টন সাহেব নির্ম্মলকে কাঠগড়া হইতে হাত ধরিয়া যেমন বাহিরে আনিবেন, অমনি জজসাহেব চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"I disagree with the jury and discharge them". তখন উকিল ব্যারিষ্টারে পূর্ণ আদালত গৃহখানির মধ্যে প্রবল বিক্ষোভের সঞ্চার হইল। সেই সময়ে ইংরাজবাজের সুবিচার সকলেই প্রত্যক্ষ করিল। তারপর ঐ জজসাহেব অন্য ৭ জন জুরি লইয়া পুনরায় বিচার আরম্ভ করিলেন। এবারেও ঐরূপ প্রহসন হইল। সেইদিন আদালতে উকিল ব্যারিষ্টার ছাড়াও বহু গণ্যমান্য ইংরাজ ভদ্রলোক ও মহিলা সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহারা জজসাহেবের এইরূপ জঘন্য আচরণ দেখিয়া তাঁহার উদ্দেশে রুমাল উড়াইয়া "Shame, Shame" ধ্বনি করিতে লাগিলেন। তারপর জজসাহেব তৃতীয়বার ঐরূপ ৭ জন জুরি লইয়া বিচার আরম্ভ করিলেন। তখন ভারতের গভর্ণর জেনারেল দিল্লী হইতে তৎকালীন এ্যাড্‌ভোকেট জেনারেল শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহকে (পরে লর্ড সিংহ) মামলা উঠাইয়া লইয়া ইংরাজের সম্মান রক্ষা করিতে আদেশ দিলেন। এই মাম্‌লায় গভর্ণমেণ্ট পক্ষের ব্যারিষ্টার ছিলেন শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ। এই সময়ে দীনেশ গুপ্ত ও আরও দুইটি যুবক একজন পুলিশ ইন্‌স্পেক্টরকে হত্যা করিয়া মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন।

১৯১৯ সালের শাসন-সংস্কার ও জালিওয়ালানাবাগ

ইংরেজ-বিদ্বেষী সকলকে ক্ষুণ্ণ ও নিরাশ করিয়া ১৯১৮ সালে জার্ম্মানি ইংরাজের নিকট পরাজিত হইল। ইংরাজের এই যুদ্ধ-জয়ের গৌরব একমাত্র ভারতীয় সৈন্যের শৌর্য্যে, বীর্য্যে ও আমেরিকার অর্থ-সাহায্যে অর্জ্জন করা সম্ভব হইয়াছিল। ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধ প্রধানতঃ স্থলযুদ্ধ। ঐ সময় যুদ্ধক্ষেত্রে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত সঙ্কীর্ণ পরিখার মধ্যে অবস্থান করিয়া সৈনিকদের যুদ্ধ

করিতে হইত। দীর্ঘকাল পরিখার মধ্যে অবস্থান করিয়া সমান তেজে যুদ্ধ করিবার শক্তি একমাত্র ভারতীয় ভিন্ন পৃথিবীর অন্য কোন জাতির সৈনিকের ছিল না। কাজেই এই ভারতীয় সৈন্যগণের অপূর্ব্ব বীরত্ব, তীক্ষ্ণ ধীশক্তি ও সহিষ্ণুতার গুণে বিজয়লক্ষ্মী ব্রিটিশের অঙ্কশায়িনী হইলেন। ঘোড়-সৈন্যদের মধ্যেও ভারতীয় ঘোডসৈন্য ইংরাজ ঘোডসৈন্যের সহিত সর্ব্ববিষয়ে সমকক্ষ ছিল। কাজেই এই ঘোডসৈন্যের সাহায্যেও ব্রিটিশের জয়ের পথ সুগম হইয়াছিল। ভারতীয় সৈন্যের এই বীরত্বের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ নৈতিকদায়িত্ব হইতে নিজেদের মুক্ত করিবার দুরপনেয় লজ্জায় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতের বিপ্লববাদীদের কার্য্যকলাপ অপ্রতিহত-গতিতে অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও ১৯১৯ সাল হইতে মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড শাসন-সংস্কার চালু করিবার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু ঐ সংস্কারের রূপ প্রকাশিত হইলে ভারতবাসী ক্ষুব্ধ চিত্তে অবলোকন করিল, অকৃতজ্ঞ ব্রিটিশ ভারতবাসীর সাহায্যের তুলনায় ঐ শাসন-ব্যবস্থায় ভারতীয়দের যে ক্ষমতা দিয়াছে তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর। তখন সারা ভারতের এই শাসন সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন সুরু হইল। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট নূতন শাসন সংস্কারের সর্ব্বপ্রথম সুফল ও সুবিধা প্রদর্শনের অজুহাতে বিপ্লবী-বন্দীদের মধ্যে যাঁহারা প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন না তাঁহাদের সকলকে মুক্তি দিলেন। প্রেস-আইন উঠাইয়া দিলেন। লালা লাজপত রায়কে আমেরিকা হইতে ভারতবর্ষে আসিবার অনুমতি দেওয়া হইল। বাংলার প্রধান মন্ত্রী স্যর সুরেন্দ্রনাথের চেষ্টায় বাংলার নেতা শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী এবং বিপ্লববাদীদের মধ্যে শ্রীযুক্ত অতুল ঘোষ, অমর ঘোষ, অমরেন্দ্র বসু, বসন্ত মজুমদার, সত্যেন্দ্র মিত্র, নগেনগুহরায়, পূর্ণদাস, মনোরঞ্জন গুহ, অরুণচন্দ্র গুহ, কিরণ মুখার্জ্জি, প্রতুল গাঙ্গুলী, মোনোমোহন ভট্টাচার্য্য, মাখন সেন, সুরেন ঘোষ, ভূপেন দত্ত (ডাক্তার দত্ত নহে) ; আশুতোষ লাহিড়ী প্রভৃতি বহু যুবক মুক্তি লাভ করিলেন। তাহার পর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ আত্মগোপনকারীদেরও আত্মপ্রকাশ করিতে অনুরোধ করায় শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, যাদুগোপাল মুখার্জ্জি প্রভৃতি আত্মপ্রকাশ করিলেন। নূতন শাসন-সংস্কার চালু করার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লববাদ দমনের জন্য "রাউল্যাট এ্যাক্ট" পাশ হইল।

মহাত্মা গান্ধি এই সময়ে ভারতবর্ষে ছিলেন। তিনি প্রথমে রাউল্যাট এ্যাক্টের প্রতিবাদ জানাইলেন। তিনি বলিলেন শাসন সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে সকল রকম আন্দোলন বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করায় ভারতীয়দের প্রতি ইংরাজের শুভ ইচ্ছার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। তখন তিনি সকলকে এই "রাউল্যাট এ্যাক্টের" প্রতিবাদ করিতে আহ্বান করিলেন। প্রতিবাদকারীরা যাহাতে সংযত ও অহিংসভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণ করেন তিনি তাহার জন্যও যথোচিত উপদেশ প্রদান

করিলেন। তাঁহারই নির্দ্দেশ মত ১৯১৯ সালের ৬ই এপ্রিল, "রাউল্যাট এ্যাক্টের" প্রতিবাদে ভারতের সর্ব্বত্র সভা সমিতি করিয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। ১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল, এই এ্যাক্টের প্রতিবাদ-কল্পে পাঞ্জাবের জালিওয়ালানাবাগে একটি মহতী সভার অনুষ্ঠান হয়। ঐ সভা বন্ধ করিবার জন্য পাঞ্জাবের তৎকালীন গভর্ণর স্যর মাইকেল ও ডায়ার আদেশ জারি করিলেন। কিন্তু কেহই তাঁহার আদেশে কর্ণপাত করিল না। নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্দ্দিষ্ট সময়ে সহস্র সহস্র নরনারী, শিশু ঐ সভায় যোগদান করিলেন। তখন পাঞ্জাব-লাট মাইকেল ও ডায়ার পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া সভায় সমবেত নিরস্ত্র, নিরীহ ও অহিংস জনতার উপর গুলিবর্ষণ করিবার আদেশ দিলেন। লাট সাহেবের হুকুম পাইবা মাত্র জেনারেল ও ডায়ার সৈন্যদিগকে অবিরল ধারায় গুলি বর্ষণ করিতে বলিলেন। সভাস্থলে হাজার হাজার নরনারী নিহত হইল। ইহার প্রতিবাদ-কল্পে মহাত্মা গান্ধী প্রথমে সত্যাগ্রহ ও খিলাফৎ আন্দোলন, এবং তাহারপর অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। এই অসহযোগ আন্দোলনের ইতিহাস দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত।

যুদ্ধোত্তরকালের বিপ্লবীদল

বিপ্লবীদলের মধ্যে যাঁহারা মুক্তিলাভ করিলেন তাঁহাদের অধিকাংশই মহাত্মা গান্ধীর নির্দ্দেশমত চলিতে লাগিলেন। আর যাঁহাদের নিকট "জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য" তাঁহারা ঐ আন্দোলনের মধ্যে আত্মবলিদানের সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। ১৯১৯ সালে মানবেন্দ্র রায় (নরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য) রাশিয়া হইতে "Vanguard" পত্রিকা বাহির করিয়া ভারতের সর্ব্বত্র প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি লেলিনের বলশেভিক মতবাদ ভারতীয়দের গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ভারতীয় বিপ্লববাদীদের কার্য্য রাশিয়া ও জাপান হইতে ভালভাবেই চলিতে লাগিল।

১৯২০ সালে স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত বহু বন্দী মুক্তি লাভ করিলেন। ইহার মধ্যে বারীন্দ্র, উপেন্দ্র, উল্লাসকর (উন্মাদ অবস্থায়), হেমচন্দ্র প্রভৃতি বিপ্লবী নেতারা মুক্তি পাইলেন। ইহাদের মুক্তির পর শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সম্পাদিত "নায়ক" পত্রিকায় নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি লিখিয়া প্রকাশিত করিলেন :—

"ধর ধর জননী তোমার সাত রাজার ধন এক একটি মাণিককে। স্বর্গের সুষমা সমাবৃত পারিজাতগুচ্ছকে তোমার কঙ্কালসার কাতরবক্ষে সাদরে সোহাগের সহিত ধারণ কর। ইহারা যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঘরে ফিরিয়াছে, তাহা তুষানল অপেক্ষা পটপাকের অন্তর্দাহী জ্বালা অপেক্ষা শতগুণে মর্ম্মস্পর্শী। এমনটি কোন

প্রদেশের কর্ম্মী যুবকদল সহে নাই। কেমন ছেলে? যাহাদের বুকে রাখিলে বুক জুড়ায়, মাথায় রাখিলে মস্তিষ্ক সদানন্দে স্ফীত হয়। কর্ম্মে অপরাজেয়, দেশাত্মবোধে অদ্বিতীয়, সংযম সাধনায় অতুল্য, পেষণ-পীড়ন সহিষ্ণুতায় অনন্যপূর্ব্ব ভাবে রসে ভরপুর, জ্ঞানে-বোধে বিবস্বান সদৃশ—এমন ছেলেদের দল ভারতবর্ষ খুঁজিয়া আর কোথায়ও পাইব না।" ইত্যাদি ইত্যাদি। অন্যান্য সংবাদ-পত্রেও ইঁহাদের সাদর অভ্যর্থনা জানানো হইল।

১৯২০ সাল হইতে বিপ্লবীরা অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের চাপে সম্পূর্ণ চাপা পড়িয়া যায় নাই। ১৯২২ সালের আইন অমান্য আন্দোলনেও বিপ্লববাদীদের কাজ চৌরিচোরায় দেখা দিল। চৌরিচোরার হত্যাকাণ্ডের (দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত) পর মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন পরিত্যাগ করিলে বিপ্লববাদীরা পুনরায় মাথা চাড়া দিয়া উঠিতে আরম্ভ করিল। এই সময় মানবেন্দ্র রায় ও অবনী মুখার্জ্জি ছদ্মবেশে ভারতে আসিয়া বিপ্লববাদীদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। ১৯২৩ সালের শাঁখারিটোলা ষড়যন্ত্র মামলায় বিপিন গাঙ্গুলি প্রভৃতি কয়েকজন যুবক কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। ১৯২৪ সালে গোপীনাথ সাহা পুলিশকমিশনার টেগার্ট সাহেবকে হত্যা করিতে গিয়া ভুলক্রমে ডে নামক একজন সাহেবকে হত্যা করিয়া বসিলেন। গোপীনাথ পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইলেন। গোপীনাথ জানিতেন যে তিনি টেগার্ট সাহেবকে হত্যা করিয়া পৃথিবীর ভার কিছু লাঘব করিয়াছেন। তাই তিনি আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পর পুলিশ-আফিসে টেগার্টকে দেখিয়াই একেবারে বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। গোপীনাথের ফাঁসীর হুকুম হইল। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত গোপীনাথ কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া জেল হাজতে গমন করিলেন। ফাঁসির আদেশের পর গোপীনাথ ঠিক কানাইলাল দত্তের ন্যায় কয়েক পাউণ্ড ওজনে বাড়িয়াছিলেন। ফাঁসিমঞ্চে উঠিয়াও এই বীর অভিভূত হইয়া পড়েন নাই। গোপীনাথ এই অপূর্ব্ব আত্মত্যাগে বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ বীর-শহীদদের আসনে বসিবার স্থান পাইলেন।

এই সময় পুলিশ অসহযোগ আন্দোলনের বহু নেতৃস্থানীয় কর্ম্মীদের নির্ব্বাসিত করে। ইঁহাদিগের মধ্যে সুভাষচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র, অনিলবরণ রায় প্রভৃতি ছিলেন। এই সময় সুভাষচন্দ্রকে মান্দালয়ে নির্ব্বাসিত করা হয়।

১৯২৫ সালের শেষভাগে দক্ষিণেশ্বর ষড়যন্ত্রের মামলা আরম্ভ হয়। এই মামলার তদ্বিরকারক ভূপেন চ্যাটার্জ্জি বিপ্লবীর হস্তে নিহত হন। এই সম্পর্কে অনন্ত সিংহ, প্রমোদ চৌধুরী প্রভৃতি কয়েকজনের ফাঁসি হয় এবং অন্যান্য অনেকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

হস্তে নিহত হন। ইহার ফলে বহুযুবক ধৃত হন। বহুদিন যাবৎ মামলা চলিবার পর, ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরুর ফাঁসি হয়। যতীন্দ্রনাথ দাস, বটুকেশ্বর দত্ত প্রভৃতির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। আসামী যতীন্দ্রনাথ দাস ১৯৩১ সালে জেলে অনশন আরম্ভ করেন। প্রায় ৬২ দিন অনশনে থাকিয়া ১৩ই সেপ্টেম্বর, মৃত্যুমুখে পতিত হন। সেই বীরের শবদেহ জেল হইতে কলিকাতায় আনীত হইয়াছিল। হাওড়া ষ্টেশন হইতে সেই পবিত্র শব লইয়া যে শোভাযাত্রা বাহির হয়, তাহা কলিকাতাবাসীর নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। একমাত্র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পবিত্র শবশোভাযাত্রায়, ১৯২৫ সালে, এইরূপ দৃশ্য কলিকাতাবাসী দেখিয়াছিল।

১৯২৯ সালে মেছুয়াবাজার মামলায় নিরঞ্জন সেন, সতীশচন্দ্র পাক্‌ড়াসী, রমেন বিশ্বাস, প্রভৃতি বহু যুবক কারাদণ্ড প্রাপ্ত হন। এই বৎসরেই বরিশালের ষড়যন্ত্র মামলায় মুকুল সেন, জগদীশ চ্যাটার্জ্জি, নির্ম্মল দাস প্রভৃতি ৩২ জন যুবক ধৃত হন। বিচারে ইহাদের অনেকের কঠোর কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন

১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল, ইতিহাস-বিখ্যাত "চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন" সংঘটিত হয়। এই অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট উল্লেখ যোগ্য ঘটনা। ইহা বিপ্লবীদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টার জলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করে।

১৮ই এপ্রিল বেলা দশটার সময় ৬০ জন বিপ্লবী চারিটি দলে বিভক্ত হইয়া শ্রীযুক্ত সূর্য্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেন। অস্ত্রাগারের সমুদয় অস্ত্র হস্তগত করিয়া তাঁহারা পুলিশ প্রহরীদের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত হন। এই সংঘর্ষের ফলে ১১জন পুলিশ নিহত হয় এবং বহুসংখ্যক পুলিশ আহত হয়। এই দলের মধ্যে সূর্য্য সেন, অম্বিকা চক্রবর্ত্তী, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং, লোকনাথ বল প্রধান ছিলেন। পুলিস প্রহরীদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহারা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া পলায়ন করেন। তাহারপর তাঁহারা সকলেই জালালাবাদ পাহাড়ে আসিয়া আত্মগোপন করেন। তাঁহাদের সন্ধান করিয়া পুলিশ যথাসময়ে সেই পাহাড়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন বিপ্লবীরা পাহাড়ের অন্তরালে থাকিয়া পুলিশ ও সৈনিকের সহিত যুদ্ধ করেন। ক্রমান্বয়ে কয়েকদিন ধরিয়া উভয় দলে যুদ্ধ চলিতে থাকে। বিপ্লবীদের মধ্যে ১৩ বৎসর বয়স্ক বালক হরিগোপাল বল সর্ব্ব প্রথম ব্রিটিশ সৈন্যের হাতে নিহত হন। তাহার পরেই নরেশ রায়, বিধু ভট্টাচার্য্য, ত্রিপুরা সেন, প্রভাস বল, শশাঙ্ক, যতীন্দ্র দাস, মধুসূদন দত্ত, পুলিন ঘোষ প্রভৃতি

নিহত হইলেন। তখন অর্দ্ধেন্দু দস্তিদার, মতিলাল কানুনগো, অম্বিকা চক্রবর্ত্তী প্রবলবেগে শত্রুসৈন্যের উপর অবিশ্রাম গুলি বর্ষণ করিয়া বহুসৈন্য হতাহত করিয়া এই মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন। পরে ইঁহারা সকলেই সৈন্যদের গুলিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। পুলিশ তখন সমগ্র পাহাড় অবরোধ করিয়া অবশিষ্ট বিপ্লবীদের কয়েক জনকে ধরিয়া ফেলিল। জনকয়েক বিপ্লবী পলায়ন করিয়া ফরাসী চন্দননগরে আত্মগোপন করিলেন। ধৃত বিপ্লবীদের বিচারে ফাঁসির হুকুম হইল। ইহার পর ১লা সেপ্টেম্বর, টেগার্ট সাহেবের নেতৃত্বে পরিচালিত সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর সহিত এই সকল পলাতক বিপ্লবীদের চন্দননগরে একটী সংঘর্ষ হয়। এই সঙ্ঘর্ষে জীবন ঘোষাল পুলিশের গুলিতে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

১৯৩০ সালে প্রথম গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাবের সময় লর্ড আরউইনের উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। কলিকাতার রাইটার্স বিল্ডিংএ কারাগার সমূহের ইন্‌স্পেক্টর কর্ণেল সিমসন্ আততায়ীর হস্তে নিহত হইলেন। ইনস্পেক্টর জেনারেল অব পুলিশকেও গুলি করা হয় কিন্তু গুলি তাঁহার গায়ে বিদ্ধ হইল না।

১৯৩১ সালে আর্মেনিয়াম ষ্ট্রীটের হত্যাকাণ্ড, মেদিনীপুরের পেডি সাহেবকে হত্যা, ঢাকায় হড্‌সন ও লোম্যান, মিঃ গ্রাবসীর হত্যা লেবঙ্‌এর গভর্ণর হত্যার চেষ্টা প্রভৃতি পর পর কয়েকটি বৈপ্লবিক কার্য্যে বহুযুবক ধৃত ও দণ্ডিত হন। দীনেশচন্দ্র গুপ্ত ইহার মধ্যে লিপ্ত থাকায় এই মামলায় অভিযুক্ত হন। ১৯৩১ সালের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে কুমারী বীণা দাস বাংলার তদানীন্তন গভর্ণর ষ্ট্যান্‌লি জ্যাক্‌সনকে গুলি করেন। এই সময়েই মেদিনীপুরে পর পর কয়েকটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। ১৯৩২ সালে কুমিল্লা স্কুলের ছাত্রী শান্তি ও সুনীতি কুমিল্লার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট্‌কে হত্যা করে। মুন্সীগঞ্জের ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ও এই সময় বিপ্লবীদের হস্তে নিহত হন। এই সময় রবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি নামক একটি যুবক, বাংলার গভর্ণরকে গুলি করে। কিন্তু গুলিটি গায়ে লাগে নাই বলিয়া রবীন্দ্রের ১৪ বৎসর কারাদণ্ড হয় এবং উজ্জ্বলা নাম্নী একটি ১৪ বৎসরের বালিকা এই সঙ্গে ১৪ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

১৯৩৩ সালে মেদিনীপুরে বার্জ সাহেবকে হত্যা করা হয়। এই হত্যাকাণ্ডে ধৃত হইয়া অনাথবন্ধু পাঁজা, মৃগেন্দ্র গুহ দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। আর ব্রজ চক্রবর্ত্তী, রামকৃষ্ণ রায়, নির্ম্মল ঘোষ প্রভৃতির ফাঁসি হয়। এই বৎসরে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট পুলিশ ইনসপেক্টর হত্যার চেষ্টার জন্য দীনেশ মজুমদার, নলিনী দাস ও জগদানন্দ মুখার্জ্জি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। কিন্তু দীনেশ মজুমদার জেল হইতে পলাইবার চেষ্টা করার অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই সময় হিলি ষড়যন্ত্রের মামলায় বহুযুবক দ্বীপান্তর দণ্ড প্রাপ্ত হন। রংপুর ষড়যন্ত্রের মামলায় হেমচন্দ্র বক্সী প্রভৃতির দ্বীপান্তর হয়। তাহার পর ১৯৩৪ সালে দীনাজপুর ষড়যন্ত্রের মামলায়

বহুবিপ্লবী ধৃত হন। ১৯৩৪ সালে গভর্ণর হত্যার চেষ্টায় ভবানী চট্টোপাধ্যায়ের ফাঁসির হুকুম হয়। এই সময়ে পুনরায় চট্টগ্রামের একটি স্থানে ডাকাতি হয়। ১৯৩৫ সালে টিটাগড় ষড়যন্ত্রে বহুযুবক ধরা পড়িয়া কারাদণ্ড ভোগ করেন। ইহারপর ঢাকা হত্যাকাণ্ডের মামলা আরম্ভ হয়। এদিকে ফরিদপুরে, গোয়েন্দা পুলিশ হত্যা করার চেষ্টা হয়। ১৯৩৭ সালেই চট্টগ্রামে আবার একটি ডাকাতি হয়।

ইহার পর পাঞ্জাবের বিখ্যাত জালিওয়ালানাবাগ হত্যাকাণ্ডের নায়ক সার মাইকেল ও ডায়ার বিলাতে ক্যাম্পটন হলে উধম সিং নামক এক যুবকের হাতে নিহত হন। উধম সিংয়ের ফাঁসি বিলাতেই হইল।

এইরূপ ভারতের স্বাধীনতার জন্য বিপ্লবী সংগ্রাম পৃথিবীর সর্ব্বত্র অল্প বিস্তর চলিয়াছিল। অহিংস আন্দোলনে বিপ্লবীরা সকলেই অহিংস হইতে পারেন নাই। শেষে ১৯৪২ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে "ভারত ছাড়" আন্দোলনে অহিংস বিপ্লবীদের সহিত হিংস বিপ্লবীরা যোগ দিয়া ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যে দুই একদিন যুদ্ধ করিয়াছিল তাহাই ভারতের ভিতরে স্বাধীনতা সংগ্রামের একটী প্রধান যুদ্ধ। এইযুদ্ধে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একটী দলের নেতৃত্ব করার অপরাধে সেদিন পর্য্যন্ত নির্ব্বাসিত ছিলেন। ইহার পরই নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের যুদ্ধ স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যুদ্ধ। এই সংগ্রামই ভারতবাসীকে স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত করিতে পারিয়াছে। এই আগষ্ট বিপ্লবের বিশদ আলোচনা "অসহযোগ আন্দোলনে" (দ্বিতীয় অধ্যায়ে) বর্ণিত হইয়াছে, আর তৃতীয় অধ্যায়ে "আজাদ হিন্দ্ ফৌজের" যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অহিংস অসহযোগ আন্দোলন

পূর্ব্বাভাষ

১৯০৮ সালে বাংলায় বিপ্লববাদী যুবকগণের ব্যাপকভাবে ধরপাকড় স্বরু হইল। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সহিত সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশের বহুনেতা নির্ব্বাসিত হইলেন। রাষ্ট্রগুরু স্বরেন্দ্রনাথ এই বিপর্য্যয়ের মধ্যে কংগ্রেসের সম্মান রক্ষা করিবার জন্য মাদ্রাজে উহার অধিবেশন আহ্বান করিলেন। উক্ত মাদ্রাজ অধিবেশনের সভাপতিত্ব করিলেন রাসবিহারী ঘোষ। এই কংগ্রেসএর নূতন কিছুই করিবার ছিল না, পুরাতন নীতি বহাল রাখিয়া কোন রকমে সভার কার্য্য শেষ করা হইল। ঠিক এই সময়ে অমৃতসরে নিখিল ভারত মোস্‌লেম লীগের একটি অধিবেশন আরম্ভ হইল। তাহাতে লীগপন্থী মুসলমানগণ পৃথক নির্ব্বাচন দাবী করিলেন।

১৯০৯ সালে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সভাপতিত্বে লাহোরে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনেও কংগ্রেস কর্ত্তৃক কোন নূতন প্রস্তাব গৃহীত হইল না। ১৯১০ সালে এলাহাবাদে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হইল তাহাতে মর্লি-মিণ্টো শাসন সংস্কারের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন দাবী করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হইল সত্য, কিন্তু ইংরাজ রাজ সেই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া নির্দ্ধারিত শাসন সংস্কার বজায় রাখিলেন। এই সময় শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল বিলাতে "স্বরাজ" নামে একখানি ইংরাজি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করিতেছিলেন, এবং রাষ্ট্রগুরু স্বরেন্দ্র নাথ বিলাতে গিয়া ভারতবর্ষে নূতন শাসন সংস্কারের দাবী জানাইয়া নানাস্থানে বক্তৃতা করিয়া জনমত গঠন করিতেছিলেন।

তাহার পর আসিল ১৯১৪ সালের পৃথিবীব্যাপী মহাসমর। পণ্ডিচেরীতে বসিয়া শ্রীঅরবিন্দ ইংরাজি ও ফরাসী ভাষায় "আর্য্য" পত্রিকায় ভারতের ধর্ম্ম ও জাতীয়তা এবং অন্যান্য বহু বিষয়ে সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। "War and Self-determination," "League of Nations," "Defence of Indian Culture," "Ideal of human unity" প্রভৃতি ধারাবাহিকপ্রবন্ধ বাহির করিয়া পৃথিবীর সভ্যতা ও সাধনার সহিত ভারতের সভ্যতা ও সাধনার তুলনা করিয়া বিশ্ববাসীকে দেখাইতে লাগিলেন যে ভারত স্বাধীন না হইলে পৃথিবীর সভ্যতা ও কৃষ্টি ধ্বংস পাইবে। ভারত

ব্যতীত কোন দেশ তাহার নৈতিক জীবনে বাঁচিয়া থাকিতে পারিবেনা। এই সময় মোহনচাঁদ গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ভারতবর্ষে আসিলেন এবং মহারাষ্ট্র তিলকও কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া 'কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। বিপিনচন্দ্র পাল সেই সময় বিলাত হইতে ভারতে আসিলেন। কাজেই গরমদল একটু সজাগ হইয়া উঠিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারত রক্ষা আইন পাশ করিলেন এবং ভারতের সর্ব্বত্র হইতে গরম দলের নেতাদের নির্ব্বাসন আরম্ভ হইল। বাংলা দেশ হইতে সেইসময় গরমদলের নেতা হিসাবে শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী এবং সত্যেন মিত্র, বসন্ত মজুমদার, নগেন গুহ রায়, মাখন সেন, নরেন্দ্র নাথ শেঠ প্রভৃতি বহু যুবক নির্ব্বাসিত হইলেন।

১৯১৬ সালে অম্বিকাচরণ মজুমদারের সভাপতিত্বে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। উহাতে চরমপন্থীদের প্রাধান্য লাভের আশায় তিলক মহারাজও এ্যানি বেসান্ত কংগ্রেসে যোগ দিলেন। তাঁহারা স্বাধীনতার জন্য হোমরুল লীগ আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। এদিকে কংগ্রেসের নরমপন্থীগণ ও লীগ মিলিয়া একটি কমিটি করিয়া মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ডের শাসন সংস্কারের খস্‌ড়া মানিয়া লইলেন। মোহনচাঁদ গান্ধী তখন ভারতের সর্ব্বত্র গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া দেশের জনসাধারণের অবস্থা দেখিতেছিলেন। এই সময় তিনি বোলপুরে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে আসিয়া উপস্থিত হন এবং রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব বলিয়া স্বীকার করেন। আর এই সময়েই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধীকে "মহাত্মা" আখ্যায় ভূষিত করেন। মহাত্মা গান্ধী ভারতের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া এই সত্য উপলব্ধি করিলেন যে সহরের কয়টি শিক্ষিত লোকের কথাই দেশের কথা নহে। সুদূর গ্রামের কোটি কোটি অশিক্ষিত জনসাধারণই দেশের কথা বলিবার অধিকারী। তিনি ১৯১৬ সালে কংগ্রেসে যোগদান করিলেন। এই সময় চম্পারণ জেলায় নীলকরদের অত্যাচার কাহিনী তিনি প্রথম শ্রবণ করিলেন।

হোমরুল আন্দোলন

১৯১৬ সালে এ্যানি বেসান্তের হোমরুল লীগের দল প্রাধান্য লাভ করিলেন এবং হীরেনাথ দত্ত প্রমুখ বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চেষ্টায় ১৯১৭ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয় এবং সেই অধিবেশনে এ্যানি বেসান্ত সভানেত্রীর পদ গ্রহণ করেন। কংগ্রেসের এই অধিবেশনেই নরম ও গরমদলের সকলেই সম্মিলিত হইয়াছিলেন। ইহার পর হইতে নরম দলেরা আর কংগ্রেসে যোগদান করেন নাই।

১৯১৭ সালে মহাত্মা গান্ধী বিহার পরিভ্রমণ করিতে বাহির হন।

সেই সময় তিনি নীলকরদের অত্যাচারের প্রতিবাদ করিতে সকলকে আহ্বান করিলেন। মতিহারী যাইবার সময় মহাত্মা গান্ধীর উপর নিষেধ-আজ্ঞা জারি করা হইল। কিন্তু তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিলেন। ইহার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ ভারত সরকার মহাত্মা গান্ধীকে লইয়া চম্পারণের নীলকরদের অত্যাচারের তদন্ত করিবার জন্য একটি কমিটি গঠন করিলেন। এই কমিটির রায় অনুযায়ী "চম্পারণ কৃষিবিল" নামে একটি আইন প্রণয়ন করা হয়। এই আইন পাশ হইলে নীলকরদের অত্যাচার হ্রাস পাইল।

১৯১৮ সালে পণ্ডিত মালব্যের সভাপতিত্বে দিল্লীতে কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন হইল। এই অধিবেশনে নরমপন্থীরা যোগদান করিলেন না। সুতরাং উক্ত অধিবেশনে গরমপন্থীরাই প্রাধান্য লাভ করিলেন। এই ১৯১৮ সালে মহাত্মা গান্ধী আমেদাবাদ মিল মালিকদের বিরুদ্ধে শ্রমিক ধর্ম্মঘট আরম্ভ করাইলেন। কৈরা জেলায় কৃষক আন্দোলন আরম্ভ করাইলেন। দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণ মহাত্মা গান্ধীকেই তাঁহাদের প্রকৃত নেতা বলিয়া পূজা করিতে লাগিল। ঠিক এই সময় ১১ই ডিসেম্বর পৃথিবীব্যাপী মহাসমরের বিরতি ঘোষণা করা হইল। ভারত যুদ্ধকালে বহু সৈন্য ও অর্থ দিয়া ব্রিটেনকে সাহায্য করিয়াছিল। ভারতের প্রায় ২০ লক্ষ লোক ইংরাজের সহিত মিলিয়া জার্ম্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল। প্রায় দেড লক্ষ ভারতীয় এই যুদ্ধে প্রাণদান করিয়াছিলেন। পরাধীনজাতির এই মহৎ সহযোগিতায় মুগ্ধ হইয়া তদানীন্তন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ ও আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট্ উড্রো উইল্‌সন যুদ্ধের সময়েই পরাধীন জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু সন্ধির সময় প্রকাশ পাইল যে ভারতের নিমিত্ত কোনরূপ আত্মনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয় নাই। যুদ্ধে তুর্কী সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়াছিল সুতরাং সমগ্র মুসলমান সমাজ বিক্ষুব্ধ হইল। যুদ্ধের খরচ জোগাইতে ভারতকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছে, সুতরাং ভারতবাসীর দুঃখ আর দুর্দ্দশার অন্ত রহিল না। ভারতের আপামর জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ হইয়া পড়িল। এই সময় ভারত রক্ষা আইনের মেয়াদ শেষ হইয়া আসিয়াছিল কাজেই ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট "রাউল্যাট এ্যাক্ট" নামে একটি আইন প্রণয়ন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয়দের সন্তুষ্ট করিবার জন্য যুদ্ধের অন্তরায় স্বরূপ যাহাদের বন্দী করা হইয়াছিল তাহাদের অনেককেই মুক্তি দেওয়া হইল। লালা লাজপত রায়কে আমেরিকা হইতে দেশে ফিরিবার অনুমতি দেওয়া হইল। বাংলা দেশে যুদ্ধের সময় এবং তাহার কিছু আগে যে সব যুবক বিপ্লবী সন্দেহে নির্ব্বাসিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত মাখনলাল সেন, মনোমোহন ভট্টাচার্য্য, নগেন্দ্রনাথ গুহরায়, সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র, বসন্তকুমার মজুমদার, শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অরুণচন্দ্র গুহ, মনোরঞ্জন গুপ্ত,
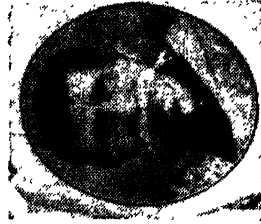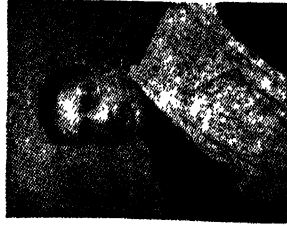
স্বদেশী যুগের কয়েকজন বিশিষ্ট নেতা—

বাম দিকের উপর হইতে :—(১) বিপিনচন্দ্র পাল, (২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, (৩) শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, (৪) ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, (৫) অশ্বিনীকুমার দত্ত, (৬) মতিলাল ঘোষ, (৭) লালা লাজপত রায়, (৮) মদন মোহন মালব্য।

পূর্ণচন্দ্র দাস, কিরণ মুখার্জ্জি, সুরেশচন্দ্র দাস প্রভৃতি অনেকেই মুক্তি পাইলেন। আশুতোষ লাহিড়ী, প্রভৃতি বহু যুবক ও বিপ্লবী নেতাদের কারাদণ্ড সামান্য হ্রাস করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তীকেও জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়।

১৯১৯ সালের রাউল্যাট্ এক্ট্ পাশ হইয়াছিল। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় নিছক ভোটের জোরে এই অন্যায় আইন পাশ হইয়া গেল। ইহাতে ভারতবাসীর রাজনৈতিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হইল, কিন্তু ইহার প্রতিবাদে কেহই অগ্রসর হইল না। পণ্ডিত মালব্য, মিঃ জিন্না প্রভৃতি ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ সদস্যপদ ত্যাগ করিলেন। ভারতের সর্ব্বত্র এক অশান্তি ধূমায়িত হইয়া উঠিল। মহাত্মা গান্ধী, মালব্য, জিন্না, লালা লাজপত রায় প্রভৃতি মহারাষ্ট্র তিলকের সহিত পরামর্শ করিলেন। পরিশেষে মহাত্মা অগ্রণী হইয়া "রাউলাট্ এ্যাক্টএর" বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইলেন। তিনি ইংরাজ গভর্ণমেণ্টকে জানাইয়া দিলেন যে এজন্য তিনি বিরাট সত্যাগ্রহ আন্দোলন উপস্থিত করিবেন। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট গান্ধীর প্রচেষ্টাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিবাব জন্য ১৪৪ ধারা জারি করিলেন। ১৪৪ ধারা অমান্য করিয়া মহাত্মা গান্ধী ৬ই এপ্রিল, সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। পাঞ্জাবের ডাক্তার কিচ্‌লু, সত্যপাল প্রভৃতি নেতাগণ ধৃত হইলেন। ১৩ই এপ্রিল, এই গ্রেপ্তারের এবং রাউল্যাট্ এ্যাক্টের প্রতিবাদ কল্পে পাঞ্জাবের জালিওয়ালানা-বাগে এক বিরাট জনসমাবেশ হয়। পাঞ্জাবের গভর্ণর মাইকেল ও ডায়ারের আদেশে এই নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি বর্ষণ করা হয়। ফলে সহস্রাধিক নর-নারী ও শিশু নিহত হয়। এই নিষ্ঠুর অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া অচিরেই আরম্ভ হইল। ক্ষিপ্ত জনতা পুলিশ ও সৈনিকদিগকে হত্যা করিতে লাগিল। গভর্ণমেণ্ট তখন সামরিক আইন জারি করিয়া প্রকাশ্য রাজপথে পাইকারি দবে ফাঁসি ও বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা করেন। পাঞ্জাবের সর্ব্বত্র সামরিক আইন প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নেতাদেরও ধরপাকড় সুরু হইল। বোম্বাইয়ের দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ পাঞ্জাবে প্রবেশ করিতে চাহিলে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইল। মালব্যকে পাঞ্জাব হইতে বহিষ্কৃত করা হইল। রামভূজ দত্ত চৌধুরী প্রভৃতি আরও কয়েকজন নেতাকে নির্ব্বাসিত করা হইল। মহাত্মা গান্ধীর দিল্লী ও পাঞ্জাব প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল। দেশের সকল মনীষীই এই অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রভৃতি এই অত্যাচারের প্রতিবাদ স্বরূপ ইংরাজ প্রদত্ত 'সার' উপাধি পরিত্যাগ করেন। মহাত্মা গান্ধী তখন সত্যাগ্রহ আন্দোলন স্থগিত রাখিবার সিদ্ধান্ত করিলেন। তাঁহার আশঙ্কা হইল সত্যাগ্রাহীর মধ্যে কেহ কোনরূপ হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করিলে,

সেই অজুহাতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট বহুলোকের প্রাণনাশ করিবার সুযোগ পাইবে।

১৯১৯ সালের ২৩শে ডিসেম্বর, মণ্টেগু চেমসফোর্ড রিফর্ম আইনে পরিণত হয়। এই আইনে দ্বৈত শাসনের ব্যবস্থা হয়। এই দ্বৈত শাসন প্রবর্ত্তনের ফলে ভারতবাসীরা অধিক বিচলিত হইয়া পড়িল। ১৯১৯ সালে মতিলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে অমৃতসরে কংগ্রেসের অধিবেশন হইল। অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইলেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। এই অধিবেশনে মণ্টেগু চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসন সংস্কারকে অগ্রাহ্য করিয়া, পাঞ্জাবের অত্যাচারের প্রতিবাদ করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হইল। ১৯১৯ সালে শাসন সংস্কারে রাজকীয় বন্দীদের মুক্তি দিবার কথা থাকায়, পূর্ব্বেই কিছু বন্দী মুক্তি পাইয়াছিল সত্য কিন্তু এই সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে ইংরাজেরা অন্য জাতির যে ধ্বংস-সাধন করিতেছেন তাহার তথ্যও উদ্‌ঘাটিত হইল। তুরস্কের খলিফার প্রতি ইংরাজগণ যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহার জন্য সমুদয় মুসলমান সম্প্রদায় অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। আলী ভ্রাতৃদ্বয় মহাত্মা গান্ধীর শরণাপন্ন হইলে মহাত্মা গান্ধী তাঁহাদের লইয়া খিলাফৎ আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং খিলাফতের জন্য বহু টাকা চাঁদা উঠাইলেন।

অহিংস অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ

১৯২০ সালের ১লা আগষ্ট, ভারতের শ্রেষ্ঠ জননায়ক মহারাষ্ট্র তিলক বালগঙ্গাধর তিলকের মৃত্যু হইল। মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং এবং স্বর্গীয় মহামতি গোখ্‌লে এই মহাপুরুষের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই মহাপুরুষের মৃত্যুতে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য মহাত্মা গান্ধী "তিলক স্বরাজ্য ফণ্ড" নামে একটি ফণ্ড খুলিলেন। এই ফণ্ডের অর্থ হইতে সত্যাগ্রহ ও স্বরাজ আন্দোলন পরিচালনা করা হইবে স্থির হইল। এই সময় শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী নির্বাসন হইতে বাংলায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি গান্ধীর ক্রিয়াকলাপ দেখিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাঁহার আন্দোলনের সহায়তাকল্পে একখানি ইংরাজি দৈনিকপত্র প্রকাশের অভিলাষ করেন। তখন তিনি অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষকে সহকারী করিয়া "Servant Publishing Co" নামে একটী কোম্পানি স্থাপন করিলেন। সেই কোম্পানি যাহাতে একটি বড় প্রতিষ্ঠান হইতে পারে সেজন্য শ্রীযুক্ত মনোমোহন ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ দত্ত, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মজুমদার, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুহ রায়, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত

নরেন শেঠ প্রভৃতি সঙ্ঘমুক্ত যুবক ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যথেষ্ট সাহায্য করেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, আচার্য্য জগদীশ বসু, আচার্য্য গিরিশচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষিগণ এই কোম্পানিকে নানাভাবে সাহায্য করেন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথমেই এই কোম্পানিকে ছয় হাজার টাকা দিয়া শ্যামবাবুর উৎসাহ বর্দ্ধন করেন এবং অসহযোগ আন্দোলন চালাইবার পরামর্শ দেন।

১৯২০ সালের ৪ঠা হইতে ৯ই সেপ্টেম্বর অবধি কলিকাতায় কংগ্রেসের একটী বিশেষ অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন আমেরিকা হইতে প্রত্যাগত নেতা লালা লাজপত রায়, আর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন, তদানীন্তন বাংলার প্রবীণ চরমপন্থী নেতা ব্যারিষ্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী। এই অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী তাঁহার অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব আনয়ন করেন। অসহযোগের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন······"আমি ভারতবাসীর নিকটে সনাতন আত্মত্যাগের নীতি উপস্থিত করছি। কারণ সত্যাগ্রহ ও তার সন্তান অসহযোগ ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ—দুঃখভোগের নূতন নাম মাত্র। যে সব মুনি ঋষি হিংসার মধ্যেও অহিংসার সন্ধান পেয়েছিলেন তাঁরা নিউটন অপেক্ষা বড় আবিষ্কর্ত্তা, ডিউক অফ্ ওয়েলিংটন অপেক্ষা বড় যোদ্ধা। নিজেরা অস্ত্র-ব্যবহার জেনেও তাঁরা এর অনাবশ্যকতা বুঝেছিলেন ও পরিশ্রান্ত বিশ্ব-জগৎকে এই শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, এর মুক্তি হিংসার পথে নয়, অহিংসারই মধ্যে। সুতরাং আমি ভারতবর্ষ দুর্ব্বল বলে, তাকে অহিংসনীতি গ্রহণ করতে বলি না। তার শক্তি সামর্থ্যের বিষয় জেনেই আমি তাকে অহিংসা-নীতি গ্রহণ করতে বলি। আমি চাই যে, ভারতবর্ষ জানুক—তার আত্মা অমর, দৈহিক দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও সে চিরজয়ী। ইত্যাদি ইত্যাদি।" যাহা হউক যখন এই প্রস্তাব আনয়ন করা হইল তখন কংগ্রেসের বহু বিচক্ষণ চরমপন্থী নেতারা ইহাতে সর্ব্বান্তঃ-করণে সম্মতি দিতে পারিলেন না। এনিবেসান্ত এই প্রস্তাবের ঘোর বিরোধিতা করিলেন। বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাস, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, মহম্মদ আলি জিন্না, বিজয়রাঘব আচার্য্য প্রভৃতি চরমপন্থী নেতাগণ অসহযোগ প্রস্তাবের মূলনীতি গ্রহণ করিলেও ইহার ধারাগুলিতে সম্মত হইতে পারিলেন না। কাউন্সিল বর্জ্জন করিতে তাঁহারা বিশেষ আপত্তি করিলেন। বিষয়-নির্ব্বাচনী সমিতিতে ও প্রকাশ্য কংগ্রেসের অধিবেশনে এক সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন—বিপিনচন্দ্র পাল, এবং সমর্থন করিলেন চিত্তরঞ্জন দাস। কিন্তু চারিদিন ধরিয়া আলোচনা ও বিতর্কের পর এই প্রস্তাব

অধিকাংশ ভোটে গৃহীত হইল। বাংলা দেশের নেতা শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী ও তাঁহার অনুচরবর্গ এবং আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সতীশচন্দ্র দাস-গুপ্ত বরিশালের শরৎচন্দ্র ঘোষ, ঢাকার শ্রীশচন্দ্র চ্যাটার্জ্জি, বসন্তকুমার মজুমদার, নোয়াখালির সত্যেন মিত্র ও নগেন্দ্র গুহ রায় প্রভৃতি মহাত্মার প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। বহু মুসলমান প্রতিনিধিও ইহার সমর্থন করিলেন। নিখিলভারত মোস্‌লেম লীগের এক বিশেষ অধিবেশন এই সময় আরম্ভ হইল; এবং ইহাতেও এই প্রস্তাব গৃহীত হইল। এই কংগ্রেস নরমপন্থী দলের নেতা রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ ব্যক্তিগণ আসেন নাই। কারণ পূর্ব্ব হইতেই ইঁহারা কংগ্রেস ত্যাগ করিয়াছিলেন।

ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর না করিয়া আত্মশক্তির উপর নির্ভর করাই এই প্রস্তাবের মূলনীতি,—ইহার চরম উদ্দেশ্য হইল স্বরাজ লাভ। প্রধানতঃ দুইটি অন্যায়ের প্রতিকারের ভিত্তিতে প্রস্তাবটি গঠিত হইয়াছিল—এই দুইটি (১) খিলাফৎ ও (২) পাঞ্জাবের অনাচার। সুতরাং উক্ত প্রস্তাবে ইহা ব্যক্ত করা হইল যে অনুরূপ অন্যায়ের পুনরাবৃত্তি বন্ধ করিতে হইলে একমাত্র কার্য্যকরী উপায় হইল স্বরাজ প্রতিষ্ঠা। প্রস্তাবে বলা হইল যতদিনে উক্ত অন্যায় দুইটির প্রতিকার না হয় ততদিন ভারতবাসীর পক্ষে ক্রমবর্দ্ধমান অহিংস অসহযোগ-নীতি গ্রহণ ও পালন করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই।

এই আন্দোলন চালাইবার জন্য কংগ্রেস শিক্ষিত সম্প্রদায়কে নিম্নলিখিত কার্য্য কয়টি করিতে অনুরোধ করিলেন:—(১) উপাধি বর্জ্জন, অবৈতনিক পদ ও স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানগুলির মনোনীত সদস্যগণের সদস্যপদ ত্যাগ, (২) গভর্ণমেণ্ট-দরবার, লবি, এবং সরকারী বা আধা সরকারী সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠান বর্জ্জন, (৩) সরকারী-স্কুল-কলেজ বর্জ্জন ও বিভিন্ন প্রদেশে জাতীয় স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা, (৪) উকীল ও মক্কেলগণ কর্ত্তৃক সরকারী আদালত বর্জ্জন ও পক্ষ-প্রতিপক্ষের মধ্যে মামলা মিটাইবার জন্য সালিশী আদালত গঠন, (৫) সৈন্য, কেরাণী ও মজুরদের মেসোপটেমিয়ায় কর্ম্মগ্রহণ করায় অস্বীকৃতি, (৬) ব্যবস্থা পরিষদে সদস্য-পদ প্রার্থীদের নির্ব্বাচন-পত্র প্রত্যাহার এবং যাঁহারা এই নির্দ্দেশ অমান্য করিয়া পদ-প্রার্থী হইবেন তাঁহাদের ভোট না দেওয়া এবং (৭) বিদেশী দ্রব্য বয়কট। ইহা ছাড়া কংগ্রেস ভারতের আপামর জন-সাধারণকে চরকা কাটিতে পরামর্শ দিলেন।

মহাত্মা গান্ধী প্রকাশ্য সভায় দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করিলেন যে আমরা যদি খিলাফৎ ও পাঞ্জাবের অত্যাচারের জন্য অহিংসভাবে অসহযোগ আন্দোলন করি, এবং চরকায় সূতা কাটা আরম্ভ করি, তাহা হইলে একবৎসরের মধ্যে (৩১শে

ডিসেম্বরের মধ্যে) আমরা স্বরাজ পাইব। মহাত্মা গান্ধীর এই দৃঢ় উক্তিতে সকলেই উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। তখনই বিলাতি বর্জ্জন, আদালত বর্জ্জন, সরকারী স্কুল-কলেজ বর্জ্জন, চরকা কাটা প্রভৃতি আরম্ভ হইয়া গেল। সেইদিনই শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী অহিংস অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করিবার জন্য 'সার্ভেণ্ট" নামে একখানি দৈনিক ইংরাজী সংবাদপত্র বাহির করিলেন। সার্ভেণ্টের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এদিকে গান্ধীর বিরুদ্ধবাদী পত্রিকাগুলিও পরোক্ষভাবে মহাত্মার মতবাদের কিছু কিছু সমর্থন করিতে আরম্ভ করিল। ফলে আন্দোলন অচিরেই ব্যাপক আকার ধারণ করিল। বাংলাদেশে এই অসহযোগ আন্দোলন প্রথমে পাশ হইয়াছিল বলিয়া বাংলায় প্রথমেই আন্দোলন সুরু হইল। কলেজ স্কুল প্রায় বন্ধ হইয়া আসিল। অর্দ্ধেকের উপর উকিল ওকালতি পরিত্যাগ করিলেন। সকলেই চরকা কাটা আরম্ভ করিল। বিদেশীদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ হইয়া গেল। মাদকদ্রব্য প্রায় বর্জ্জিত হইয়া আসিল। বাংলার দুইজন প্রতিভাবান যুবক শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ইংলণ্ড হইতে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া সরকারী চাকুরী লইয়া ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন; ইঁহারা উভয়ে এই আন্দোলনে যোগ দিয়া চাকুরী পরিত্যাগ করিলেন। ইঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বাংলার অনেক শিক্ষিত যুবক পড়া ও চাকুরী ছাড়িয়া দিলেন। বাংলাদেশে তথা সমগ্র ভারতে এক নবযুগের সূচনা হইল। প্রত্যহ প্রত্যেক স্থানে সভা আহুত হইতে লাগিল। চট্টগ্রাম গভর্ণমেণ্ট কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সময় চাকুরী ছাড়িয়া দিলেন। সার্ভেণ্ট পত্রিকায় শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, আচার্য্য প্রফুল্ল রায়, দেবপ্রসাদ ঘোষ ও আনন্দময় ধর এবং সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতি নিয়মিত লিখিতে লাগিলেন। সার্ভেণ্ট বাংলায় এক নব-জীবনের সঞ্চার করিল।

১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হইল। এই অধিবেশনের সভাপতিত্ব করিলেন বিজয়রাঘব আচার্য্য—আর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইলেন শেঠ যমুনালাল বাজাজ। এইবারের অধিবেশন হইল অভিনব। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় চৌদ্দহাজার প্রতিনিধি এই অধিবেশনে যোগদান করিলেন। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ নীতি কতখানি জনমত সমর্থন করিয়াছিল এই বিপুল জনসমাবেশ তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অবশ্য ইহার মধ্যেও অসহযোগ প্রস্তাবের বিরোধিতা করিবার জন্য বহু প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। বাংলা দেশ হইতে চিত্তরঞ্জন দাস আড়াইশত প্রতিনিধি লইয়া অসহযোগ প্রস্তাবের বিরোধিতা করিবার জন্য নাগপুরে উপস্থিত হইলেন। এই অধিবেশনের প্রধান আলোচ্য বিষয় দুইটি ছিল—(১) গান্ধী রচিত

নূতন নিয়মতন্ত্র গ্রহণ ও (২) পূর্ব্বেকার অসহযোগ প্রস্তাব অনুমোদন। অধিবেশনে আলোচনার পর গান্ধী রচিত পূর্ব্বোক্ত গঠনমূলক কার্য্যপদ্ধতি গৃহীত হইল এবং অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের অনুমোদন করা হইল। চিত্তরঞ্জন দাস, মতিলাল নেহেরু, লালা লাজপত রায় প্রভৃতি যাঁহারা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিতে গিয়াছিলেন তাঁহারা মহাত্মা গান্ধীর বিরাট ব্যক্তিত্বের নিকট নতি স্বীকার করিলেন এবং তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। কেবল বিপিনচন্দ্র পাল, মহম্মদ আলি জিন্না ইহার বিরোধিতা করিলেন। বিপিনচন্দ্র পাল এক বৎসরে যে স্বরাজ হইতে পারে না—তাহার অকাঠ্য প্রমাণ প্রদর্শন করা সত্ত্বেও তাঁহার পরাজয় ঘটিল। মহম্মদ আলি জিন্না কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলেন—আর বিপিনচন্দ্র পাল নিজের মতবাদকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রভূত ক্ষতি সহ্য করিলেন। তিনি মতিলাল নেহেরুর Independent পত্রিকার সম্পাদনা পরিত্যাগ করিলেন। অমৃতবাজার হইতে তাঁহার আয় বন্ধ হইয়া গেল—চিত্তরঞ্জন দাসের নিকট হইতেও তিনি আর অর্থ সাহায্য পাইলেন না। ইহার কিছুকাল পরে ১৯২১ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া গরমপন্থী বিপিনবাবু যখন বরিশালের অধিবেশনে যোগদান করিলেন, তখন তাঁহার লাঞ্ছনার চরম হইল। তিনি অধিবেশনে প্রকাশ করিলেন যে এক বৎসরে স্বরাজ হইতে পারে না। তিনি আরও চেষ্টা করিলেন স্বরাজের একটু সংজ্ঞা, একটু বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিতে। অমনি তাঁহার ভূতপূর্ব্ব প্রিয় শিষ্য চিত্তরঞ্জন দাস বলিয়া উঠিলেন "I am not scheming man; বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর।" তখন বিপিনবাবু ক্রুদ্ধ হইয়া চিত্তরঞ্জনকে বলিলেন—"তোমাদের ম্যাজিক নিয়ে রেখে দাও, লজিক্যালি প্রমাণ কর—অসহযোগ করিয়া একবৎসরে কত কি করিতে পারিবে এবং ইংরাজ একবৎসরে কি করিয়া তোমাদের হাতে সব ছাড়িয়া দিবে?" তখন উপস্থিত সভ্যগণ ম্যাজিক আর লজিকের ঝগড়ায় মাতিয়া উঠিল। Logic পরাজিত হইল। বিপিনবাবু বলিলেন "বাহুবল যাহাদের আয়ত্তের মধ্যে নাই, নৈতিক বল বা moral pressureই যাহাদের একমাত্র অস্ত্র, তাহাদের পক্ষে "Swaraj can only come by compromise and consulation."

চিত্তরঞ্জন কলিকাতায় ফিরিয়া শ্যামসুন্দরের সহিত মিলিত হইয়া বাংলাদেশ কাঁপাইতে লাগিলেন। কলিকাতার প্রচারকার্য্যে ইঁহাদের সহকারী হইলেন—সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, বীরেন্দ্র শাসমল, জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র, নৃপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ। বিহারে নেতৃত্ব করিতে লাগিলেন রাজেন্দ্রপ্রসাদ, যুক্তপ্রদেশে মতিলাল ও মদনমোহন।

বোম্বাই প্রদেশে দীনবন্ধু এ্যাণ্ড্রুজ, পাঞ্জাবে লালা লাজপত রায়, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রভৃতি নেতাগণ। ইঁহাদের সহিত যোগ দিলেন সৌকত আলি ও মহম্মদ আলি ভ্রাতৃদ্বয়। ডাক্তার আন্সারি, হাকিম আজমল খাঁ, হজরত মোহান্নি, আবুলকালাম আজাদ প্রভৃতি মুসলমান নেতাগণও যোগ দিলেন। সর্ব্বত্রই ছাত্রেরা পড়াশুনা ত্যাগ করিল। কেহই আর 'গোলাম খানায়' যাইতে চাহে না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিকেটিং বসিল। এই পিকেটিংয়ের ভার লইলেন স্বয়ং চিত্তরঞ্জন ও সুভাষচন্দ্র। তখন সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (ভাইস্‌চ্যান্সেলর) চিত্তরঞ্জনকে বলিলেন—"ছেলেদের মাথা খাইবার জন্য এই কাজ করিতেছ কেন ?" তাহার উত্তরে চিত্তরঞ্জন বলিলেন—"ছাত্রেরা ন্যাশান্যাল কলেজে পড়িবে।" আশুতোষ প্রশ্ন করিলেন "National কলেজ করিতে টাকা দিবে কে ?" চিত্তরঞ্জন বলিলেন—"টাকা দেশের লোকের নিকট চাঁদা করিয়া তুলিতে হইবে।" তখন আশুতোষ বলিলেন—"এক কোটি টাকা আমি পাইলে, আমিই এই কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়কে ন্যাশান্যাল কলেজ করিয়া দিতে পারি। তোমরা আমার সহিত যোগ দিয়া কাজ কর্। পৃথকভাবে ন্যাশান্যাল কলেজ করিলে তাহা রক্ষা করিতে পারিবে না।" এই সময় বাংলাদেশে অনেক স্থলে ধর্ম্মঘট হয় এবং তাহা চিত্তরঞ্জন দাস বা যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়।

১৯২১ সালে চিত্তরঞ্জন দাস ব্যারিষ্টারি ছাড়িয়া বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হইলেন। তখন হইতেই গভর্ণমেণ্ট সভাসমিতি বন্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। চিত্তরঞ্জন দাস গভর্ণমেণ্টের নিষেধ সত্ত্বেও সভা করিয়া দুই বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। তাহার পর শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হইয়া অনুরূপ সভা করিয়া দুই বৎসর করাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। অধিকন্তু সার্ভেণ্ট-কাগজে রাজদ্রোহিতামূলক প্রবন্ধ প্রকাশের অপরাধে অতিরিক্ত দুই বৎসর কারাদণ্ড লাভ করিলেন। ইহার পর কংগ্রেস কমিটির সভাপতিপদে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র শাসমল, অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রভৃতি নির্ব্বাচিত হইয়া সভা করিয়া পর পর জেলে যাইতে লাগিলেন। তখন সার্ভেণ্ট কাগজের সম্পাদনার ভার লইলেন শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়। রাজদ্রোহ অপরাধে তাঁহারও জেল হইল। শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ব্বে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে জেলে ছিলেন; জেল হইতে মুক্ত হইয়াই তিনি সার্ভেণ্ট কাগজের সম্পাদনার ভার লইলেন। এই সালের ডিসেম্বর মাসে, হাকিম আজমল খাঁর সভাপতিত্বে আমেদাবাদে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। উহাতে মহাত্মা গান্ধীকে কংগ্রেসের ডিরেক্টর নিযুক্ত করা হইল। এই সময় স্বরাজ ও খিলাফৎ আন্দোলন আরও

জোরের সহিত চলিল। মোস্‌লেম লীগেরও এই সময় এক অধিবেশন হয়। তাহাতে সভাপতি হজরত মোহানি হিংসা প্রচার করেন। এই অভিযোগে মোহানীর কারাদণ্ড হইল। মহাত্মা গান্ধী বরদৌলিতে 'কর বন্ধ' (No tax campaign) আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দিলেন। ভারতের সর্ব্বত্র আন্দোলন মূর্ত্ত হইয়া উঠিল। অহিংস আন্দোলনকারীদের পদভরে ভারত টলিয়া উঠিল। ইংলণ্ডের যুবরাজ এই সময়ে ভারতে আসিলে তাঁহাকে বিদায় অভ্যর্থনা করা হয়। ফলে পুলিশের অত্যাচার আরম্ভ হয় এবং বোম্বাই সহরে পুলিশের অত্যাচারে জনসাধারণ ক্রুদ্ধ হইয়া পুলিশ মারিতে আরম্ভ করে। তখন গভর্ণমেণ্ট সকল নেতাদের কারারুদ্ধ করিয়া রাখিবার সঙ্কল্প করিলেন। এই সালে ত্রিশ হাজার লোককে বন্দী করা হয়।

চৌরিচোরার হত্যাকাণ্ড

১৯২২ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী, গোরক্ষপুর জেলায় চৌরি-চোরায় উন্মত্ত জনতা পুলিশের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া ২২ জন পুলিশকে হত্যা করে। ইহাতে মহাত্মা গান্ধী তাঁহার 'পর্ব্বত প্রমাণ ভুল' স্বীকার করিয়া আন্দোলন বন্ধ করিবার আদেশ দিলেন। মহাত্মা বলিলেন—"Swaraj is striking in my nostrils." আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ রাখিয়া গঠনমূলক কার্য্যে আত্মোনিয়োগ করিবার জন্য সকলকে আহ্বান করিলেন। যে প্রস্তাবে এইরূপ আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাই "বরদৌলি প্রস্তাব" নামে বিখ্যাত। তখন গভর্ণমেণ্ট মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলন অসার মনে করিয়া মহাত্মাকে ১০ই মার্চ্চ, বন্দী করিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে তিনটি রাজদ্রোহের অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়া প্রত্যেক অপরাধের জন্য দুই বৎসর হিসাবে ছয় বৎসর কারাদণ্ড দিলেন। মহাত্মা গান্ধীর কারাদণ্ডে সমগ্র দেশে বিক্ষোভ উপস্থিত হইল, কিন্তু উপযুক্ত নায়কের অভাবে বিক্ষোভ বিদ্রোহে পরিণত হইতে পারিল না। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট গান্ধীকে বন্দী করিবার পূর্ব্বেই ভারতের খ্যাতনামা নেতাদেরও বন্দী করিয়াছিলেন।

স্বরাজ্য দল গঠন

১৯২২ সালে চিত্তরঞ্জন দাস জেল হইতে মুক্তিলাভ করিবার পরই গয়ায় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হইল। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিলেন চিত্তরঞ্জন দাস। ঠিক এই সময় তুরস্ক কামালপাশার নেতৃত্বে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। তুরস্কের এই জয়লাভে চিত্তরঞ্জন ভারত সম্পর্কেও অত্যন্ত আশান্বিত হইয়াছিলেন। তিনি এই অধিবেশনে সমগ্র এশিয়ার রাষ্ট্রগুলিকে

লইয়া একটি এশিয়াটিক কনফারেন্স প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। জাতির মুক্তিসংগ্রামে কিরূপ কর্ম্মপদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত তাহাও তিনি সকলকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। কিন্তু তিনি যখন আইন সভায় প্রবেশের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন তখন গোঁড়া গান্ধীপন্থীরা রাজা গোপালাচার্য্যের নেতৃত্বে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া অহিংস অসহযোগ হুবহু বজায় রাখিতে চাহিলেন। রাজাগোপালাচার্য্য তাঁহার প্রস্তাব এই অধিবেশনে সংখ্যাধিক্যে পাশ করাইয়া লইলেন। চিত্তরঞ্জন তখনই নিয়ম-তান্ত্রিক ভাবে পদত্যাগপত্র দাখিল করিলেন। এই দুই মতাবলম্বী দলের মধ্যে বিরোধিতা তীব্র হইয়া উঠিল। তখন হইতেই দুই দল 'No changer' বা পরিবর্ত্তন বিরোধী, ও 'Pro-changer' বা পরিবর্ত্তনবাদী নামে পরিচিত হইলেন।

চিত্তরঞ্জন দাস কংগ্রেসের নিয়মতান্ত্রিক-অধীন থাকিয়া 'স্বরাজ্য দল' নামে এক নূতন দল গঠন করিলেন। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, বিটলভাই ঝাভেরি প্যাটেল, হাকিম আজমল খাঁ, শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার, নরসিংহ, চিন্তামণি, কেলকার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ চিত্তরঞ্জনের সহিত যোগদান করিলেন। দুইটি দলের বিরোধিতায় কংগ্রেসের শক্তি ক্ষয় হইতে লাগিল। যাহাতে এই অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান হয় এবং আইন সভায় প্রবেশের একটা সুষ্ঠু মীমাংসা হয় তাহার জন্য উভয় দলেরই সম্মতিক্রমে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে দিল্লীতে কংগ্রেসের অধিবেশন হইল। এই অধিবেশনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল যে অন্য কোনরূপ আপত্তি না থাকিলে কংগ্রেসসেবীরা ভাবী নির্ব্বাচনে মাত্র কৌঁসিলে সদস্যপদ প্রার্থী হইতে পারিবেন।

ইহার পর স্বরাজ্য দল বিভিন্ন প্রদেশে নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে প্রবেশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। এদিকে তুরস্কে স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হওয়াতে খিলাফৎ সমস্যার সমাধান হইয়া গিয়াছে। এই সুযোগে স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিগণ হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইবার চেষ্টা আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদেরই এই অপচেষ্টায় এই সালের মহরমে হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা আরম্ভ হইল। দাঙ্গা প্রথমে আরম্ভ হয় মুলতানে। পরবৎসর পাঞ্জাবেও দাঙ্গা সুরু হইল। কিন্তু দেশের এই অবস্থা স্বরাজ্য দলকে এতটুকু নিরুৎসাহ করিল না। তাঁহারা পূর্ণোদ্যমে নির্ব্বাচনে প্রতিযোগিতা করিবার জন্য তৎপর হইলেন। এই সময়ে বাংলা দেশে চিত্তরঞ্জন দাস, শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তীকে তাঁহার দলে যোগ দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু শ্যামসুন্দর বাবু No changer দলভুক্ত থাকিতে তাঁহার দৃঢ় অভিমত জ্ঞাপন করিলেন। ইহার ফলে চিত্তরঞ্জন দাস ও শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী উভয়ের মধ্যে বিরোধ আরম্ভ হইল। বাংলায় দুইটি

দলের সৃষ্টি হইল। এই সময় শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী পুনরায় কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। তখন শ্যামসুন্দরের দলে রহিলেন বরিশালের জননেতা শরৎকুমার ঘোষ, বাঁকুড়ার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায়, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, অধ্যাপক নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত প্রভৃতি মাত্র কয়েকজন। আর বাংলার সকলেই স্বরাজ্য দলে যোগ দিল। সার্ভেণ্ট কাগজের সেক্রেটারি ছিলেন মনোমোহন ভট্টাচার্য্য ও সহকারী সম্পাদক ছিলেন শ্রীযুক্ত আনন্দময় ধর। ইঁহারাও স্বরাজ্য দলে যোগদান করিলেন। শ্রীযুক্ত মনোমোহন ভট্টাচার্য্যের চেষ্টায় স্বরাজপার্টি হইতে "Forward" পত্রিকা বাহির হইল। এই Forward পত্রিকার প্রথম দিনের প্রথম প্রবন্ধটি লিখিলেন শ্রীযুক্ত আনন্দময় ধর। সম্পাদক হইলেন, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু। তখন হইতে Forward পত্রিকা নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বের প্রধান মুখপত্র হইল। ইহার ফলে শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী ও চিত্তরঞ্জনের মধ্যে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হইয়া গেল, স্বরাজ্যপার্টির তরফ হইতে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়, নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র, নলিনীরঞ্জন সরকার, সুভাষচন্দ্র বোস, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সভ্যেরা নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইলেন। সর্ব্বত্র স্বরাজ্য পার্টির জয় হইতে লাগিল। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ স্বরাজ্যপার্টির ডাক্তার বিধান রায়ের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইয়া শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইলেন। তাঁহার নামে দোষারোপ হইল যে "এতাবৎ তিনি প্রধান মন্ত্রীর পদে সরকারী মোটা মাহিনায় সমাসীন থাকিয়া জনসাধারণের সুখ দুঃখের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। সরকারের দমন নীতির তিনি সমর্থন করিয়াছিলেন।" সুতরাং তাঁহার এই পরাজয় উপলক্ষে দেশের লোক তাঁহার সমুদয় সৎকর্ম্ম ভুলিয়া গিয়া তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছিত করিল। তাঁহার গলায় জুতার মালা পরাইয়া দিল।

১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে মহম্মদ আলির সভাপতিত্বে কোকনদে কংগ্রেসের অধিবেশন হইল। এই অধিবেশনে এইরূপ প্রস্তাব গৃহীত হইল যে কাউন্সিলে প্রবেশ সাময়িকভাবে অনুমতি দেওয়া হইলেও মূলতঃ কংগ্রেস সম্পূর্ণ অসহযোগ ও কাউন্সিল বর্জ্জনে বিশ্বাসী। ১৯২৪ সালে আন্দোলন মন্দীভূত হইয়া আসিল। কোহাটে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধিয়া গেল। সর্ব্বত্র No-changer ও Pro-changer দলের বিবাদ লাগিয়াই রহিল। এই গোলযোগের সময় মহাত্মা গান্ধী মুক্তি পাইলেন। গান্ধী দেশের এইরূপ অবস্থা অবলোকন করিয়া মর্ম্মাহত হইলেন। ইহার প্রতিকার কল্পে তিনি দিল্লীতে মহম্মদ আলির গৃহে ২১ দিন অনশন করিলেন। সমগ্র দেশ ইহাতে ব্যথিত হইয়া পড়িল এবং দিল্লীতে সমস্ত দল মিলিয়া একটি ঐক্য সম্মেলনের ব্যবস্থা করিয়া দেশের শান্তি

ফিরাইয়া আনিলেন। ১৯২৪ সালে মহাত্মা গান্ধী ও মতিলাল নেহেরু বাংলায় আসিলেন। চিত্তরঞ্জনের গৃহে অবস্থান করিয়া মহাত্মা স্বরাজ্যপার্টির Creedএ সহি করিলেন এবং মহাত্মা গান্ধী শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তীকে তাহাতে সহি করিতে বলিলেন। তখন শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন "মহাত্মা, আপনিও বড়লোকদের তুষ্ট করিবার জন্য প্রত্যেক দিনই নিজের মত বদ্‌লাইতেছেন?" তখন মহাত্মা গান্ধী শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তীকে বলিলেন "দেখ, আমরা No-changer দল যাহা করিব, তাহা করিবই, কিন্তু উহারা Pro-changer হইয়া যদি আরও কিছু সুবিধা করিতে পারে তাহাতে আমাদের বাধা দেওয়া উচিত নহে।" কিন্তু মহাত্মার এই উক্তিতেও শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী Creedএ সহি করিতে পারিলেন না। ফলে শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাত্মা ও চিত্তরঞ্জন দাস উভয়েরই অপ্রীতিভাজন হইলেন। এই সময়েই মহাত্মা গান্ধী বেলগাঁও কংগ্রেসে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। এই অধিবেশনে তিনি প্রকাশ্য সভায় জ্ঞাপন করিলেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতর থাকিয়াও স্বরাজ লাভ হইতে পারে এবং আবশ্যক হইলে বৃটিশের সহিত সব সম্পর্ক ত্যাগ করাও যাইতে পারে। স্বরাজ লাভের জন্য তিনি সমগ্র দেশবাসীকে চরকা কাটিতে অনুরোধ করিলেন। অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন করিতে ও হিন্দু মুসলমান ঐক্যের উপর জোর দিতে বলিলেন। তিনি No-changer ও Pro-changer দলের ক্ষতিকর বিবাদ ও বিরোধের কথা উল্লেখ করিয়া উহা মিটাইয়া ফেলিয়া উভয়দলকে একযোগে একত্র কার্য্য করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তাঁহার এই অনুরোধের প্রতিক্রিয়া হইল এই যে বিবাদ কোন কোন ক্ষেত্রে মিটিয়া গেল, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তাহা প্রবল হইল। আবার ডাঃ মুঞ্জে, কেলকার, মদনমোহন প্রভৃতি নেতারা No-changer অথবা Pro-changer কোন দলেই রহিলেন না। এই সময় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য Independent Congress Party গঠন করিলেন। বাংলাদেশে শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, সতীশ দাসগুপ্ত, প্রফুল্ল ঘোষ, নৃপেন ব্যানার্জ্জি প্রমুখ ব্যক্তিগণ No-changer রহিয়াই গেলেন, বাকী সকলে Pro-changer দলভুক্তই থাকিলেন। No-changer দলভুক্ত অধ্যাপক অনিলবরণ রায় এই আত্মকলহে বিরক্ত হইয়া রাজনৈতিক জীবন পরিত্যাগ করিয়া শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমে আশ্রয় লইলেন। আবার বাংলায় চিত্তরঞ্জনের শিষ্যদের মধ্যেও বিরোধ উপস্থিত হইল, সুভাষ বসুর দল যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্তের দলকে আমল দিতে নারাজ হইল। ফলে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত Advance পত্রিকা বাহির করিলেন। সুভাষ দল ও যতীন্দ্রমোহন দলে বিবাদ

লাগিয়াই রহিল। বহু যুবক এই কলহের ফলে ধৃত হইয়া কারাবরণ করিল। সুভাষ বসুও বর্ম্মায় নির্ব্বাসিত হইলেন।

১৯২৫ সালে চিত্তরঞ্জনকে সাহায্য করিবার লোক খুব কমই রহিল। সকলেই Council, Corporation অধিকার করিবার জন্য পৃথক পৃথক দল গঠন করিতে লাগিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস তখন অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। তিনি জীবনের শেষ কয়দিন শান্তিতে অতিবাহিত করিবার জন্য পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। ইহার পূর্ব্বে চিত্তরঞ্জন দাস Non-co-operation Movementএর সময় শ্রীঅরবিন্দকে রাজনৈতিক জীবনে ফিরাইয়া আনিবার বহুবিধ চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ মনোরথ হইয়াছিলেন। এখন স্বয়ং তিনি শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমে জীবন কাটাইবেন স্থির করিলেন। ইহাতে শ্রীঅরবিন্দ বলিলেন—"তোমার এখনও অভিমান আছে, কর্ম্মের বাসনা আছে। তোমার এখানে এখন থাকা সম্ভব হইবে না। আরও কিছুদিন কাজ করিয়া আমিত্ব শূন্য হইয়া এখানে আসিও।" দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস কিছুদিন আশ্রমে থাকিয়া বাংলাদেশে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার পরই তিনি দার্জ্জিলিং যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৯২৫ সালে ১৬ই জুন, দার্জ্জিলিঙে চিত্তরঞ্জন দাসের কর্ম্মজীবনের অবসান হইল। এই সময় মহাত্মা গান্ধী কলিকাতায় আসিয়া চিত্তরঞ্জনের শবদেহ দার্জ্জিলিং হইতে কলিকাতায় আনাইয়া নিজে শবাধার বহন করিয়া কেওড়াতলা শ্মশান ঘাটে লইয়া যান। তাঁহার শবাধার যেরূপ শোভাযাত্রার সহিত শ্মশানঘাটে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল ঐরূপ শোভাযাত্রা তাহার পূর্ব্বে বা পরে কখনও হয় নাই। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যুতে লিখিলেন—"সাথে করে এনেছিলে মৃত্যুহীন প্রাণ, মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।" ১৯২৬ সালে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হইয়া গেল। পাঞ্জাবের শুদ্ধি আন্দোলনের নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ দাঙ্গাকারীদের হস্তে নিহত হইলেন।

সাইমন কমিশন ও নেহেরু রিপোর্ট

১৯২৭ সালে এদেশে সাইমন কমিশন আগমন করিল। এই কমিশনে কোন ভারতীয়কে লওয়া হয় নাই বলিয়া ভারতের সর্ব্বত্র "Go back Simon" আন্দোলন হইল। এই সালে কংগ্রেসের অধিবেশন হইল মাদ্রাজে ও ডাঃ আনসারি তাহার সভাপতিত্ব করিলেন। এই অধিবেশনে সাইমন কমিসনের শাসন সংস্কার পরিত্যক্ত হইল এবং সকল দল মিলিয়া পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে একটি শাসন-তন্ত্র প্রণয়নের ব্যবস্থা করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইল।

জহরলাল কর্তৃক আনীত "পূর্ণ স্বাধীনতার" প্রস্তাবও এই অধিবেশনে গৃহীত হইল। সাইমন কমিসন ভারতে পদার্পণ করিবামাত্র দিকে দিকে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হইতে লাগিল। বহুযুবক পুলিশের লাঠির আঘাতে হতাহত হইলেন এবং বহু যুবক কারাবরণ করিলেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, লালা লাজপত রায় প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ এই বিক্ষোভকারীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। পুলিশের লাঠির আঘাতে লালা লাজপত রায় আহত হইলেন এবং কয়েকদিন পরে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। এই সময় পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে ভারতের সকল রাজনৈতিক দল লইয়া একটি সভা হয়, তাহাতে নেহেরু রিপোর্টের একটি খসড়া প্রস্তুত হয়। সেই খসড়াই নেহেরু রিপোর্ট নামে পরিচিত।

১৯২৮ সালে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হইল। এই কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইলেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। এই কংগ্রেসে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ও সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে প্রগতিশীল দলের সহিত প্রাচীন দলের বিরোধ উপস্থিত হয়। মহাত্মা গান্ধী এই বিরোধের মীমাংসা করিয়া নেহেরু রিপোর্ট গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। জহরলাল ও সুভাষচন্দ্র বসু এই রিপোর্টে লিখিত ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্ কথাটিকে বাদ দিয়া "পূর্ণ স্বাধীনতা" লিখিতে বলিলেন। অবশেষে নেহেরু রিপোর্টেই গ্রহণ করা হইল। জহরলাল ও সুভাষের পরাজয় হইল। তৎকালীন বড়লাট আরউইন, গান্ধী, জিন্না, প্রমুখ নেতৃবর্গের সহিত আলোচনা করিয়া "Dominion statusই ভারতের লক্ষ্য" তাহা বিলাতের কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় বিলাতে একটি গোলটেবিল বৈঠকের ব্যবস্থা করা হয়।

গান্ধী-আরউইন চুক্তি ও গোলটেবিল বৈঠক

১৯৩০ সালের প্রারম্ভেই মহাত্মা গান্ধী তদানীন্তন ভারতের বড়লাট লর্ড আরউইনকে ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কংগ্রেসের মনোভাব জানাইলেন এবং গোলটেবিল বৈঠক বর্জ্জন করিলেন। এবং তিনি স্বয়ং লবণ আইন ভঙ্গ করিবেন তাহাও জানাইলেন। তাহার পর ১২ই মার্চ্চ, সবরমতী আশ্রম হইতে দুইশত মাইল দূরে "দণ্ডি" অভিমুখে লবণ আইন ভঙ্গ করিবার জন্য একটি সত্যাগ্রহী দল লইয়া পদব্রজে যাত্রা করিলেন। গ্রাম হইতে গ্রামান্তর অতিক্রম করিবার সময় মহাত্মা গান্ধী গ্রামবাসীদিগকে খদ্দর পরিধান করিতে, বিলাতি-বস্ত্র অগ্নিদগ্ধ করিতে, মাদক দ্রব্য বর্জ্জন করিতে, গভর্ণমেণ্টের সহিত সর্ব্বপ্রকার সহযোগিতা বর্জ্জন করিতে, নিজেদের আদালত প্রতিষ্ঠা

করিতে, এবং সর্ব্বোপরি অহিংস থাকিতে উপদেশ দিতে লাগিলেন। সমগ্র জাতি এই আন্দোলনে সাড়া দিল। ভারতের সর্ব্বত্র লবণ আইন ভঙ্গ করা হইতে লাগিল। ৫ই মে তারিখে মহাত্মা গান্ধীকে গ্রেপ্তার করা হইল। এই সময় ভারতের সকল প্রদেশ হইতে ষাট হাজার লোককে কারারুদ্ধ করা হইল। এই গ্রেপ্তারের ফলে সমগ্র দেশে এইরূপ বিক্ষোভের সৃষ্টি হইল যে বড়লাট লর্ড আরউইন মহাত্মা গান্ধীর সহিত একটি চুক্তি করিতে বাধ্য হইলেন। গান্ধী আরউইন চুক্তির ফলে "ভারতের পূর্ণ-স্বাধীনতা" স্বীকার করিয়া লওয়া হইল এবং আইন-অমান্য বন্ধ করা হইল। বিদ্রোহী নেতার সহিত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের এই প্রথম চুক্তি। এই চুক্তি অনুযায়ী সত্যাগ্রহীদের মুক্তি দেওয়া হইল এবং লবণ কর প্রত্যাহৃত হইল। এই সময় বাংলার দেশ-প্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেন ও দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রের ভিতর বাংলার কর্ত্তৃত্ব লইয়া বিবাদ চরমে পৌঁছাইল। শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী উভয় নেতাকে স্বগৃহে আনয়ন করিয়া দুইজনের মধ্যে মিলন ঘটাইবার চেষ্টা করিলেন।

১৯৩১ সালে বল্লভভাই প্যাটেল কংগ্রেসের সভাপতি হন এবং কংগ্রেসের অধিবেশনে গান্ধী-আরউইন চুক্তি সমর্থন করা হইল, এবং পরবর্ত্তী গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিবার সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা হইল। এই সময় লর্ড আরউইন গোলটেবিল বৈঠকের জন্য বিলাতে গমন করিলেন এবং তাঁহার স্থলে আসিলেন লর্ড উইলিংডন। লর্ড উইলিংডন ভারতে আসিয়াই পুনরায় দমননীতির প্রবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু যখন মহাত্মা তাঁহাকে জানাইলেন যে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিতে যাইবার পূর্ব্বে ভারতের এই অশান্তি দূর করিতেই হইবে তখন উইলিংডন দমন নীতি প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইলেন। এই সালেই মতিলাল নেহেরু মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। মহাত্মা গান্ধী মদনমোহন মালব্য, সরোজিনী নাইডু প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিবার জন্য ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলেন। বৈঠকের প্রারম্ভে মহাত্মা গান্ধী যেইমাত্র নিজেকে ভারতের ৪০ কোটি নরনারীর প্রতিনিধি বলিয়া পরিচয় দিলেন, অমনি মিঃ মহম্মদ আলি জিন্না আপত্তি জানাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে মিঃ আম্বেদকরও আপত্তি জানাইলেন। তখন মহাত্মা গান্ধী মিঃ মহম্মদ আলি জিন্নাকে Blank cheque দিয়া হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে একটা মিলনের চেষ্টা করিলেন। জিন্নাও এমন অনেক দাবী উপস্থিত করিলেন যাহা মানিয়া লওয়া অসম্ভব। সুতরাং গোলটেবিল বৈঠক ভাঙিয়া গেল। ভারতে জহরলাল প্রমুখ নেতারা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের এই ছেলে খেলার উপযুক্ত শাস্তি দিবেন বলিয়া শাসাইতে লাগিলেন। মহাত্মা গান্ধী ব্যর্থ মনোরথ হইয়া বোম্বাইতে

পৌঁছাইবার অব্যবহিত পরে জহরলাল আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। এদিকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সমানে দমন নীতি চালাইয়া চলিলেন। জহরলাল প্রভৃতি নেতারা বন্দী হইলেন। অর্ডিন্যান্সের পর অর্ডিন্যান্স জারি হইতে লাগিল। মহাত্মা গান্ধী এসম্বন্ধে বড়লাট লর্ড উইলিংডনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন, কিন্তু বড়লাট তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। ১৯৩২ সালের ৪ঠা জানুয়ারী, মহাত্মা গান্ধীকেও গ্রেপ্তার করা হইল। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হইল। পুলিশ ও সৈন্যদের বেপরোয়া অত্যাচার চলিল। এই সালে দিল্লীতে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে স্থির করা হইল, কিন্তু তাহাও বে-আইনী বলিয়া বন্ধ করা হইল। কংগ্রেসের নির্ব্বাচিত সভাপতি পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও তাঁর অনুচরবর্গকে গ্রেপ্তার করা হইল। এই উপলক্ষে এক লক্ষ কুড়ি হাজার লোক কারারুদ্ধ হইল।

পুণা চুক্তি

এই সালের আগষ্ট মাসে বিলাতের প্রধান মন্ত্রী মহাশয় ম্যাক্‌ডোনাল্ড প্রবর্ত্তিত ভারত শাসন আইনের পৃথক নির্ব্বাচন ব্যবস্থা ঘোষণা করেন। ইহাই ইতিহাস বিখ্যাত 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা' নামে পরিচিত। মহাত্মা গান্ধী পুণার যারবেদা জেল হইতে ভারত সচিব, প্রধান মন্ত্রী ও বড়লাটকে ইহার প্রতিবাদ জানাইলেন। এবং ইহার প্রতিবাদকল্পে অনশন ব্রত গ্রহণ করিলেন, ফলে বর্ণহিন্দু ও তপশীলদের পৃথক্ নির্ব্বাচন বদ্ করিবার ব্যবস্থা হইল। এতৎসম্পর্কে পুণায় একটি চুক্তি হইল। ইহাই পুণা চুক্তি নামে অভিহিত। এই সালের ৭ই আগষ্ট, বাংলার প্রধান অসহযোগী নেতা শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী ইহধাম ত্যাগ করেন।

১৯৩৩ সালে, পণ্ডিত মালব্যের সভাপতিত্বে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন স্থির হয়, কিন্তু মালব্যজী ও তাঁহার অনুচরবর্গকে কলিকাতায় প্রবেশ করিতে না দেওয়ায়, শ্রীযুক্তা নেলি সেন গুপ্তার সভানেত্রীত্বে কলিকাতার অধিবেশন আরম্ভ হয়। এই সময় মহাত্মা হিন্দুদের মধ্যে অস্পৃশ্যতা দূর করিবার জন্য ২১ দিন অনশনের সঙ্কল্প করেন। এই অনশনে মহাত্মার জীবনহানি ঘটিতে পারে এই আশঙ্কায় ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মুক্তি দেন। গান্ধীজী কারামুক্ত হইয়া সত্যাগ্রহ বন্ধ করিবার জন্য আদেশ দিলেন। তাহার পর নেতাদের বৈঠকে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের অধিকার দেওয়া হইল। মহাত্মা গান্ধী সবরমতী আশ্রম হইতে ব্যক্তিগতভাবে সত্যাগ্রহ করিবার জন্য বাহির হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে বহু নেতা তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলেন এবং ইহার ফলে বহু নেতা কারারুদ্ধ হইলেন। মহাত্মা গান্ধী কারাগারে অনশন আরম্ভ করিলেন।

মহাত্মা গান্ধীকে গভর্ণমেণ্ট মুক্তি দিলেন। ইহার পর মহাত্মা গান্ধী 'হরিজন' উন্নয়ন কল্পে সমগ্র ভারত পর্য্যটন করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে বিহারে প্রবল ভূমিকম্প (১৯৩৪ সাল, ১৫ই জানুয়ারী) হইল। মহাত্মা গান্ধী সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া আর্ত্তের সেবা করিতে লাগিলেন।

১৯৩৪ সালে মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিলেন। তখন জহরলাল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল, প্রভৃতির কর্ত্তৃত্বে কংগ্রেস চলিতে লাগিল। গান্ধী কংগ্রেসে রহিলেন না বটে কিন্তু কংগ্রেসের কর্ত্তৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ গান্ধীর সহিত পরামর্শ না করিয়া কোনও কাজই করিতেন না। ১৯৩৪ সালে খান আব্দুল গফুর খানের সভাপতিত্বে বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের অধিবেশন স্থির হইল। কিন্তু খান আব্দুল গফুর খাঁন এই সম্মান বিনয়ের সহিত প্রত্যাখ্যান করিলে রাজেন্দ্রপ্রসাদের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের অধিবেশন হইল। উহাতে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হইল। এই কংগ্রেস "না গ্রহণ, না বর্জ্জন" নীতি অনুমোদন করিলেন।

১৯৩৬ সালে জহরলালের নেতৃত্বে লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেসের অধিবেশন হইল। এই অধিবেশনে "ভারত শাসন আইন" গ্রহণ না করিয়া ভারতবাসীদের জন্য ভারতীয়দের একটি শাসনতন্ত্র রচনা করিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইল। এই সালের ডিসেম্বর মাসে, জহরলালের সভাপতিত্বে ফৈজপুর গ্রামে কংগ্রেসের পুনরায় অধিবেশন হয়। তাহাতে সীমান্ত সমস্যা, এবং ভবিষ্যৎ সমর আশঙ্কা ও কৃষকদের দুরবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়।

১৯৩৭ সালের নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে কংগ্রেস অবতীর্ণ হন। প্রতিযোগিতায় ১১টি প্রদেশের মধ্যে ৮টি প্রদেশে সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করে। এই বৎসর হইতে সত্যমুর্ত্তি, রাজা গোপালাচারি প্রভৃতি no chargerএর দল মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেন। তখন মহাত্মা গান্ধী তাঁহার অহিংস নীতি অবলম্বন করিয়া কেবল গঠনমূলক কার্য্য করিতে নেতাদের উপদেশ দেন। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রবর্ত্তিত হয় এবং এই ৩৭ সালে সাধারণ নির্ব্বাচন হয়। বাংলার যাহাতে কোনদিন মাথা চাড়া দিয়া উঠিতে না পারে এমনিভাবেই প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের পরিকল্পনাটি রচিত হয়। বাংলার কাছে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট চিরদিনই নাজেহাল হইয়াছে, তাই এমন ব্যবস্থা হইল যাহাতে বাংলার জাতীয়তাবাদীরা আর কোন দিন উঠিতে না পারে। ১৯৩৮ সালের বারদৌলি তালুকের হরিপুরায় শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়।

১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে মধ্যপ্রদেশের ত্রিপুরারি কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনেও সভাপতিত্ব করিবার জন্য শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু নির্ব্বাচিত হন।

অহিংস আন্দোলনের কয়েকজন বিশিষ্ট নেতা— স্বাধীনতা সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—
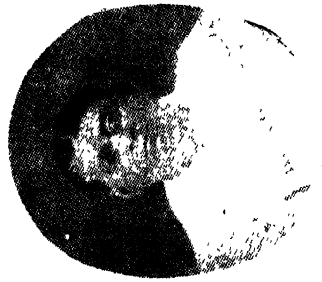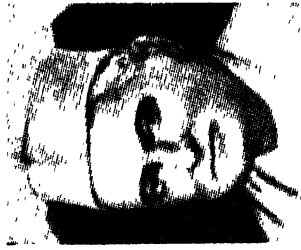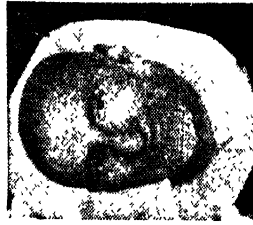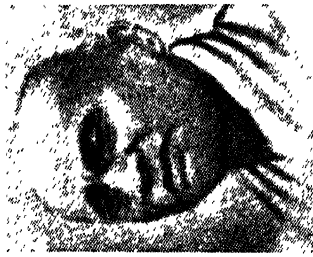
বাম দিকের উপর হইতে:—(১) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, (২) পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, (৩) দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, (৪) দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, (৫) ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, (৬) সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, (৭) সীমান্ত

কিন্তু তাঁহার অসুস্থতা হেতু তিনি অধিবেশনে উপস্থিত হইতে না পারায় মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কংগ্রেস মহাত্মা গান্ধীর পরামর্শ মত ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করায় সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের সভাপতিত্ব ত্যাগ করেন। তাহার পর সুভাষচন্দ্র বসু "ফরওয়ার্ড ব্লক" গঠন করিলেন। সমগ্র ভারতবর্ষ যাহাতে তাঁহার কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করে সেইজন্য তিনি ভারতের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া প্রচারকার্য্যও চালাইতে লাগিলেন। এই বৎসরেই মিঃ মহম্মদ আলি জিন্না ইংরাজের নিকট তাঁহার পাকীস্থানের দাবী উপস্থাপিত করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বব্যাপী মহাসমর

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল। জার্ম্মানি অতি অল্প দিনের মধ্যে বেলজিয়ম, নরওয়ে, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি সব দেশ দখল করিয়া লইল। তাহার পর জার্ম্মাণী ইংলণ্ড আক্রমণের ব্যবস্থা করিল। যখন জার্ম্মাণী ইংলণ্ডে বোমা বর্ষণ সুরু করিয়াছে, যখন ইংলণ্ড ভারতের সাহায্য ভিন্ন বাঁচিবার কোন উপায় দেখিতে পাইল না, কিন্তু তখন ভারতবাসীর সহিত কোনরূপ পরামর্শ না করিয়া, ভারতবর্ষকে যুদ্ধরত দেশ বলিয়া ঘোষণা করিল। ইহাতে ভারতবাসী মাত্রেই অসন্তুষ্ট হইলেন। ইহার প্রতিবাদে কংগ্রেস শাসিত ৮টি প্রদেশের সভ্যগণ মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করেন। ফলে ঐ প্রদেশ কয়টি গভর্ণর শাসিত প্রদেশ হইল। কংগ্রেস জনসাধারণকে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিবার জন্য গঠনমূলক কার্য্যপন্থা অনুসরণ করিলেন এবং ব্রিটিশের নিকট তাহার এইরূপ অন্যায়ের কৈফিয়ৎ চাহিলেন। ইহার উত্তরে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিলেন না। ইহাতে সমগ্র দেশে হিংসা প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিতে লাগিল। এই সময় মহাত্মা গান্ধী সকলকে অহিংস থাকিয়া অসহযোগ আরম্ভ করিতে বলিলেন।

১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির এক বৈঠক বসে। তাহাতে গান্ধীজির নেতৃত্বে সকলেই আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিতে চাহিলেন। তাহাতে গান্ধীজি সকলকে বলিলেন—"আমি আগে গভর্ণমেণ্টকে আইন অমান্য করিবার নোটিশ দিয়া তবে আইন অমান্য করিব। যদি আন্দোলন আরম্ভ হয় তবে ইহা কি রূপ লইবে তাহাও আমি জানি না।" ইহার পর মহাত্মা গান্ধী এই আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে তদানীন্তন বড়লাটের সহিত আলোচনা আরম্ভ করিলেন—কিন্তু এই আলোচনা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইল। তখন মহাত্মা গান্ধী আইন অমান্য করিতে মনস্থ করিলেন।

এই সালে রামগড়ে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এই সভায় ঘোষিত হইল—"সম্পদ শোষণের উপরেই এই সাম্রাজ্যের ভিত্তি। দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে কংগ্রেস যুদ্ধে সাহায্য করিতে পারে না ; আর পূর্ণ স্বাধীনতা ভিন্ন কংগ্রেস অন্য কিছুতেই সন্তুষ্ট হইবে না।" এই প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যেরা কারারুদ্ধ হইলেন। মৌলানা আবুল কালাম আজাদের দেড় বৎসর কারাদণ্ড হইল। হাজার হাজার সত্যাগ্রহী পদব্রজে দিল্লীর পথে যাত্রা করিলেন—এবং যাত্রাপথে সর্ব্বত্র প্রচার করিতে লাগিলেন "এই যুদ্ধে ব্রিটিশকে লোক বা অর্থ দিয়া সাহায্য করা ভারত-বাসীর উচিত নয়। সমস্ত যুদ্ধবিগ্রহ অহিংসভাবে বন্ধ করা উচিত।" এই ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ফলে বহু লোক কারাবরণ করিল। কংগ্রেসের এইরূপ ব্যবহারে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইন ফেডারেশন সংক্রান্ত দ্বিতীয় অধ্যায়টী বাতিল করিয়া ঘোষণা করিলেন "১০ কোটী মুসলমান কংগ্রেসের ঐ নীতি সমর্থন করে না।" এই সময় মুসলীম লীগ ভারতের কয়েকটি প্রদেশ লইয়া পাকীস্থান দাবী করিল।

১৯৪১ সালের শেষ দিকে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু পুলিশ প্রহরীকে ফাঁকি দিয়া ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। ৮ই ডিসেম্বর জাপান অতর্কিতে পার্লহারবার আক্রমণ করিয়া ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। এবং অতি অল্প দিনের মধ্যে মালয়, সিঙ্গাপুর, বোর্ণিও, জাভা প্রভৃতি অধিকার করিয়া বর্ম্মায় প্রবেশ করিবার জন্য যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। অতি অল্প দিনের মধ্যে বর্ম্মা জাপানের অধিকারে আসিল। যুদ্ধের যখন এইরূপ অবস্থা, প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে যখন ব্রিটিশ শক্তি এইরূপভাবে পর্য্যুদস্ত, তখন চার্চ্চিলী মন্ত্রীসভার কতকগুলি প্রস্তাব লইয়া সার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ ভারতবর্ষে আগমন করিলেন। ক্রীপস্ বলিলেন "যদি ভারতবাসী ব্রিটিশ সরকারকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করে, তাহা হইলে যুদ্ধান্তে ভারতবাসীকে 'অখণ্ড ভারতে অখণ্ড স্বাধীনতা' দেওয়া হইবে। তাহাতে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার কোন প্রশ্ন থাকিবে না।" এই ঘোষণা শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার ঘরে বসিয়া রেডিও মারফৎ শুনিতে পাইয়া ভারতবাসীকে উহা গ্রহণ করিতে বলিলেন। শ্রীঅরবিন্দ আরও বলিলেন—"জাপান ও জার্ম্মাণী শীঘ্রই হারিয়া যাইবে, এজন্য এ প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিত।" কিন্তু কংগ্রেসের কর্ত্তৃপক্ষ গণের ধারণা ছিল এই যুদ্ধে জার্ম্মাণী ও জাপানের জয় অনিবার্য্য। সেইজন্য তাঁহারা শ্রীঅরবিন্দের বাণীতে কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহারা ইংরাজের সকল কথায় বিশ্বাস করা যাইতে পারে না এই অভিমত প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন—"আগে যদি আমাদের স্বাধীনতা স্বীকার কর—তাহা হইলে আমরা

তোমাদের সাহায্য করিতে পারি।" ইহাতে ক্রীপস্ বলিলেন—"এই সময়ে ব্রিটেন খুব বিপদগ্রস্ত, যুদ্ধ লইয়া ব্যস্ত, এখন ভারতের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা সম্ভব নয়—বিশেষতঃ এইরূপ ব্যবস্থা হইবার পূর্ব্বেই জাপান ভারতবর্ষ অধিকার করিবে।" তখন মহাত্মা গান্ধী ক্রীপস্‌কে জানাইলেন যে ভারতবর্ষকে জাপানের হাত হইতে ব্রিটিশের রক্ষা করিতে হইবে না, তাহারা এদেশ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইলে ভারতবাসী অহিংস অস্ত্রদ্বারা আত্মরক্ষা করিবে। অতএব সর্ব্বাগ্রে ব্রিটিশের এই দেশ হইতে সরিয়া পড়া উচিত। তখন ক্রীপস্ ব্যর্থ মনোরথ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

আগষ্ট বিপ্লব

১৯৪২ সালের ৮ই আগষ্ট, কংগ্রেস "কুইট্ ইণ্ডিয়া" প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। গান্ধীজি সকলকে জানাইলেন যে "এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে নচেৎ মরিতে হইবে।" সকলেই গান্ধীজির এই "করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে" প্রস্তাব গ্রহণ করিল। ৮ই আগষ্ট, শেষরাত্র হইতে কংগ্রেসের নেতারা বন্দী হইতে লাগিলেন। সর্ব্বাগ্রে মহাত্মা গান্ধীকে বন্দী করা হইল। তাহার পর সহস্র সহস্র কংগ্রেস কর্ম্মীকে বন্দী করা হইতে লাগিল। ইহাতে সকল প্রদেশের জনসাধারণ ক্ষেপিয়া গেল। সরকারের এই অত্যাচারে তাহারা আর অহিংস রহিতে পারিল না। তাহারা হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করিল। সকল প্রদেশেই উন্মত্ত জনতা সরকারী সম্পত্তি ধ্বংস করিতে আরম্ভ করিল। রাস্তা ঘাট ভাঙ্গিয়া দেওয়া, রেল লাইন উপড়াইয়া ফেলা, টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া দেওয়া, পুলিশ ষ্টেশন, সরকারী দপ্তরখানা, ডাকঘর প্রভৃতি দখল করা, ইত্যাদি কার্য্য চলিতে লাগিল। মিঃ মহম্মদ আলি জিন্না ইহাতে বলিলেন "কংগ্রেস মুসলমানদের বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছে।" যাহা হউক জনসাধারণের এই বিদ্রোহ দমন করিকার জন্য ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তাঁহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিলেন। নিরীহ জনসাধারণের উপর বেপরোয়া গুলি চলিল—এরোপ্লেন হইতে বোমা বর্ষণ করিয়া নিরীহ প্রজার প্রাণনাশ করিতেও তাঁহারা বিরত হইলেন না। এই বিপ্লবে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিলেন তাহার তুলনা কোন সভ্য দেশের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। ষাটটি ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনী নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। ৫৩৮টি ক্ষেত্রে পুলিশ গুলি চালনা করিয়াছিল। পুলিশ ও মিলিটারির গুলিতে ২০ হাজার লোক নিহত হইয়াছিল। পঞ্চাশ হাজার লোক আহত হইয়াছিল। ৬০২২৯ জন গ্রেপ্তার হইয়াছিল। দশ হাজার ব্যক্তিকে ভারতরক্ষা আইনে বন্দী করা হইয়াছিল। একমাত্র মেদনীপুর জেলার তমলুক

মহকুমায় এই অত্যাচারের নিদর্শন এই:—গ্রেপ্তার ২০০০, বিচারে দণ্ডপ্রাপ্ত ৫০০, গৃহ ভষ্মীভূত ৪৯, গৃহ লুণ্ঠন—১০৪৪, খানাতল্লাসী ১৩৭৩০, পাইকারী জরিমানা ১৯০০০০০৲ টাকা, নারী ধর্ষণ—৭৩, ধর্ষণের চেষ্টা ৩১, শ্লীলতাহানি ১৫০, বে আইনী আটক ৫০৭৬, লাঠির আঘাত ৪২২৬, ভারতরক্ষা আইনে আবদ্ধ ১২৯, গুলিতে নিহত ৪০, ও গুলিতে আহত ১৯৯ এই সমুদয়ই সরকারী হিসাব।

আগষ্ট বিপ্লবের দরুণ কংগ্রেসের নেতারা আদৌ দায়ী নহে। ইহা সম্পূর্ণ জনসাধারণের জাগরণ বা বিপ্লব। দেশের যখন এই দারুণ দুর্দ্দিন তখন লোকের দুর্দ্দশা আরও চরমে লইয়া যাইবার জন্য ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট সমুদয় খাদ্যদ্রব্যের কণ্ট্রোল প্রবর্ত্তিত করিলেন, এবং সমুদয় খাদ্যদ্রব্য যুদ্ধের জন্য ব্যয় করিতে লাগিলেন এবং বহু পরিমাণ খাদ্য নষ্ট করিয়া ফেলিতে লাগিলেন। ফলে দেশের সর্ব্বত্র দুভিক্ষ দেখা দিল। ১৯৪২ সালের ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট কৃত দুর্ভিক্ষে ভারতের লক্ষ লক্ষ প্রজার জীবননাশ হইল। এই দুর্ভিক্ষে একমাত্র বাংলা দেশেই ৫০ হাজারের অধিক লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করিল। সেই সময়ে মেদিনীপুরবাসিগণের দুর্দ্দশা লিখিয়া বর্ণনা করা চলে না।

১৯৪৩ সালে সকলেই জানিল নেতাজি শীঘ্রই ভারত দখল করিবেন ও ভারতবাসীর সকল কষ্টের অবসান হইবে। সেইজন্য ভারতবাসী সেই দুর্দ্দিনে, সরকারের অমানুষিক অত্যাচার ও উৎপীড়নেও অভিভূত হইয়া পড়িল না, তাহারা ভবিষ্যতের আশা লইয়া বাঁচিয়া রহিল। ১৯৭৩ সাল হইতে মহাত্মা গান্ধী গভর্ণমেণ্টের সহিত পত্র বিনিময় আরম্ভ করিলেন। তাহাতে মহাত্মা গান্ধী জানাইলেন "যে হিংসাত্মক কার্য্যের জন্য দায়ী গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেস নহে।" এই সময় মহাত্মা গান্ধী জেলে অনশন আরম্ভ করিলেন, এবং এই সময় মহাত্মা গান্ধীর সেক্রেটারি ও প্রিয়শিষ্য মহাদেব দেশাই কারাগারে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ১৯৭৭ সালে মহাত্মা গান্ধীর সহধর্ম্মিণীর মৃত্যু হইল—আর পৃথিবীব্যাপী মহা সমরের সমাপ্তি ঘটিতে চলিল। সেই সময় মহাত্মা গান্ধী কারাগার হইতে মুক্তি পাইলেন। ১৯৪৫ সালে যখন জার্ম্মানী ও জাপান সম্পূর্ণ হারিয়া অসহায় অবস্থায় পড়িল, তখন ইংরাজ সরকার নেতাজির আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানায়ক ও সৈনিকদের বন্দী করিয়া ভারতবর্ষে আনয়ন করিলেন। এই সময় ইংরাজ সরকার ভারতের সকল নেতা ও কর্ম্মীদের কারামুক্তি দিলেন (১৯৪৫ সালের ১৫ই জুন)। এই সালে বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের সহিত মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের একটি সম্মেলন হয়। কিন্তু এই সম্মেলন ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়।

মন্ত্রী-মিশনের পরিকল্পনা

১৯৪৬ সালের ১৬ই মে, মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনার কথা ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী এ্যাটলি ঘোষণা করিলেন। মহাত্মা গান্ধী ও শ্রীঅরবিন্দ এই পরিকল্পনা সমস্ত দেশকে মানিয়া লইতে বলিলেন। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণায় ছিল ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসের মধ্যে ইংরাজ সরকার ভারতবর্ষের হস্তে স্বাধীনতা দিয়া ভারত পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে। কাহার হস্তে এই স্বাধীনতা অর্পণ করা হইবে সেই প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী জানাইলেন "সংখ্যাগরিষ্ঠদের দাবী সংখ্যা লঘিষ্ঠদের আব্দারে অস্বীকার করা হইবে না, এবং সংখ্যা লঘিষ্ঠদের রক্ষা করার ব্যবস্থাও করা হইবে।" মোসলেম লীগ প্রথমেই এই পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন কিন্তু তাহারপর যখন কংগ্রেসও উহা গ্রহণ করিল তখন মোসলেম লীগ ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর ঐ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। তাহার পর মন্ত্রী মিশন এদেশে আসিয়া সকল দলকে লইয়া সম্মেলন আরম্ভ করিলেন। কিন্তু মিঃ জিন্নার অনমনীয় মনোভাবে তাঁহারা কিছুই করিতে পারিলেন না। মোসলেম লীগ ১৬ই আগষ্ট মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ব্যবস্থা করেন। কলিকাতার ঐ দিন প্রত্যক্ষ সংগ্রাম অতি ভয়াবহরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ঐ দিনের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুধু হিন্দুর বিরুদ্ধে, বিশেষতঃ দরিদ্র জনসাধারণের বিরুদ্ধে ঘোষিত হইয়াছিল। ঐ দিন কলিকাতার হাঙ্গামায় ৫০০০ হাজার হিন্দু-মুসলমান নিহত হয় এবং কুড়ি হাজার আহত হয়। লুণ্ঠন ও গৃহদাহের ফলে ১৫ কোটি টাকার ধনসম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায়। তারপর মোসলেম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম নোয়াখালিতে আরম্ভ হয়। তাহাতে সহস্র সহস্র হিন্দু নিহত হয় এবং হিন্দুদের অধিকাংশ গৃহ ভস্মীভূত হয়। ইহার প্রতিক্রিয়া বিহার প্রদেশে আরম্ভ হইল। তথায় ১০০০০ মুসলমান হতাহত হইল। তখন মন্ত্রী মিশন এদেশ হইতে চলিয়া গিয়াছেন। লর্ড ওয়াভেল মিঃ জিন্না ও মহাত্মা গান্ধীকে লইয়া মীমাংসার চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু তিনি কৃতকার্য্য হইলেন না। তখন বিলাত হইতে লর্ড মাউণ্টব্যাটেনকে ওয়াভেলের স্থলে বড় লাট করিয়া ভারতে প্রেরণ করা হইল। লর্ড মাউণ্টব্যাটেন মিঃ জিন্না ও মহাত্মা গান্ধীকে লইয়া কোন রকমে একটা সমাধানে উপস্থিত হইলেন। জিন্নার পাকিস্থান দাবী স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহাকেও এই পরিকল্পনা গ্রহণ করানো হইল। ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন, ব্রিটিশ সরকারের শেষ পরিকল্পনা মাউণ্টব্যাটেন ঘোষণা করিলেন। তাহাতে বলা হইল ১৫ই আগষ্ট, ইংরাজ সরকার ভারতবাসীর হাতে সকল ক্ষমতা দিয়া ভারত হইতে চলিয়া যাইবে। মহাত্মা গান্ধী ও জিন্না এই ঘোষণা সকলকে গ্রহণ করিতে বলিলেন। শ্রীঅরবিন্দ

রেডিও মারফৎ এই ঘোষণা শ্রবণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"Not a solution but an ordeal."

যাহা হউক ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট, রাত্রি ১২ টার পর অর্থাৎ ১৫ই তারিখ পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট ভারতবাসীদের (মিঃ জিন্না ও মুস্লীম লীগকে এবং মহাত্মা গান্ধী ও ভারতীয় ইউনিয়নকে) হস্তে সব বুঝাইয়া দিয়া সরিয়া পড়িলেন। তারপর ভারতীয় ইউনিয়নের গণপরিষদ লর্ড মাউণ্টব্যাটেনকে ভারতীয় ইউনিয়নের বড় লাট নিযুক্ত করিলেন এবং মোশ্লেম লীগ গণপরিষদ তাহাদের কায়েদে আজম জিন্নাকে পাকীস্থানের গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত করিলেন। ১৫ই আগষ্টের স্বাধীনতা দিবসের সমস্ত বিবরণ চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে এজন্য এই অধ্যায়ে এ বিষয় আর আলোচনা করা হইল না।

স্বাধীনতা-সংগ্রামের দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়

আজাদ হিন্দ ফৌজ ও দেশগৌরব নেতাজী সুভাষচন্দ্র

"কদম কদম বঢ়ায়ে জা,
খুশীকে গীত গায়ে জা।
যহ জিন্দগী হৈ কৌমকী,
তো কৌম পর লুটায়ে জা॥

তূ' শেরে হিন্দ আগে বঢ়,
মরণসে ফির ভী তূঁ ন ডর।
আসমান তক উঠাকে সর,
জোশে বতন বঢ়ায়ে জা॥

তেরী হিম্মত বঢ়তী রহে,
খুদা তেরা সুনতা রহে।
জো সামনে তেরে চঢ়ে,
তো খাকমেঁ মিলায়ে জা॥

চলো দিল্লী পুকারকে,
কৌমী নিশান সম্‌হালকে।
লাল কিল্লে পর গাড়কে,
লহরায়ে জা, লহরায়ে জা॥"

পূর্ব্বাভাষ

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে দুইটি দিন বিশেষ স্মরণযোগ্য। প্রথম একটি দিনে. বোমারু শ্রীযুক্ত উল্লাসকর দত্ত তাঁহার সহপাঠী রাসবিহারী বসুকে বিপ্লবী নেতা শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিগণের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। সেই প্রথম পরিচয়ে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ তাঁহার দূরদৃষ্টি লইয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন—যুবক রাসবিহারীকে। তাই তিনি তাঁহারই হাতে তুলে দেন ভারতীয় বিপ্লবীদের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব। আর একটি দিন! ঐ দিন আমাদের দেশগৌরব নেতাজী অহিংস আন্দোলনে যোগদান করিয়া মুক্ত বিপ্লবীনেতা শ্রীযুক্ত বারীন্দ্র ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির সহিত মোহনলাল মিত্র ষ্ট্রীটে "বিজলী" ও "নারায়ণ" অফিসে সাক্ষাৎ করিতে যান। ঐদিন তাঁহাকে দেখিয়া উপেন্দ্রবাবু আনন্দে আত্ম-

হারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি সুভাষচন্দ্রকে কোলে টানিয়া লইয়া বলিয়াছিলেন —"বারীন গাঁধীর এক বছুরে অহিংস স্বরাজের আমরা সমালোচনা করলেও, এ কথা আমাদের স্বীকার করতেই হ'বে যে, গাঁধী যদি অহিংস অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ না করতো, তাহলে আমরা এমন সোণার টুক্‌রো ছেলে পেতাম না।" আর সুভাষচন্দ্রকে বলিলেন—"দেখো দাদা, বড়দের কথা মনে রেখো, যা করবে সোজাসুজি করো, বুজ্‌রুকী করতে যেয়ো না। আমাদের সব দোষ ত্রুটি, অভাব অভিযোগ ও দুর্ব্বলতা তোমাকে যেন স্পর্শ না করে।" উপেন্দ্রবাবুর আশীর্ব্বাদ করার পর বারীনবাবু একটু মুরুব্বি-আনার চালে সুভাষচন্দ্রকে প্রাণখোলা আশীর্ব্বাদ করে বললেন—"Our mission is over, এখন তোমরা যদি পারো।"

১৯০৮ সালের ২রা মে শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও অন্যান্য বিপ্লবী নেতা ও কর্ম্মীরা ধৃত হইলে, পশ্চিম বাংলায় যে সব বিপ্লবীকে পুলিশ ধরিতে পারে নাই, তাঁহাদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রাসবিহারী বসু ও নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য চাংড়ীপোতা ডাকাতির মামলার আসামী ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে সর্ব্বদা অন্যান্য বিপ্লবী নেতাদের সহিত ব্যবধান রক্ষা করিয়া চলিতে হইত। রাসবিহারী বসু সবেমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উচ্চ ডিক্রী লইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছেন আর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সরকারী অফিসে কাজ করেন, সুতরাং এই দুইজনের পক্ষে পুলিশের চোখে ধূলা দিয়া কাজ করিবার বিশেষ সুযোগ ছিল। তখন কলিকাতায় বিপ্লবীদের কার্য্য করিবার অনেক অসুবিধা ছিল—তাই তাঁহারা সকলে ফরাসী চন্দননগরে শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়ের বাড়ীতে সমবেত হইতেন এবং তাঁহারই পরামর্শ অনুযায়ী কার্য্য করিতেন। এদিকে উত্তরপাড়ার শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার কলিকাতাস্থিত "শ্রমজীবি সমবায়" হইতে ও কলিকাতায় শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার ও শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মজুমদার বিপ্লবীদের পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করিতেছিলেন। যতীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ছিল সর্ব্বজন-বিদিত আর রাসবিহারীর শিক্ষা ছিল সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। কাজেই এই দুই জনকেই তদানীন্তন বিপ্লবীদল তাঁহাদের অকৃত্রিম নেতা বলিয়া মানিয়া লইলেন। ঐ দলে তখন শ্রীযুক্ত যাদুগোপাল মুখার্জ্জি, অতুল ঘোষ, অমর ঘোষ প্রমুখ যুবকগণও যোগদান করিয়াছিলেন। তারপর বিপ্লবীদল বিরাট আকার ধারণ করিলে পুলিশের ভয়ে ইহারা একযোগে কার্য্য করিতে পারিতেন না। পৃথক পৃথক ভাবে কার্য্য করিবার জন্য এক একজন এক একটি দলের ভার গ্রহণ করিতেন।

প্রথম বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের সময় এই সকল বিপ্লবী যুবক শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিবার জন্য যাইতেন। কিন্তু এই গতায়তের ফলে পুলিশের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল, এবং ১৯১৫ সালে শ্যামসুন্দর এবং বাংলার ৫৩ জন বিপ্লবী ও আধা-বিপ্লবী যুবক ধৃত হইয়া নির্ব্বাসিত হইলেন। সেই সময়ে যতীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি বালেশ্বরের যুদ্ধে তাঁহার সহকর্মীদের সহিত পুলিশের গুলিতে নিহত হন এবং নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ও রাসবিহারী বসু জাপানে পলায়ন করেন।

রাসবিহারী জাপানে গমন করিয়া জাপানের Tokyo Universityর অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইলেন এবং জাপানের ব্যাঘ্র জেনারেল টোজোর ভগ্নীকে বিবাহ করিয়া জাপানী হইয়া গেলেন। এখন তাঁহার কাজ হইল ভারতের স্বাধীনতা চিন্তা। সেই সময়ে একজন আইরিশ অধ্যাপক ডাঃ কুনিজ টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজীর অধ্যাপক ছিলেন। তিনি রাসবিহারী বসুর সংস্পর্শে আসিয়া ভারতীয় কৃষ্টির প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। এই সময়ে রাসবিহারী তাঁহাকে শ্রীঅরবিন্দের গ্রন্থাবলী উপহার দেন। তিনি ঐ গ্রন্থ পাঠে এতই মোহিত হইয়া পড়িলেন যে তখনই শ্রীঅরবিন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া রাসবিহারীর সহিত অকৃত্রিম বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। রাসবিহাসী বসু নরেন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে (তখন মানবেন্দ্র রায় নাম পরিগ্রহ করিয়াছেন) আমেরিকায় পাঠাইলেন। সেখানে নরেন্দ্র জার্ম্মান-ইণ্ডিয়ান ষড়যন্ত্রে ধরা পড়িবার ভয়ে পুনরায় জাপানে পলাইয়া আসেন। পরে রাসবিহারীর চেষ্টায় তাঁহাকে রাশিয়ায় লেলিনের নিকট পাঠান হয়।

১৯৪১ সালের শেষ দিকে যখন জাপান জার্ম্মাণীর সহিত যোগ দিয়া ইংরাজ ও আমেরিকার সহিত যুদ্ধ করিবার সিদ্ধান্ত করিলেন, ঠিক সেই সময় রাসবিহারী কলিকাতা হইতে সুভাষচন্দ্রকে জাপানে লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। সুভাষের সহিত রাসবিহারী বসুর প্রথম পরিচয় তখনই হয় যখন (১৯১৬ সালে) সুভাষ বসু তাঁহার সহপাঠী অনঙ্গমোহন দামের সহিত প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রাবস্থায় তদানীন্তন ইতিহাসের অধ্যাপক ওটেন সাহেবকে জুতা মারেন ও তন্নিমিত্ত রাষ্টিকেট হন। তাহার পর ১৯২১ সালে সুভাষচন্দ্র যখন কংগ্রেসে যোগদান করিলেন তখন রাসবিহারী তাঁহার সহিত পত্র মারফৎ যোগাযোগ স্থাপন করিলেন।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ভারত ত্যাগ

১৯৪১ সালে সুভাষচন্দ্র কারাগারে বন্দী ছিলেন। কিন্তু তিনি অসুস্থতার অজুহাতে স্বীয় বাটীতে পুলিশ পাহারায় বাস করিতে থাকেন। ঐ সময় তাঁহার ব্যাধিমুক্তির জন্য তাঁহার আত্মীয় স্বজন নানারূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই কুলপুরোহিত অধ্যাপক অশোকনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহারই বাস-কক্ষের পার্শ্ববর্ত্তী জননীব কক্ষে বসিয়া তাঁহার ব্যাধিমুক্তির জন্য শান্তি স্বস্ত্যয়নাদির অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সুভাষবাবু কিন্তু সেই সময় কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতেন না কিম্বা কাহারও সহিত কথা কহিতেন না। তিনি আপন ঘরে সর্ব্বদাই আবদ্ধ থাকিতেন। সেই পর্দ্দার অন্তরাল হইতে তাঁহার দৈনন্দিন আহার্য্য সরবরাহ করা হইত। তাঁহার জননীও তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিতেন না। শুনিতে পাওয়া যায়, ঠিক এই সময় একখানি এরোপ্লেন ৭জন জাপানী লইয়া কলিকাতায় আসে। ঐ জাপানীদের মধ্যে ৩জন সুভাষচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার বাটী উপস্থিত হন। কিছুক্ষণ পরে দুইজন জাপানী ও স্বয়ং সুভাষচন্দ্র আর একজন জাপানীর পোষাকে সজ্জিত হইয়া পুলিশ প্রহরীর সম্মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। পুলিশ দেখিল দর্শনপ্রার্থী জাপানী ৩জন চলিয়া গেল। ইহার অনেকক্ষণ পরে তৃতীয় জাপানী ভদ্রলোকটি বাঙ্গালীর পোষাক পরিয়া বাটীর বাহির হইয়া আসেন। পুলিশেরা সুভাষচন্দ্রকে চিনিত, কাজেই এই ভদ্রলোককে বাটীর অন্য কেহ ভাবিয়া তাহারা কোনরূপ সন্দেহ করে নাই। বস্তুতঃ এই জাপানী ভদ্রলোককে সন্দেহ করিবার কিছুই ছিল না। কারণ পুলিশ দেখিল জাপানী ৩জন চলিয়া গিয়াছে তাহার পর ধুতিচাদর পরা এক ভদ্রলোক সুভাষ বসুর বাড়ীর লোক ভিন্ন আর কে হইতে পারে? পরিশেষে যে ৭জন জাপানী কলিকাতায় আসিয়াছিল তাহারা ৭জনই (অবশ্য ছয়জন জাপানী আর একজন জাপানী পোষাক পরিহিত সুভাষচন্দ্র) পুনরায় জাপান অভিমুখে যাত্রা করিল। বিমান ঘাঁটিতে কেহই তাহাদের সন্দেহ করিল না। কেবল পরিত্যক্ত জাপানীটি কলিকাতায় এক জাপানী পরিবারের সহিত থাকিয়া গেল। কেহ কেহ এমন বলিয়া থাকেন যে সুভাষচন্দ্র ছদ্মবেশে আফ্‌গানিস্থান দিয়া প্রথমে জার্ম্মাণী যান, তাহার পর জাপানে আসেন, আবার জার্ম্মাণীতে যান।

যাহা হউক, সুভাষচন্দ্র কলিকাতার পুলিশের চোখে ধুলি দিয়া জাপানে রাসবিহারী বসুর নিকট উপস্থিত হইলেন। আর তাহার পরেই ১৯৪১ সালের ৮ই ডিসেম্বর, জাপান পার্ল হারবার আক্রমণ করিয়া ইংরেজ ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। উহার পর থাইল্যাণ্ডে প্রবেশ করিয়া ইংরাজ ও

আমেরিকানদের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিল। এই সংগ্রামে জাপানীর জয় হইল। একে একে সিঙ্গাপুর, মালয়, বোর্ণিও দখল করিয়া জাপানীরা বর্ম্মায় প্রবেশ করিল। তাহার পর আরও কিছুকাল যুদ্ধ করিয়া তাহারা বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরে প্রভুত্ব বিস্তার করিল। তখন ইংরাজগণ প্রমাদ গণিলেন। শীঘ্রই ভারতবর্ষ আক্রমণ হইবে এই আশঙ্কা করিয়া ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাহায্য ভিক্ষা করিল,—বিনিময়ে যুদ্ধের পর ভারতবর্ষের সমস্ত দাবী মানিয়া লইতে স্বীকৃত হইল। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ ইংরাজের সততা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া জানাইয়া দিলেন যে "এখনি স্বাধীনতা না দিলে কোন সাহায্য করা হইবে না।"

আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন

ভারতীয় সৈন্যেরা বন্দী হইলে জাপানীরা ইহাদের ভার ক্যাপ্টেন মোহন সিংয়ের হাতে অর্পণ করেন এবং তাঁহাকে ইহাদের ভবিষ্যৎ কর্ম্ম পদ্ধতি ঠিক করিতে বলেন। তাহার ফলে ক্যাপ্টেন মোহন সিং সিঙ্গাপুরের সমস্ত ভারতীয় সৈনিকদের লইয়া একটী সম্মেলন করেন এবং জাপানীদের সাহায্য লাভের জন্য রাসবিহারী বসুর নিকট যান। ইহার ফলে রাসবিহারী বসু জাপানীর দ্বারায় বন্দী ও নির্য্যাতিত ভারতীয় সৈনিকদের লইয়া আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করিবার উদ্দেশে ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে টোকিও সহরে সুদূর প্রাচ্যের সমুদয় ভারতীয়দের লইয়া একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। ২৮শে মার্চ হইতে ৩০শে মার্চ অবধি ইহার অধিবেশন হয়। এই সম্মেলনে পূর্ব্ব-এশিয়াস্থিত জাপান, চীন, মালয়, থাইল্যাণ্ড ও বর্ম্মা হইতে প্রবাসী ভারতবাসী সকলেই উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই সম্মেলনে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য Indian Independence League প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে স্থির হয় জাপানীরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবে না, বন্দী ভারতীয় সৈন্যেরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিবে এবং ঐ যুদ্ধের জন্য অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ, ব্যয়ভার বহন ইত্যাদি সবকিছুই জাপানীরা করিবে। ইহার পর জুন মাসের মাঝামাঝি সিঙ্গাপুরে আর একটি অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে রাসবিহারী বসু সভাপতি নির্ব্বাচিত হন এবং এই অধিবেশন নয় দিন স্থায়ী হয়। উক্ত অধিবেশনে রাসবিহারী বসু ঘোষণা করিলেন যে "ভারতীয়েরাই ভারতবর্ষ অধিকার করিবে এবং স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র গঠন করিবেন ভারতীয় নেতৃবর্গ।"

এই সময়ে জেনারেল তোজোর পরিচয় পত্র লইয়া নেতাজী সুভাষচন্দ্র

জাপানী ক্রুজার করিয়া জার্ম্মাণীতে যান। জার্ম্মাণীতে উপস্থিত হইয়া সুভাষচন্দ্র হিটলারের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সুভাষচন্দ্র হিট্‌লারকে জাপানে থাকিয়া রাসবিহারী বসু, তথায় যুদ্ধে বন্দী ভারতীয় সৈনিক ও প্রাচ্য এশিয়াবাসী প্রবাসী ভারতীয়দের উদ্যম ও প্রচেষ্টার কথা বিবৃত করেন। ইহাতে হিট্‌লার পরম প্রীতিলাভ করিয়া সুভাষচন্দ্রকে ভারতবর্ষের সর্ব্বাধিনায়ক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন। সঙ্গে সঙ্গে জার্ম্মান অধিকৃত ফ্রান্স প্রভৃতি ৮টি রাজ্য তাঁহাকে ভারতবর্ষের সর্ব্বাধিনায়ক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইল। সুভাষচন্দ্র জার্ম্মানিতে থাকিয়া হিটলার ও মুসলিনী সহিত সকল রকম পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

১৯৪২ সালের ১৫ই জুন ব্যাঙ্ককে প্রবাসী ভারতীয়দের লইয়া Indian Independence Leagueএর আর একটি সম্মেলন আহুত হয়। উহাতে সুদূর প্রাচ্যের শ্যাম, ব্রহ্ম, মালয়, জাভা, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি স্থান হইতে বহু ভারতীয় আসিয়া যোগদান করেন। এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন রাসবিহারী বসু। এই সভায় স্থির হইল যে সিঙ্গাপুরই Indian Independence Leagueএর প্রধান কেন্দ্র হইবে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের লইয়া কর্ম্ম পরিষদ গঠিত হইল। এই সময়ে সৈন্যগণকে যথারীতি শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ হইল। সভাপতি—শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বসু। অসামরিক সদস্য—মিঃ মেনন, মিঃ রাঘবন ও মিঃ গুহ। সামরিক সদস্য—ক্যাপ্টেন মোহন সিং, লেঃ কঃ গিলানি ও কঃ ভোঁসলা।

জাপানীরা প্রথমতঃ Indian Independenee Leagueকে সর্ব্ববিষয়ে সাহায্য করিতেছিল কিন্তু যখন তাহারা জানিতে পারিল তাহাদের প্রতি ভারতবাসীর বিরূপ মনোভাব তখনই তাহারা League এর কর্ত্তৃত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করিতে চাহিল। ইহাতে রাসবিহারী শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। জাপানের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে তাঁহার ভরসা হইল না। অথচ জাপানের এই মনোভাবকে তিনি আদৌ বরদাস্ত করিতে পারিলেন না। তখন তিনি সুভাষচন্দ্রকে শীঘ্রই জাপানে আসিয়া সব ব্যবস্থা করিতে লিখিলেন। সুভাষচন্দ্র রওনা হইতেছেন জানাইলেন। সকলে শুনিল যে সুভাষ বসু জার্ম্মাণী হইতে তাহাদের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইতেছেন। সকলে ঠিক করিল সুভাষ বাবু আসিয়া ভারতীয় সৈনিকদের লইয়া আজাদী হিন্দ ফৌজ গঠন করিলে সুবিধাই হইবে। রাসবিহারী বসু বলিলেন—"যদিও আমি চিরদিন ভারতের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করিয়াছি, তথাপি সুভাষবাবুর ন্যায় ভারতীয় জনপ্রিয় কংগ্রেস নেতা যদি আমাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ভারতবাসীর সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়া যুদ্ধ করা সুবিধা হইবে।"

১৯৪২ সালের ৮ই আগষ্ট, কংগ্রেস কমিটি "ভারত ত্যাগ কর" প্রস্তাব পাশ

করিলে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সমুদয় সভ্যকে গ্রেপ্তার করিয়া কারারুদ্ধ করেন। মহাত্মা গান্ধীও বন্দী হইলেন। ইহাতে ভারতের জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হইয়া বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহের সংবাদ সিঙ্গাপুর, বর্ম্মা ও টোকিওতে পৌছাইবামাত্র Indian Indepence Leagueএর অনেকখানি সাহস বর্দ্ধিত হইল। ইণ্ডিয়ান ইন্‌ডিপেণ্ডেন্স্ লীগের প্রধান কার্য্যালয় টোকিও হইতে প্রথমে ব্যাঙ্ককে, তারপর ব্যাঙ্কক হইতে ১৯৪৩ সালের জুনের শেষে সিঙ্গাপুরে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯৪৩ সালের জুনের শেষের দিক হইতে জুলাইমাসের প্রথমে সুভাষচন্দ্র সিংগাপুরে উপস্থিত হইলেন। তখন ভারতীয়দের লইয়া আর একটি অধিবেশন হইল। এই অধিবেশনে সৈনিকদের যে অভাব অভিযোগ আছে পূরণ করা হইল। ১৯৪২ সালের মার্চমাসে জাপানী কর্ত্তৃক ধৃত সৈন্য ও বেসামরিক লোকদের লইয়া যে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ গঠনের জন্য Indian Independence League গঠন করা হয়, তাহার কার্য্যসূচি ও নূতন গঠন ও নামকরণ সুভাষের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হইল। সুদূর প্রাচ্যের স্বাধীনতা সঙ্ঘের প্রায় ৩০০ শত শাখার প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। ঐ প্রতিনিধিগণের সভায় রাসবিহারীবাবু বলিলেন—"আজ আমি এই সঙ্ঘের সভাপতি রূপে সুভাষচন্দ্রকেই বরণ করিতে চাই। কারণ আমি বৃদ্ধ হইয়াছি এবং আমি জাপানী প্রজা বলিয়া একত্রে জাপান ও ভারতবাসীর সকল সাহায্য পাইব না। সুভাষচন্দ্র জার্ম্মাণী ও অন্যান্য রাষ্ট্র হইতে ভারতের সর্ব্বাধিনায়ক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। তিনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের দুইবার সভাপতি হইয়াছেন এবং ভারতীয়গণের উপর তাঁহার প্রভাব মহাত্মা গান্ধীর পরই। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করিয়া তিনি বহুবার কারাবরণ করিয়াছেন এবং ভারতের আপামর জনসাধারণের তিনি পূজা পাইয়া আসিতেছেন। কাজেই এখন যদি সুভাষচন্দ্র আমাদের এই সঙ্ঘের কর্ত্তৃত্ব ভার গ্রহণ করেন তাহা হইলে আমাদের সঙ্ঘের কাজ অনেকদূর অগ্রসর হইবে। আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ভারত আক্রমণ করিলে সুভাষচন্দ্র ভারতবাসীদেরও এইযুদ্ধে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ভারতের গত আগষ্ট বিপ্লবের সময় ভারতীয় সকলেই সুভাষের নেতৃত্বের জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়াছিল।"

তখন সুভাষচন্দ্র বসু উঠিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন:—

বন্ধুগণ! স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীর উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে। এখন হইতেই আমাদিগকে স্বাধীনতা লাভের সংগ্রামে অগ্রসর হইতে হইবে। সামরিক প্রথায় আমাদিগকে সজ্জিত হইতে হইবে। আমাদের আদর্শের প্রতি দৃঢ় আস্থা সম্পন্ন হইতে হইবে। অতএব আমি প্রাচ্যের সমুদয় ভারতীয়গণকে

আহ্বান করিতেছি তাঁহারা যেন আমাদের সম্মুখে ঘোরতর সংগ্রামের সম্মুখীন হন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাঁহারা এ আহ্বানে সাড়া দিবেন। আমি বহুবার সাধারণ্যে ঘোষণা করিয়াছি, যে যখন ১৯৪১ সালে আমি ভারত ত্যাগ করি, তখন আমার সমক্ষে যে-উদ্দেশ্য যে আদর্শ ছিল সেই উদ্দেশ্য সেই আদর্শই সমগ্র ভারতীয়ের সাধনার বস্তু। পুলিশ প্রহরীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়াও আমি দেশের অন্তরের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। আজ সেই আদর্শ সেই উদ্দেশ্য সফল করিবার সময় আসিয়াছে। আমি জানি প্রাচ্যের স্বদেশপ্রেমিক ভারতীয়গণ ভারতের স্বাধীনতাকামী ব্যক্তিগণের প্রচেষ্টায় আন্তরিক সহানুভূতি সম্পন্ন, তাঁহারা আজ পর্য্যন্ত যাহা করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে যাহা করিবেন তাহা ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনের অনুকূলে ছিল বা থাকিবে। আমরা এমন কিছুই করিতে পারি না যাহা আমাদের দেশের ক্ষতি সাধন করে বা আমাদের দেশবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী হয়। বন্ধুগণ! আমাদের সর্ব্বশক্তি সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করিতে হইলে আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে, স্বাধীন ভারতে এমন গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে যে, যেন উহা চিরকালের জন্য ভারতের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে। বন্ধুগণ! পরিশেষে আমি আপনাদের সতর্ক করিতে চাই যে আমাদেব শত্রুকে তুচ্ছ ভাবিলে চলিবে না। আমাদের শত্রু অতি ভীষণ, শক্তিশালী ও কপট। অতএব তাহাদের বিরুদ্ধে আমাদের খুব সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইতে হইবে। হয়তো আমাদিগকে—হয়তো কেন—নিশ্চয় আমাদিগকে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, হতাশা ও মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে হইবে—কিন্তু যদি আমরা সেই ঘোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারি, যদি শেষ পর্য্যন্ত অদম্য উৎসাহে আমরা আমাদের উদ্দেশ্যে সগৌরবে পৌঁছাইতে পারি, তবেই, তবেই আমরা আমাদের শৃঙ্খলিত, শত্রুশোষণে জর্জ্জরিত দেশকে মুক্তি দিতে পারিব, দেশের প্রকৃত উন্নতি বিধান করিতে পারিব।"

তাহার পর এই অধিবেশনে পূর্ব্ব গঠিত আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজের কুজ্‌কাওয়াজ প্রদর্শিত হইল। যে সকল সৈন্য দলাদলির ফলে সরিয়া পড়িয়াছিল তাহারা সকলেই এই সভায় যোগদান করিল। সুভাষচন্দ্র সৈন্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিকগণ! আজ আমাদের জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা গর্ব্বের দিন। আজ আমরা জগতের সমক্ষে ভারতের মুক্তি সেনা গঠনের কথা প্রচার করিতে পারিতেছি। যে সিঙ্গাপুর একদিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ ছিল আজ সেই সিঙ্গাপুরে আমাদের এই সেনাবাহিনী রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে। বন্ধুগণ! আমাদের এই সেনাবাহিনী ব্রিটিশের কবল হইতে ভারতবর্ষকে মুক্ত করিবে। প্রত্যেক

ভারতীয়ই ইহা ভাবিয়া গর্ব্বে স্ফীত হইবে যে আমাদের এই সৈন্যবাহিনী কেবল মাত্র ভারতীয়দের দ্বারাই গঠিত, ভারতীয় সমর-নেতাদের দ্বারা পরিচালিত। আর যখন সেই স্বাধীনতা সংগ্রামের মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হইবে তখন এই সৈন্য ভারতীয়দের নিয়ন্ত্রণাধীনে রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসের দিন সমাগত। শীঘ্রই ভারতের প্রত্যেক শিশুটি পর্য্যন্ত অনুভব করিবে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ অতীতের অলীক কাহিনী মাত্র।

তোমাদের সমরধ্বনি হইবে 'দিল্লী চলো, দিল্লী চলো।' জানিনা আমাদের এই স্বাধীনতা যুদ্ধে আমরা কতজন বাঁচিয়া থাকিব। কিন্তু এটা নিশ্চিত যে আমরা ভারতকে স্বাধীন করিতে পারিব।

বন্ধুগণ! আমার রাজনৈতিক জীবনে আমি ইহা লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি যে ভারত আজ স্বাধীনতা লাভের সম্পূর্ণ উপযুক্ত, কিন্তু একটি বিষয়ে তাহার ভারি অভাব ইহা তাহার মুক্তি ফৌজ। জর্জ ওয়াশিংটন যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার কারণ তাঁহার সৈন্যবল ছিল। গারিবল্ডি ইটালিকে স্বাধীন করিতে পারিয়াছিলেন কারণ তাঁহার পশ্চাতে ছিল অগণিত মুক্তি সেনা। আজ ভারতের এইরূপ একটি মুক্তি সেনা গঠনের প্রথম গৌরব আপনারাই অর্জ্জন করিবেন। যে সকল সৈনিক জাতির প্রতি বিশ্বস্ত থাকে, সর্ব্ব অবস্থায় স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিরা যায়, এবং যে সর্ব্বদাই জীবন উৎসর্গ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকে, সেই সকল সৈনিকই হয় দুর্দ্ধর্ষ অপরাজেয়। এই তিনটি জিনিষ আপনারা হৃদয়ে গ্রথিত করিয়া রাখুন। বন্ধুগণ! আজ আপনারাই ভারতের জাতীয় সম্মানের রক্ষক, ভরতেব আশা আকাঙ্খার মূর্ত্ত প্রতীক। অতএব আপনারা আসন্ন কর্ত্তব্যের জন্য প্রস্তুত হউন। সমগ্র ভারত আপনাদের আশীর্ব্বাদ করিবে; ভবিষ্যৎ ভারত আপনাদের স্মরণ করিয়া গর্ব্ব অনুভব করিবে। আমি আপনাদিগকে জানাইতেছি, যে আমি আপনাদের সহিত সুখে দুঃখে সুযোগে দুর্যোগে সর্ব্বদাই পাশে পাশে থাকিব; আপনাদের ব্যথায় ব্যথিত হইব, আপনাদের জয়ের আনন্দে উৎফুল্ল হইব। বর্ত্তমানে আমি আপনাদের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, পথের ক্লান্তি, এমন কি মৃত্যু ব্যতীত আর কিছুই দিতে পারি না; কিন্তু ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিতে আমরা কে বাঁচিব কে বাঁচিবে না তাহাতে কিছুই যায় আসে না, ভারতবর্ষকে যে স্বাধীন করিতে পারিয়াছি এবং তাহার জন্য যে আমাদের সর্ব্বস্ব দিয়াছি এইটাই হইবে আমাদের পরম সান্ত্বনা। ভগবান আমাদের সৈন্যদলকে আশীর্ব্বাদ করুন এবং আসন্ন যুদ্ধে আমাদের বিজয় গৌরব অর্পণ করুন।"

অতঃপর আজাদ হিন্দ্ ফৌজের নিম্নলিখিত সমর পরিষদের সৃষ্টি হইল :—

(১) নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু—রাষ্ট্রপতি, প্রধান মন্ত্রী এবং সমর ও পররাষ্ট্র সচিব।

(২) ক্যাপ্টেন মিসেস্ লক্ষ্মী—নারী সংগঠন।

(৩) এস্, এ, আয়ার—প্রচার বিভাগ।

(৪) লেঃ কর্ণেল এ, সি, চ্যাটার্জ্জি—অর্থ বিভাগ।

(৫) লেঃ কর্ণেল আজিজ আহম্মদ ; লেঃ কর্ণেল এল্, এস্, ভগৎ , লেঃ কর্ণেল জেঃ, কে, ভোঁস্‌লে ; লেঃ কর্ণেল গুলজারা সিং ; লেঃ কর্ণেল এম্, জেড্ কিয়ানি ; লেঃ কর্ণেল এ, ডি লোকনাথ ; লেঃ কর্ণেল এইসান কাদ্দির ; লেঃ কঃ সানওয়াজ—সৈন্য বাহিনীর প্রতিনিধি।

(৬) এ, এম্, সহায়—মন্ত্রীর পদমর্য্যাদা সম্পন্ন সেক্রেটারী।

(৭) রাসবিহারী বসু—প্রধান পরামর্শদাতা।

(৮) করিম গণি ; দেবনাথ দাস ; ডি, এম্ খাঁ ; এ, ইয়েলাপ্পা ; জেঃ, থিবি ; সর্দ্দার ঈশ্বর সিং—পরামর্শদাতাগণ।

(৯) এ, এন, সরকার—আইন বিষয়ক পরামর্শ দাতা।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস স্বয়ং এই শপথ গ্রহণ করিলেন—"আমি সুভাষ চন্দ্র বোস, ঈশ্বরের নামে শপথ গ্রহণ করিতেছি যে ভারতবর্ষকে এবং ভারতের ৩৮ কোটি লোককে স্বাধীন করিবার জন্য পবিত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত চালাইয়া যাইব।"

ইহার পর আজাদ হিন্দ্ গভর্মেণ্টের অন্যান্য অফিসারগণ শপথ করিলেন—"আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে ভারতবর্ষকে ও ৩৮ কোটি ভারত-বাসীকে স্বাধীন করিবার সংগ্রামে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসের অনুগত থাকিব, এবং তাহার জন্য আমার সর্ব্বস্ব এমন কি জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত থাকিব।"

Indian Independeuce League-এ সুভাষচন্দ্র যোগদান করিবার পর আজাদ হিন্দ্ ফৌজের প্রচার কার্য্য ও সংগঠন নূতন করিয়া আরম্ভ হয়। ১৯৪৩ সালের ৯ই জুলাই, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু নারীদের এক সভায় ঘোষণা করিলেন—"কেবলমাত্র ভারতবর্ষের মধ্য হইতে স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্ভব নয় বলিয়া আমি বাহিরের সাহায্য লইয়াছি। সর্ব্বশক্তিশালী ব্রিটেন যদি আমেরিকার ও অন্যান্য সকলের সাহায্য লইতে পারে তাহা হইলে আমাদেরই বা বাহির হইতে সাহায্য লইতে দোষ কি? আমরা জাপানের ও জার্ম্মানীর সাহায্য সর্ব্বান্তকরণে প্রার্থনা করি। তাহাতে
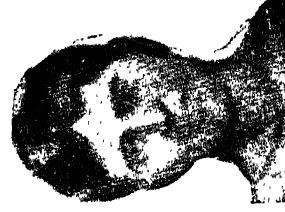
কয়েকজন বিপ্লবী নায়ক ও সহীদ—

বাম দিকের উপর হইতে :—(১) শ্রীউল্লাসকর দত্ত, (২) ৺যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, (৩) ৺ক্ষুদীরাম বসু, (৪) ৺গোপীনাথ সাহা, (৫) ৺যতীন্দ্র নাথ দাস, (৬) শ্রীমানবেন্দ্র নাথ রায়, (৭) শ্রী বিনায়ক দামোদর সাভারকার, (৮) শ্রীপুলিনবিহারী দাস, (৯) ৺কানাইলাল দত্ত, (১০) শ্রীসূর্য্য-কুমার সেন।

আমাদের কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই—কারণ ব্রিটিশ যখন আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন বন্ধ করিতে পারে নাই, তখন জাপান বা জার্ম্মাণী কেহই আমাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।" এই সময় সুভাষবাবু নারীদিগকে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগ দিতে আহ্বান করেন। তখন বহু নারী ক্যাপ্টেন লক্ষ্মীর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে ভর্ত্তি হন।

১৯৪৩ সালের ২৫শে আগষ্ট, সিঙ্গাপুরে আর একটি সভা হয়। ঐ সভায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু আজাদ্ হিন্দ ফৌজের সর্ব্বাধিনায়ক হইয়া ঘোষণা করেন—"ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য আজ আমি সৈন্যদের প্রত্যক্ষ পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলাম। ভারতের মুক্তি সেনার সেনাপতি হইবার অপেক্ষা অধিক কোন সম্মান ভারতবাসীর পক্ষে থাকিতে পারে না। ভারত মাতার মুক্তির জন্য ৩৮ কোটি ভারতীয়দের শুভেচ্ছাভাজন গভর্ণমেণ্ট গঠনের এবং ভারতের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে একটী গুরুত্বপূর্ণ ভার লইতে হইবে। আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হইবে ভারতের স্বাধীনতা। ভারতের মুক্তির জন্য 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন' এই নীতি আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে। আমাদের দায়িত্ব সহজ নয়। যুদ্ধ দীর্ঘকাল চলিবে এবং খুবই কঠোর হইবে। আসুন আমরাই 'দিল্লী চলো' এই ধ্বনি করিয়া সংগ্রাম করি। যতদিন না পর্য্যন্ত দিল্লীর বড়লাট প্রাসাদে আমাদের জাতীয় পতাকা উড্ডীন না হয়—যতদিন না দিল্লীর লাল কেল্লায় আমাদের সৈনিকেরা বিজয়োৎসব না করিতে পারে ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই।"

১৯৪৩ সালের ২১শে অক্টোবর, আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেণ্টের সিঙ্গাপুরে একটি সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় হংকং, শ্যাম, জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতিনিধিগণ যোগদান করেন। মালয়, বোর্ণিও, বর্ম্মা প্রভৃতি দেশ হইতেও প্রতিনিধিদল আগমন করিয়াছিলেন। এই সভায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বক্তৃতা প্রসঙ্গে ঘোষণা করিলেন—"ভারতভূমি হইতে ব্রিটিশ ও তাহার বন্ধুদের বিতাড়িত করিবার জন্য আমাদের এই অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টকে সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হইবে। ইহার পর ভারতের জনসাধারণ ইচ্ছানুযায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠন করিতে পারিবেন। আমাদের এই অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট প্রত্যেক ভারতীয়ের আনুগত্য দাবী করে। এই গভর্ণমেণ্ট কাহারও ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবেন না। জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলকে সমান সুযোগ ও অধিকার দান করিবেন। আমাদের এই গভর্ণমেণ্ট বিদেশী গভর্ণমেণ্টের সৃষ্ট সর্ব্ব বিভেদ অতিক্রম করিয়া সকলের সুখ স্বাচ্ছন্দ বিধান করিবার জন্য দৃঢ়পদে অগ্রসর

হইবেন। তাহারপর এই সভায় আজাদ্ হিন্দ্ গভর্ণমেণ্টের নূতন মন্ত্রীদের নাম ঘোষণা করা হয়। এবং উপস্থিত সকলেই ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন, এবং তন্নিমিত্ত সংগ্রাম চালাইয়া যাইবার শপথ গ্রহণ করেন।

ইহার কিছুদিন পরে জাপানের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করিলেন যে জাপানী গভর্ণমেণ্ট আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেণ্টকে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ স্বেচ্ছায় ছাড়িয়া দিবেন। আর জাপানী গভর্ণমেণ্ট আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেণ্টকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিবেন। ইহার পূর্ব্বেই জাপানী গভর্ণমেণ্ট আজাদী হিন্দ্ গভর্ণমেণ্টকে সিঙ্গাপুর ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। জাপানী গভর্ণমেণ্ট ইহাও ঘোষণা করিলেন যে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে আরও যে সকল স্থান আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেণ্টের প্রয়োজন হইবে তাহা তৎক্ষণাৎ বিনা দ্বিধায় ও সন্তুষ্ট চিত্তে ছাড়িয়া দিবেন। আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলে জাপানী গভর্ণমেণ্ট যে সাহায্যের প্রয়োজন হইবে তাহাই দান করিবে, এবং বিনিময়ে ভারতবর্ষের বন্ধুত্ব ছাড়া আর কিছুই কামনা করিবে না—এই কথা প্রধান মন্ত্রী টোজো সুস্পষ্ট করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

যখন সুভাষচন্দ্র জার্ম্মানী ও অন্যান্য ৮টি রাষ্ট্রের নিকট হইতে ভারতের সর্ব্বাধিনায়কত্বের সম্মান পাইলেন এবং জাপানী গভর্ণমেণ্ট উক্তরূপে ঘোষণা করিলেন, তখন সকলের মনে নব নব আশার সঞ্চার হইল। ইহার অব্যবহিত পরে ১৯৪৩ সালের ২৩শে অক্টোবর, আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেণ্ট ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিরুদ্ধে সিঙ্গাপুর হইতে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। এই সময়ে সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ ফৌজের শিক্ষাদান কার্য্য চলিতে লাগিল। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের উচ্চপদস্থ অফিসারেরা টোকিওর জাপানী সামরিক বিভাগে ভর্তি হইয়া রণকৌশল শিক্ষা করিতে লাগিলেন। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সৈন্যসংখ্যা ৬০ হাজার হইল এবং অফিসারের সংখ্যা দাঁড়াইল ৫০০। এই সৈন্য ও সেনানায়কগণের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খ্রীষ্টান, পার্শি প্রভৃতি সকল জাতির সমাবেশ ও মিলন হইল। তখন সৈন্যবাহিনীকে বিভিন্নদলে বিভক্ত করিয়া এক একটি দলের, সুভাষ ব্রিগেড্, গান্ধী ব্রিগেড্, নেহেরু ব্রিগেড্ ইত্যাদি নামকরণ করা হইল সুভাষচন্দ্র সৈন্য ও সেনানায়কগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"স্বাধীনতা লাভ করা পর্য্যন্ত আমরা কয়জন জীবিত থাকিব জানি না, তবে ভারত যে স্বাধীন হইবে ইহা সুনিশ্চিত, আর ভারতের স্বাধীনতার জন্য আমরা যে সর্ব্বস্ব দান করিয়াছি ইহাই হইল আজ আমাদের সমক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা। 'দিল্লী চলো' আর 'জয় হিন্দ্' হইবে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অভিবাদন।" এই সভায় নারীবাহিনী গঠিত হইল। উহার নামকরণ হইল' "ঝাঁসির রাণী বাহিনী"।

যখন 'ঝাঁসির রাণী বাহিনীর' শিক্ষাকেন্দ্রের উদ্বোধন হয় তখন সেই উদ্বোধন উৎসবে বক্তৃতা প্রসঙ্গে নেতাজী বলিয়াছিলেন "এই নারীবাহিনীর শিক্ষাকেন্দ্রের উদ্বোধন তাৎপর্য্যপূর্ণ। ইহা আমাদিগের নিছক রাজনৈতিক আন্দোলন নয়। নূতন জীবন লাভ করিবার জন্য আমরা অগ্রসর হইতেছি। আমাদের নূতন জীবনের ভিত্ হইবে সুদৃঢ়। ভারতের নারীদিগের মধ্যে নব জাগরণ দেখিয়া আমি আশান্বিত হইয়াছি। আমি আশা করি বা এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এই বাহিনী হইতে হাজার ঝাঁসির রাণী বাহির হইবে।" এই সময় যুদ্ধক্ষেত্রে ফৌজদের সাহায্য করিবার জন্য বালকদের লইয়া একটি সৈন্যদলও গঠিত হইল। সমস্ত সৈন্যদলের ব্যয়ভার বহন করিবার জন্য ভারতীয়েরা যথাসর্ব্বস্ব দান করিতে লাগিলেন। আজাদ হিন্দ্ ব্যাঙ্ক নামে একটি ব্যাঙ্কও স্থাপিত হইল।

আজাদ হিন্দ্ ফৌজ কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণ

১৯৪৪ সালের প্রথমেই আজাদ্ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের প্রধান কার্য্যালয় রেঙ্গুনে স্থানান্তরিত করা হইল। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, আজাদ হিন্দ সৈন্যদল ভারতব্রহ্ম সীমান্তের দিকে অগ্রসর হইল। সুভাষচন্দ্র পুরোভাগে রহিলেন। সেই সময় সুভাষচন্দ্র সৈন্যদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"দূরে, বহুদূরে, নদনদী অতিক্রম করিয়া অরণ্য পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া, ঐ আমাদের মাতৃভূমি! আমরা মাতৃভূমিতে ফিরিয়া যাইতেছি। ঐ শোন মা আমাদের ডাকিতেছেন। ভারতের রাজধানী দিল্লী আমাদের আহ্বান করিতেছে। ভারতের ত্রিশকোটি দেশবাসী আজ আমাদের কাতরস্বরে ডাকিতেছে—আর ডাকিতেছেন আমাদের পরমাত্মীয় পরিজনবর্গ। হে সৈনিক! উত্থান করো, হাতিয়ার গ্রহণ করো। যে পথ আমাদের দেশের বীর শহিদেরা প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন—সেই পথেই আমরা অগ্রসর হইব। ভগবান যদি চান, আমরা আমাদের পূর্ব্বগামীদের মত বীরের ন্যায় মৃত্যুবরণ করিব। যে পথে আমরা দিল্লী যাইয়া পৌঁছিব, শেষ শয্যা গ্রহণ করিবার সময় আমরা একবার সেই পথ চুম্বন করিয়া লইব। দিল্লীর পথই স্বাধীনতার পথ—চলো দিল্লী।"

১৯৪৪ সালের ১৮ই মার্চ আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ভারত-ব্রহ্ম সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ভারতমাতার ক্রোড়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সময় আজাদ হিন্দ্ ফৌজের চারিটি ব্রিগেড্ আসাম ব্রহ্ম সীমান্তে সমাবেশ করা হয়। তখন সুভাষচন্দ্র সৈন্যদের উদ্দেশ করিয়া বলেন—"শীঘ্রই আমরা সীমান্ত অতিক্রম করিয়া জন্মভূমিতে পদার্পণ করিয়া স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করিব। তারপর দিল্লী অভিমুখে আমাদের যাত্রা সুরু হইবে। সর্ব্বশেষ ইংরাজটি ভারত হইতে বিতাড়িত হইলে আমাদের যাত্রা শেষ হইবে। দিল্লীর জাতীয় ভবনে যে দিন

আমাদের পতাকা সগৌরবে উড্ডীন হইবে—যে দিন ভারতের মুক্তিফৌজ প্রাচীন লাল কেল্লায় বিজয় উৎসবে মাতিয়া উঠিবে, সেই দিনই আমাদের যাত্রা শেষ হইবে।"

এই সময় নেতাজী সুভাষচন্দ্র, মহাত্মা গান্ধীকে একখানি পত্র লিখিয়া জানাইলেন "এই যুদ্ধে ভারতবাসীরাই কর্ত্তা। তাহারা যাহা ভাল বুঝিতেছে তাহাই করিতেছে। জাপানীদের কোন কর্ত্তৃত্ব ইহাতে নাই—তবে আমরা জাপানী জেনারেল ও জাপানের সামান্য অস্ত্রশস্ত্র সাহায্য পাইয়াছি।"

তারপর প্যানেল সড়ক ধরিয়া গান্ধীব্রিগেড্ অগ্রসর হইতে লাগিল। বসু-ব্রিগেড্ কালাদান উপত্যকা অঞ্চলে শিবির সমাবেশ করিল। গান্ধীব্রিগেডকে সাহায্য করিবার জন্য আজাদ ব্রিগেড্ প্রস্তুত রহিল। সুভাষচন্দ্রের ধারণা ছিল ইম্ফল অধিকার অতি শীঘ্রই করিতে পারিবেন। ইম্পল অধিকারে আসিলে সৈন্য পরিচালনার যে খুব সুবিধা, ইহা নেতাজী জানিতেন। কারণ তখন দলে দলে ভারতবাসী আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজে আসিয়া যোগদান করিবে। ইম্ফল অধিকারের অভিযানের অধিনায়কত্ব করিয়াছিলেন মেজর জেনারেল সানওয়াজ। তিনিই প্রথমে ভারতভূমিতে পৌছাইয়া ত্রিবর্ণ পতাকা উড্ডীন করেন। অভিবান আরম্ভের প্রথম দিকে আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজ ১৫০০ বর্গমাইলেব অধিক ভারতভূমি দখল করে, এবং ঐ অধিকৃত স্থানে আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজ যখন ইম্ফল অবরোধ করিয়াছিল তখন তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন অতি শীঘ্রই মণিপুর তাঁহাদের দখলে আসিবে। কিন্তু ইত্যবসরে নিদারুণ বর্ষা পড়িয়া যায়। রসদ ও সাহায্য সময়মত সৈন্যদেব নিকট পৌছাইতে পারে না, অথচ আজাদী ফৌজকে প্রবল শত্রুর সম্মুখে ঘোরতর সংগ্রাম করিতে হইতেছে। দিনের পর দিন ঘাস খাইয়া" কোন রকমে জীবনধাবণ করিয়া তাঁহাবা যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন কিন্তু এই প্রতিকূল অবস্থাতে তাঁহাদের কিঞ্চিদ পশ্চাদপসারণ করা ব্যতীত গত্যন্তর রহিল না।

ইহার পর এপ্রিল মাসের প্রথম ভাগে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ মনিপুর রোড, কোহিমা প্রভৃতি সহরে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন প্রত্যেক যুদ্ধে আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজের জয় হইতে লাগিল। শত্রুপক্ষও প্রবল বেগে প্রতিরোধ করিল আর সঙ্গে সঙ্গে অসম্ভব বর্ষা নামিল। কোহিমা ইম্ফলের পথে বহু আজাদী হিন্দ্ সৈন্য অবরুদ্ধ হইয়া পড়িল। এইরূপ আরাকান ও মনিপুরের যুদ্ধেও প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের মধ্যে আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজদলে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। তখন আত্মরক্ষার জন্য সমস্ত সৈন্যকে নিরাপদ স্থানে পিছু হঠাইয়া রাখা হইল। তখন শুধু অল্প অল্প যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ১৯৪৫ সালের প্রথম ভাগে সুভাষচন্দ্র

এক বাণীতে বলিলেন—"যেখানেই আমরা লড়াই করিয়াছি, সেখানেই আমরা শত্রুকে ধ্বংস করিয়াছি। আবহাওয়া ও অন্যান্য সকল রকম অসুবিধার জন্য ইম্ফল হইতে সৈন্য অপসারণ করিতে হইয়াছে, কিন্তু আমাদের রক্ত পিপাসা মিটে নাই, আমরা রক্ত চাই, রক্ত, রক্ত, আরও রক্ত !"

১৯৭৫ সালের প্রথমদিকে জার্ম্মাণী শত্রুর সহিত যুদ্ধে প্রতিক্ষেত্রে পরাজিত হইতে লাগিল। জার্ম্মাণীর প্রধান প্রধান সেনানায়কগণ হিট্‌লারের অমতে ইংরাজ, আমেরিকা ও রাশিয়ার সহিত সন্ধি করিতে ব্যস্ত হইলেন। তাহারপর ইংরাজেরা একে একে জার্ম্মাণীর সকল সেনাপতিকে কৌশলে হস্তগত করিয়া জার্ম্মাণীর সীমান্তে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিলেন। ভারতেও ইংরাজ ও আমেরিকার সৈন্য দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করা হইল এবং তাহারাও নবোদ্যমে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। আজাদ হিন্দ্ ফৌজ অপেক্ষাকৃত অনুকূল আবহাওয়ার প্রতীক্ষায় আছেন, এমন সময় ব্রিটিশ ও আমেরিকান সৈন্য বর্ম্মা আক্রমণ করিল। তৎক্ষণাৎ আজাদ হিন্দ্ ফৌজের প্রধান কার্য্যালয়, রেঙ্গুন হইতে পুনরায় সিঙ্গাপুরে স্থানান্তরিত করা হইল। নেতাজী সুভাষচন্দ্র ১৯৪৫ সালের ২৭শে এপ্রিল রেঙ্গুন হইতে সিঙ্গাপুরে গমন করিলেন। বর্ম্মার রণক্ষেত্রে জাপানী সৈন্যেরা ইংরাজও আমেরিকানদের নিকট প্রত্যেক ক্ষেত্রে হাটিতে হটিতে লাগিল। সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুর যাইবার প্রাক্কালে আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন "আপনারা ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে বীরোচিত সংগ্রাম চালাইয়া আসিয়াছেন, কিন্তু আজ বেদনার সহিত আপনাদিগকে এখানে ব্রহ্মবাসীদের রক্ষার কাজে রাখিয়া আমাকে আফিস উঠাইয়া আবার সিঙ্গাপুরে যাইতে হইতেছে। আমাদের প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হইলেও, আমাদের চেষ্টার শেষ হয় নাই, আমাদিগকে আরও বহু চেষ্টা করিতে হইবে। আমি চির আশাবাদী। কোন অবস্থাতে আমি পরাজয় মানিয়া লইব না। **ইম্ফলের সমতল ভূমিতে, আরাকানের অরণ্য অঞ্চলে, ব্রহ্মদেশের তৈলখনি ও অন্যান্য স্থানে আপনাদের বীরত্বের কাহিনী ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে চির উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে।"**

ইহার পর ১৯৪৫ সালের ১৫ই আগষ্ট, সিঙ্গাপুর হইতে নেতাজী সুভাষচন্দ্র রেডিও মারফৎ সৈন্যদের তাঁহার শেষ বাণী প্রদান করিলেন। ঐ বাণীতে তিনি আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে নিকট ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন। ১৫ই আগষ্ট শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিন বলিয়া উহা একটী স্মরণীয় দিন ছিল। আর সুভাষচন্দ্রের আজাদী হিন্দ্ ফৌজের উদ্দেশ্যে শেষ লেখা বলিয়া এ দিনটী আরও স্মরণীয় হইল, তারপর এইদিন ইংরাজ ভারতবাসীর হাতে সমস্ত ক্ষমতা ছাড়িয়া দিবার জন্য এই দিনটী জগতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিল। ১৬ আগষ্ট

তারিখের প্রত্যুষে তিনি সিঙ্গাপুর ত্যাগ করিয়া টোকিওতে রাসবিহারীর সহিত আজাদী হিন্দ্ ফৌজের সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে গিয়া বিমান দুর্ঘটনায় আহত হইয়া হাঁসপাতালে নীত হন। ইহার পরই রাসবিহারী বসুও দেহত্যাগ করিলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র জীবিত আছেন কি না তাহা এখনও সঠিক জানা যায় নাই।

এদিকে জার্ম্মাণীর সম্পূর্ণ পরাজয় হইল। জার্ম্মাণীর নিকট হইতে প্রাপ্ত এ্যাটম্ বোমা লইয়া আমেরিকা জাপানের বড় বড় সহর বিধ্বস্ত করিতে আরম্ভ করিল। ইহাতে বিপর্য্যস্ত ছত্রভঙ্গ জাপান সন্ধি ভিন্ন উপায় দেখিল না। ইংরাজ ও আমেরিকানগণ রেঙ্গুনে আসিতে আরম্ভ করিল। আজাদ হিন্দ্ ফৌজ পশ্চাদপসারণ করিয়া ব্যাঙ্ককের দিকে অগ্রসর হইল। সকলে আশা করিয়াছিল নেতাজী এই স্থানে তাঁহাদের সহিত মিলিত হইবেন। কিন্তু সে আশাও ব্যর্থ হইল। ইংরাজ একে একে রেঙ্গুন, মালয়, শ্যাম, সিঙ্গাপুর পুনরধিকার করিতে লাগিল। ইহাতে সমুদয় জাপানী সৈন্য ও আজাদ্ হিন্দ ফৌজ ইংরাজের হস্তে বন্দী হইল। জাপান আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল।

ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট যুদ্ধে জয়লাভের জন্য আগষ্ট বিপ্লবের নেতাদের কারামুক্তি দিলেন। আজাদ হিন্দ্ ফৌজদের বিচারের জন্য ভারতে আনা হইল। ইহাতে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বীরত্ব কাহিনী সারা ভারতবর্ষে বিস্তার লাভ করিয়া নূতন উদ্দীপনার সঞ্চার করিল। ভারতের আবালবৃদ্ধবণিতার মুখে ধ্বনিত হইয়া উঠিল আজাদ হিন্দ্ ফৌজের রণ হুঙ্কার—'জয়হিন্দ', 'দিল্লী চলো।' আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বিচার হইবে শুনিয়া সারা ভারতবর্ষে বিপুল উত্তেজনা ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হইল। ভারতে অবস্থিত ভারতীয় নৌবাহিনীর সেনারা এই সংবাদ পাইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। এই বিদ্রোহে বহু সৈনিক হতাহত হইল। ইহার পর ভারতীয় সৈন্যদের মামলা আরম্ভ হইল—দিল্লীর লাল কেল্লায়। কংগ্রেসের বড় বড় আইনজ্ঞ নেতারা, যাঁহারা কোনদিন আদালতে ব্যারিষ্টারি করিতে আসেন নাই, তাঁহারা এবং ভারতের সকল প্রদেশের বড বড় ব্যারিষ্টারেরা ভারতীয় সৈন্যদের পক্ষ সমর্থন করিতে লাল কেল্লায় সমবেত হইলেন। পণ্ডিত জহরলালও ইঁহাদের পক্ষ সমর্থনের নিমিত্ত দাঁড়াইলেন। ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আইনজীবি ভুলাভাই দেশাই এই মামলার আসামী পক্ষের প্রধান ছিলেন। এই সময়ে সুভাষচন্দ্রের জন্ম তারিখ পালন করা হইল। ঐ দিনে ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত অবধি কম্পিত হইল। ইংরাজ বেশ বুঝিতে পারিল পালাভঙ্গের সময় আসিতেছে। তখন কৌশলী-ইংরাজ একটা মতলব স্থির করিয়া ফেলিল। আজাদী হিন্দ্ ফৌজের সমস্ত সেনা ও নৌবিদ্রোহের সেনাদের

মুক্তি দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতার কথাও ঘোষিত হইল। কিন্তু ইংরাজ তাহার স্বভাব সুলভ দুষ্ট বুদ্ধি পরিত্যাগ করিল না। যাইবার সময় ভারতকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া সাম্প্রদায়িক কলহ যাহাতে অব্যাহত থাকে সেই ব্যবস্থা করিতে লাগিল। কারণ তাহা হইলে সেই বিবাদের সুযোগ গ্রহণ করিয়া ইংরাজ এদেশে ব্যবসায় বাণিজ্য চালাইতে পারিবে এবং দলবিশেষের উপর প্রভুত্ব করিতে পারিবে। এইটাই হইল ব্রিটিশ প্রভুদের মনোগত ইচ্ছা।

যাহা হউক মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে ভয় পাইয়াই হউক, বা ভারতীয় বিপ্লবীদের ক্রমবর্দ্ধমান শক্তির জন্যই হউক, অথবা আজাদ হিন্দ্ ফৌজ এবং নৌ বিদ্রোহের দরুণই হউক, আর ইংরাজ-স্বার্থরক্ষার জন্যই হউক, ১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭ সাল, ভারতের স্বাধীনতা ইংরাজ-রাজ কর্তৃক স্বীকৃত হইল। ঐ দিন ইংরাজ ভারতীয়দের হস্তে সমুদয় ক্ষমতা অর্পণ করিলেন।

কোন নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে হইলে সচারাচর মাসের প্রথম হইতে অথবা বৎসরের প্রথম হইতে হইয়াই থাকে, কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা ১৫ই আগষ্ট হইল কেন? প্রশ্নটা আপাতদৃষ্টিতে অপ্রয়োজনীয় মনে হইলেও, ইহার ভিতরে একটা রহস্য রহিয়াছে মনে হয়। সেটা সকলের জানিয়া রাখা ভাল। শ্রীঅরবিন্দ (১৯১৪-১৮ সালে) তাঁহার সম্পাদিত "আর্য্য" পত্রিকায় পণ্ডিচেরি হইতে তাঁহার জন্ম তারিখ উৎসবের দিন বলিয়াছিলেন—"১৫ই আগষ্ট ভারতের নব জন্ম হইবে।" ঐ ১৫ই আগষ্ট শ্রীঅরবিন্দেরই জন্ম তারিখ প্রতিপালিত হইতেছে। ১৯৪৫ সালের ঠিক ঐ তারিখেই নেতাজী সুভাষচন্দ্র (শ্রীঅরবিন্দের ভক্ত) ভারতের স্বাধীনতার জন্য শেষ বাণী দিয়াছিলেন। আবার ঐ ১৫ই আগষ্ট তারিখে অভিনব অহিংস সংগ্রামের নায়ক ও ঋষি মহাত্মা গান্ধীর প্রিয়শিষ্য ও ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী মহাদেব দেশাইয়ের মৃত্যু হইয়াছিল।

তাই মনে হয় আমাদের উপরে কোন ঐশ্বরিক শক্তি সর্ব্বদাই কাজ করিতেছে। ধর্ম্মভূমি ভারতবর্ষ চিরদিনই বহু দেবতার ভজনা করিয়া আসিতেছে। আজও তাই আমরা মহাত্মা গান্ধী, শ্রীঅরবিন্দ ও নেতাজী সুভাষ চন্দ্রকে অবতাররূপী ভারতের শ্রেষ্ঠ মানব হিসাবে পূজা করিতে কুণ্ঠিত হইব না। ইহাদের প্রদর্শিত পথে আমাদের সকলকে একদিন না একদিন যাইতেই হইবে। আমাদের ভারতবর্ষ একদিন ধর্ম্মে মহান, কর্ম্মে মহান হইয়া জগতের সকলকে মুক্তির পথ দেখাইয়া দিবেই। শ্রীঅরবিন্দ (১৯১৪-১৮) বলিয়াছিলেন—"যুগযুগান্তের ভারত মরে নাই, তাহার সৃষ্টির শেষ কথা এখনও বলা হয় নাই, সে জীবিত রহিয়াছে নিজের জন্য, সমগ্র মানবজাতির জন্য

এখনও তাহার কিছু করিবার রহিয়াছে। আর এখন যাহা জাগ্রত হইতে চাহিতেছে তাহা একটা ইংরাজি ভাবাপন্ন (anglisized) প্রাচ্য জাতি নহে, পাশ্চাত্যের অনুগত শিষ্য হওয়া এবং পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার ফলাফলগুলির পুনরাভিনয় করাই তাহার নিয়তি নহে, পরন্তু তাহা এখনও সেই প্রাচীন স্মরণাতীত কালেরই শক্তি পুনরায় নিজের গভীরতর আত্মার সন্ধান পাইতেছে, সকল জ্যোতি ও শক্তির পরম উৎসের দিকে নিজের মাথা আরও উচ্চ করিয়া তুলিয়া ধরিতেছে, নিজের ধর্ম্মের পূর্ণ অর্থ ও বিশালকর রূপ আবিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে।"

স্বাধীনতা-সংগ্রামের তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

আজাদ হিন্দ ফৌজের কয়েকজন নায়ক—
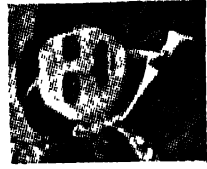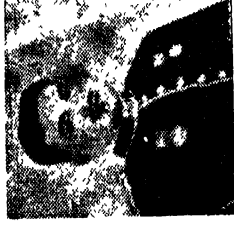
বাম দিকের উপর হইতে :—(১) ৺রাসবিহারী বসু, (২) ক্যাপ্টেন মোহন সিং, (৩) ক্যাপ্টেন সা'নাওয়াজ, (৪) ক্যাপ্টেন ধীলন, (৫) ক্যাপ্টেন সাইগল, (৬) ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী, (৭) ক্যাপ্টেন বথকদ্দিম, (৮) ক্যাপ্টেন ভোঁসলে, (৯) ক্যাপ্টেন কাদের নাওয়াজ, (১০) রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ।

চতুর্থ অধ্যায়

১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭ সাল

ইংরাজের সদিচ্ছা ও ভারতত্যাগ

পূর্ব্বাভাষ

যে ইংরাজ প্রায় দুইশত বৎসর এদেশ শাসন ও শোষণ করিয়া আসিতেছে, আজ কেন তাহারা আপোষে ভারত ত্যাগ করিয়া চলিল, কেন তাহাদের সহসা এই শুভবুদ্ধি ও সদিচ্ছার উদয় হইল, তাহার ইতিহাস ভারতবাসী মাত্রেরই অল্প বিস্তর জানা আছে। ভারতবাসী এতদিনে ইংরাজকে ভাল করিয়াই চিনিতে পারিয়াছে। ১৯০৬ সালে "যুগান্তর" রক্তধ্বজা বক্ষে ধারণ করিয়া বাহির হইয়াই বলিয়াছিল—"হে ইংরাজ, তুমি শিক্ষিত ভারতবাসীকে ভেড়া বানাইয়াছ, তুমিই পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের লেলাইয়া দিয়াছ। হে ইংরাজ, আমরা তোমায় দূর হইতে প্রণাম করি। তুমি ইন্‌কাম ট্যাকস্ ও নানাবিধ ট্যাক্সের দ্বারা সমরে বিজয়ী, ইত্যাদি ইত্যাদি।" অর্থাৎ আমাদের এই ন্যায়-বিচারক প্রজাবৎসল সম্রাটের জাত এই ইংরাজ জাতি বুদ্ধির খেলায় অপরাজেয়। সে চিরদিনই পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙিয়া খাইয়াছে, বিড়ালের ঝগড়ায় বানরের রুটিভাগ করাই তাহাদের প্রধান পেশা। এ হেন জাতিকে সরলপ্রাণ ধর্ম্মভীরু ভারতীয়েরাও বুঝিতে পারিয়াছে, এবং বারবার প্রণাম না করিয়া থাকিতে পারে নাই।

কিন্তু শতদোষ থাকা সত্ত্বেও ইংরাজের অতি বড় প্রধান শত্রুও বলিবে—"ইংরাজের ধৈর্য্য ও বুদ্ধি পৃথিবীর সকল জাতি অপেক্ষা বেশী। ইহারা কোন কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া তাড়াতাড়ি নাম কিনিতে চায় না। পৃথিবীর অন্যান্য জাতির ন্যায় ইহারা অভিজাত্য গর্ব্ব লইয়া একটা অলৌকিক বা অদ্ভুত কাজ করিতে চায় না। ইহারা কঠোর পরিশ্রমী এবং সব কাজই ইহারা নিয়ম-পূর্ব্বক করে। রাজনৈতিক বিচক্ষণতাও ইহাদের কম নয়, তাই প্রথম পৃথিবী-ব্যাপী মহাসমরে ও দ্বিতীয় পৃথিবীব্যাপী মহাসমরে আজও ইহারা বাঁচিয়া আছে।"

প্রথম পৃথিবীব্যাপী মহাসমরে পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গা চলিতেছিল

সত্য, কিন্তু দ্বিতীয় মহাসমরে পূর্ব্বোক্তনীতি অনুসরণ করিতে গিয়া ইংরাজেরা 'আক্কেল সেলামি' যথেষ্ট দিয়াছে। প্রাণে সে বাঁচিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার সে গর্ব্বোন্নত শির অবনমিত হইয়াছে। বিশ্বের রাষ্ট্রশক্তির মাপকাটিতে আজ সে তৃতীয় শক্তিতে পর্য্যবসিত। তাহার শিল্প গিয়াছে, বাণিজ্য গিয়াছে—তাহার বাড়ীঘর; নগরী, প্রাসাদ, শত্রুর নির্ম্মম আক্রমণে ধ্বংস স্তূপে পরিণত। এক কথায় যাকে বলে 'অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি।' হিটলারের কথায় বলিতে গেলে আজ ইংরাজ "আমেরিকার সাহায্যপুষ্ট ব্রিটেন," আজ ইংরাজ বিশ্ব দরবারে দেউলিয়া।

প্রায় দুইশত বৎসর যাবৎ ইংরাজ এই বিশাল ভারত সাম্রাজ্য শাসন করিয়া যেরূপ বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছে তাহা সবই সদিচ্ছা প্রণোদিত। ভারতবাসীর প্রতি সদিচ্ছা প্রণোদিত হইয়া তাহারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপে শাসন সংস্কার করিয়াছে এবং প্রত্যেক সংস্কারে তাহাদের সেই তথাকথিত সদিচ্ছা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। ৬৫ বৎসর পূর্ব্বে যে প্রথম রাষ্ট্রীয়-সংস্কার আন্দোলন উপস্থিত হয়, এবং যাহা পরিচালনা করিবার জন্য সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ দূরদর্শী নেতেরা অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহারই ফলে ১৮৯২ সালে Lord Cross's Act" নামে শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তিত হয়। ইহার পরে স্বদেশী আন্দোলন ও বিপ্লবী আন্দোলন দেখা দিল। সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজের সদিচ্ছায় ১৯০৯ সালের Morley Minto Reforms আত্মপ্রকাশ করিল। ইহার পর পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনও গুরুতর আকার ধারণ করে। সুতরাং ইংরাজের সদিচ্ছায় ১৯১৯ সালের Montague Chelmsford Reforms প্রবর্ত্তিত হইল। এই সংস্কারে ভারতকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা হইল। সমস্ত রাজবন্দীর মুক্তিদান, প্রেস আইন প্রভৃতি দমননীতি মূলক সমস্ত আইন প্রত্যাহার বিষয়ে ইংরাজ সরকারের প্রজাবাৎসল্য এবং দ্বৈত শাসন প্রবর্ত্তন করিয়া যুদ্ধে ভারত-বাসীদের অকৃত্রিম সাহায্যের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল। ইহার পরেই আসিল মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন। কিন্তু এবার ইংরাজ শাসন সংস্কারের দ্বারায় আর সদিচ্ছা প্রকাশ করিল না। কাজেই মহাত্মা কর্ত্তৃক আনীত এই আন্দোলনের সহিত শাসন সংস্কারের কোন সম্বন্ধ রইল না।

মহাত্মা গান্ধী যে অসহযোগ আন্দোলন সৃষ্টি করিলেন তাহাতে ইংরাজের সুবিধা অসুবিধা দুই হইল। ইংরাজ এই আন্দোলনের সুযোগ গ্রহণ করিয়া নিছক সদিচ্ছা প্রণোদিত হইয়া 'Divide and Rule' পলিসির আশ্রয় লইল। এই নূতন পলিসি মাহাত্ম্যে কিভাবে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া দুইটি সম্প্রদায়কে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করা হইল তাহার তিক্ত ইতিহাস সকলেরই জানা আছে। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সহিত মুসলমানগণের সহযোগিতার আশায়

মহাত্মা গান্ধী খিলাফৎ আন্দোলন আরম্ভ করিলেন, আর সেই সুযোগে ইংরাজের সদিচ্ছায় মোল্লা মৌলবীগণ হিন্দুদের ঘাড়ে চাপিয়া বসিল। ইংরাজের সদিচ্ছা ফলপ্রসূ হইল। মোপলার বিদ্রোহ ও কোহাটের তাণ্ডবলীলা ভারতময় হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা বাধাইয়া দিল। গান্ধী তিন সপ্তাহ উপবাস করিয়া এই ভ্রাতৃবিরোধ জনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন।

এতদিন কংগ্রেস ১৯১৯ সালের Dyarchyকে বর্জ্জন করিয়া আসিতেছিলেন কিন্তু পরে চিত্তরঞ্জন দাস, মতিলাল নেহরু প্রমুখ কংগ্রেস সেবীগণ গান্ধীর অমতে কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়া দ্বৈতশাসনের ধাঁধাঁয় পড়িয়া গেলেন। হিন্দু মুসলমান প্যাক্ট স্বীকার করিয়া লওয়া ব্যতীত ইহাদের গত্যন্তর রহিল না। বাংলা দেশে জনসংখ্যার অনুপাতে ৫৫টি আসন মুসলমানকে দেওয়া হইল। এই সময় অহিংস অসহযোগ-আন্দোলন বিরাট আকার ধারণ—করিল। ইংরাজ সদিচ্ছা প্রণোদিত হইয়া তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড রেডিংএর দ্বারা একটা আপোষ মীমাংসার ব্যবস্থা করিলেন।

১৯২৯ সালে, অর্থাৎ মণ্টেগু রিফর্মের দশ বৎসর পরে উহার পরিবর্ত্তনের সময় আসিল। তখন ইংরাজের সদিচ্ছায় তৎকালীন ভারতসচিব লর্ড বার্কেনহেড্ একবৎসর আগেই সাইমন সাহেবের সভাপতিত্বে Statutory Commission ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। এই কমিশনে কোন ভারতবাসী না থাকায় কংগ্রেসের হিন্দু নেতারা উহা বয়কট করিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এবং পরবর্ত্তী ঘটনা বিবেচনা করিয়া বলা যায় যে উক্ত কমিশনের রিপোর্টে হিন্দুদের অনেক সুযোগ সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল। ইংরাজের চিরাচরিত সদিচ্ছায় মুসলমানেরা উহা বয়কট না করিয়া ইংরাজের প্রীতিভাজন হইলেন। তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড আরউইন আর একদফা ব্রিটিশ সদিচ্ছার 'খেল' দেখাইবার জন্য বিলাতে গিয়া ১৯৩০ সালের গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করিয়া আসিলেন। কংগ্রেসের হিন্দুনেতাদের সন্তুষ্ট করিবার জন্য ঐ বৈঠকে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্ প্রদান করিবার অঙ্গীকার করা হইল। কিন্তু কংগ্রেসপক্ষ তখন 'নাল্পে সুখমস্তি' নীতি গ্রহণ করিয়া পূর্ণ-স্বরাজ চাহিয়া বসিলেন, এবং উক্ত গোল টেবিল বৈঠক বর্জ্জন করিলেন। ইহার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। ইংরাজের সদিচ্ছা এমন জিনিষ নয় যে বাধা দানে ব্যাহত হইবে। তৎকালীন লেবার গভর্মেণ্টের প্রধান মন্ত্রী র‍্যাম্জে ম্যাক্‌ডোনাল্ড ও ভারত সচিব ওয়েজউড্‌বেন কংগ্রেসের ঈদৃশ মনোভাব দেখিয়া স্থির করিলেন যে, এই বিশাল ভারতে হিন্দু ব্যতীত মুসলমান প্রমুখ আরও যে বহু জাতি বিদ্যমান রহিয়াছে এবং যে বহু সংখ্যক দেশীয় রাষ্ট্র রহিয়াছে তাহাদেরই সাহায্যে হিন্দু রাজনৈতিক দলকে জব্দ ও

কোণঠাসা করিতে হইবে। অতএব তাঁহারা সদিচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া "হোয়াইট পেপার" তথা All-India Federationএর ব্যবস্থা করিলেন এবং এই পরিকল্পনা Communal Awardএর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইল। ইংরাজের সদিচ্ছা ভারতের জাতীয় ঐক্যের মূলে সুকৌশলে কুঠারাঘাত করিল। যে Federationএ, Assemblyতে সাইমন রিপোর্ট অনুসারে ২৫০টি আসনের ভিতর ১৫০টি হিন্দুর নির্ব্বাচিত আসন ছিল, সেই Assemblyতে Award অনুযায়ী ৩৭৫এর ভিতরে মোট ১০৫টি নির্ব্বাচিত হিন্দুর আসন দেওয়া হইল। অবশিষ্ট আসনগুলির মধ্যে ১২৫টি রহিল দেশীয় রাজন্যবৃন্দের প্রতিনিধিদের জন্য (অবশ্য ইহারা ইংরাজের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলি মাত্র) আর ৮২টি মুসলমানগণ পাইলেন, আর বাকীগুলি পাইলেন ইউরোপীয় ও ইউরেশিয়াণগণ। অথচ ভারতবর্ষের তিন চতুর্থাংশ লোকই হিন্দু।

১৯৩১ সালে লর্ড উইলিংডন ভারতের গভর্ণর জেনারেল হইয়া আসিয়া সদিচ্ছাবশতঃ মহাত্মা গান্ধীকে বিলাতের দ্বিতীয় গোল টেবিলবৈঠকে লইয়া গেলেন এবং সেখান হইতে মহাত্মার দ্বারা এই 'হোয়াইট্ পেপার' পাশ করাইয়া লইলেন। এই হোয়াইট পেপারই Communal Award নামে সর্ব্বজনবিদিত। বলা বাহুল্য যে মহাত্মার দ্বারায় 'হোয়াইট পেপার' পাশ করাইবার পূর্ব্বেই ইংরাজ সদিচ্ছা প্রণোদিত হইয়া উক্ত হোয়াইট্ পেপার মিঃ জিন্না ও আম্বেদকরের দ্বারায় পাশ করাইয়া সমস্ত ব্যবস্থা কায়েমী করিয়া রাখিয়াছিলেন, মহাত্মা গান্ধীর উহা গ্রহণ করা ছাড়া উপায় ছিল না।

১৯৩২ সালে এই বিখ্যাত Award বাহির হইল। দেশময় হিন্দুদের প্রতি অবিচারের বিরুদ্ধে ভীষণ আন্দোলন উপস্থিত হইল। মহাত্মা গান্ধী তখনই এই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় মাথা না ঘামাইয়া হিন্দু সমাজ হইতে অনুন্নত সম্প্রদায়কে পৃথক করায় আপত্তি করিলেন। তাঁহার ধারণা হইল ইহার দ্বারায় হিন্দুদের মধ্যেই আবার বিচ্ছেদের বীজ বপন করা হইতেছে। কাজেই তিনি প্রায়োপবেশন করিয়া ইহার নিষ্পত্তি করিতে ব্যস্ত হইলেন। ফলে যারবেদা জেলে 'পুণা প্যাক্ট' হইল। এই প্যাক্ট অনুযায়ী কম্যুন্যাল এওয়াডের হিন্দুর ১০৫টি আসনের মধ্যে ১৯টি হরিজনদের জন্য বরাদ্দ হইল।

১৯৩৫ সালে নূতন শাসনতন্ত্র বিধিবদ্ধ হইল। এই সময় হইতেই মহাত্মা গান্ধী রাজনীতির সংশ্রব ত্যাগ করিলেন। এবং এখন হইতে হরিজন আন্দোলন লইয়া ব্যস্ত রহিলেন। এই সময় কংগ্রেসী নেতারা মন্ত্রীত্ব গ্রহণে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সত্যমূর্ত্তি প্রথমেই বলিলেন "মন্ত্রীত্ব চাই!" তখন রাজা গোপালাচারি, সর্দ্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল প্রভৃতি no changerএরা এই দিকে

ভিড়িয়া গেলেন। পণ্ডিত জহরলালের আপত্য টিকিল না। সর্ব্বত্রই কংগ্রেসের তরফ হইতে নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে অবতরণ করা হইল। ১৯৩৭ সালের ১৪ই জুলাই হইতে কংগ্রেস দলের সকলেই মন্ত্রীর আসনে বসিলেন। ভারতের এই ১৪ই জুলাই তারিখটিও অসহযোগ আন্দোলনেব একটি স্মবণীয় দিন। ইহাতে ইংবাজের সদিচ্ছার ফাঁপরে কংগ্রেসসেবীরা পড়িয়া গেলেন।

১৯৩৯ সালে পৃথিবীব্যাপী মহাসমর আরম্ভ হইল। ইংরাজের সদিচ্ছায় ভাবতবর্ষ যুদ্ধ রত দেশের মধ্যে পরিগণিত হইল। কংগ্রেসের তরফ হইতে ইংরাজের এইরূপ সদিচ্ছার কৈফিয়ৎ তলব করা হইল, কিন্তু ইংরাজ প্রভুরা মৌন থাকাই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিলেন। ১৯৪০ সালে ভারতের তদানীন্তন বড় লাট লর্ড লিনলিথগো ঘোষণা করিলেন যে যুদ্ধান্তে ভারতের শাসন সংস্কার করিবার অধিকার ভারতবাসীদেরই দেওয়া হইবে কিন্তু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন শাসনতন্ত্র তাহাদের উপর চাপানো হইবে না। ইংরাজের সদিচ্ছায় এই ঘোষণার তাৎপর্য্য মুসলমানগণের বুঝিতে বাকী রহিল না—সুতরাং তাঁহারা ইংরাজের সহযোগিতা করিতে ব্যস্ত হইলেন। কংগ্রেস মন্ত্রীসভা এই ঘোষণার প্রতিবাদে মন্ত্রীসভা ত্যাগ করিলেন—আর মিঃ জিন্না লীগওয়ালাদের "মুক্তি দিবস" পালনের নির্দ্দেশ দিলেন। তারপর ১৯৪২ সালের প্রথমে জাপান যখন একের পর একটি করিয়া সুদূর প্রাচ্যের ইংরাজের অধিকৃত স্থানগুলি দখল করিয়া বর্ম্মা অধিকার করিল, তখন ইংরাজের তথাকথিত সদিচ্ছাব মূলে আন্তরিকতার আভাষ পরিলক্ষিত হইল। অতএব এই সদিচ্ছার ফলস্বরূপ ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ ভারতের নেতৃবর্গের নিকট একটি নূতন পরিকল্পনা উপস্থিত করিলেন।

এই পবিকল্পনার ভিতর বলা হইল—যুদ্ধ শেষে ভারতের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবাব ভার ভারতবাসীকেই দেওয়া হইবে, এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের এবং ভারতীয় রাজ্য সমূহের প্রতিনিধিরাই আসন গ্রহণ করিবেন। যদি কোন প্রদেশ শাসনতন্ত্র গ্রহণে অসম্মত হয়, তবে ঐ প্রদেশ যুক্তরাষ্ট্রের বাহিরে থাকিতে পারিবে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ইংলণ্ডের সহিত ক্ষমতা হস্তান্তর সম্বন্ধে একটি সন্ধি করিবে, কিন্তু ব্রিটিশসাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন হইবার ক্ষমতা তাহার থাকিবে। যতদিন যুদ্ধ চলিবে ততদিন ভারতের নিরাপত্তার চরম দায়িত্ব ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের উপরেই থাকিবে। কংগ্রেস এরূপ সদিচ্ছায় বিশ্বাস করিতে পারিল না। মহাত্মা গান্ধী স্পষ্ট জানাইয়া দিলেন—"এখনই যদি ঐরূপ ক্ষমতা আমরা না পাই তাহা হইলে ভবিষ্যতের আশায় বসিয়া থাকিতে পারি না।"

ইহার পরই ১৯৪২ সালের ৮ই আগষ্ট রাত্রে "ভারতছাড়" প্রস্তাব পাশ হইল। আর ৯ই আগষ্ট ভোর হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজের সদিচ্ছায় মহাত্মা গান্ধী হইতে সকল নেতাদের গ্রেপ্তার করা হইল। ইহাতে সারাদেশ বিক্ষুব্ধ হইয়া পড়িল। ইংরাজ তখনই সদিচ্ছার পরিচয় দিয়া হাজার হাজার নিরীহ জনসাধারণকে ধ্বংস করিলেন এবং কণ্ট্রোল প্রথা চালু করিয়া যুদ্ধে ইংরাজকে সাহায্য করিবার জন্য সকলকে বাধ্য করিলেন। চোরা কারবারের ব্যবস্থা করিয়া অনেক দেশদ্রোহীর সৃষ্টি করিলেন। পরম কল্যাণের ভিতর দিয়া ভারতের নিরাপত্তার চরম দায়িত্ব প্রতিপালিত হইল। ১৯৪৪ সালে মাহাত্মার কারামুক্তির পর রাজাগোপালাচারি মিঃ জিন্নার সহিত একটা আপোষের পরিকল্পনা করিয়া পাকীস্থানের দাবী স্বীকার করিয়া লইলেন। মিঃ জিন্না তথাপি এই পরিকল্পনাটিও ইংরাজের সদিচ্ছায় গ্রহণ করিলেন না।

১৯৪৫ সালে যখন জার্ম্মাণী, জাপান ও নেতাজীর আজাদ হিন্দ্ ফৌজ পরাজিত হইল—তখন বন্দী আজাদ্ হিন্দ ফৌজকে ভারতবর্ষে বিচারার্থ আনা হইল। ইহা উপলক্ষ্য করিয়া ভারতে তীব্র আন্দোলন উপস্থিত হইল এবং ভারতীয় নৌ-সৈন্যেরা বিদ্রোহ করিল। আবার অন্যদিকে রাশিয়ার ভাবগতিকও ভাল নয়। ইহার উপর ইংরাজের এত সাধের হিন্দু-মুসলমান বিভেদ যখন আজাদ হিন্দ্ ফৌজ মীমাংসা করিয়া ফেলিল, তখন ইংরাজের আবার সদিচ্ছার প্রকাশ পাইল। তখন (১৪ই জুন, ১৯৪৫ সাল) ভারত সচিব আমেরী ঘোষণা করিলেন-"ক্রীপস্ পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয় নাই, এখনও তাহা গ্রহণ করিতে পারা যাইবে।" তাহার পর নূতন আর একদফা সদিচ্ছার পরিচয় দিয়া ১৬ই জুন, কংগ্রেসের ওয়াকিং কমিটির সকল মেম্বারকে মুক্তি দেওয়া হইল। ভারতের বড়লাট লর্ড ওয়াভেলও সিমলায় নেতৃবৃন্দের এক সম্মেলন আহ্বান করিলেন। সে সম্মেলনও ইংরাজের সদিচ্ছার ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইল।

১৯৪৬ সালের ১৯ শে ফেব্রুয়ারী আবার ইংরাজের ভারতের প্রতি তথাকথিত সদিচ্ছার বাণী ঘোষিত হইল যে "তিনজন মন্ত্রী ভারতবর্ষে আগমন করিয়া লর্ড ওয়াভেলের সহযোগিতায় ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিতে নেতৃবৃন্দকে সহায়তা করিবেন।" ইহার কয়েকদিন পরে প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ্যাট্‌লি বলিলেন—"যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে আর সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়গুলির অগ্রগতি রোধ করিতে দেওয়া হইবে না।" ইহাতে এমনই সদিচ্ছার প্রকাশ পাইল যে সকলেই মনে করিল ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট আর লীগের অযৌক্তিক দাবী সমর্থন করিবেন না। মন্ত্রীমিশন ২৫শে মার্চ্চ,

ভারতবর্ষে আগমন করিলেন, আর ২৯শে জুন ভারত পরিত্যাগ করিলেন। দিল্লী ও সিমলায় অনেক বৈঠক বসিল, কিন্তু ইংরাজের সদিচ্ছায় মিঃ জিন্না তাঁহার পাকীস্থানের দাবী পরিত্যাগ করিলেন না। ১৬ই মে, মন্ত্রীমিশন সিমলাতে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিলেন—"পাকীস্থানের দাবী অযৌক্তিক ও ভারতের স্বার্থ হানিকর।" তবে ইংরাজের সদিচ্ছায় লীগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য মুসলমান প্রধান প্রদেশগুলিতে সম্পূর্ণভাবে মুসলমান কর্তৃত্ব রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন। ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের সদিচ্ছায় কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করা হইল—কারণ সেখানে হিন্দু প্রধান্য হইবে। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট গুলিকে প্রায় স্বতন্ত্র ও সর্ব্বশক্তিমান করা হইল, কারণ পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু, বেলুচিস্থান ও বঙ্গদেশ মুসলমান প্রধান। ইহাও স্থির হইল যে আসামের যে অংশ মুসলমান প্রধান সেই অংশ বঙ্গদেশের সহিত যুক্ত করা হইবে। গণপরিষদের সভ্যগণ প্রাদেশিক আইনসভার সভ্যগণ কর্তৃক মনোনীত হইবেন। ব্রিটিশ শাসন অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলি স্বাধীন হইবে বা যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিতে পারিবে। যাহা হউক ইংরাজের সদিচ্ছায় লীগ ও কংগ্রেস উভয়েই মন্ত্রীমিশনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিল। এইরূপ নানাভাবে ব্যবস্থা করিয়া দেখা গেল ২৯৬টি সভ্যের মধ্যে কংগ্রেসের সমর্থক হইবে ২১১ টি এবং লীগের হইবে মাত্র ৭৩ টি। গণপরিষদে কংগ্রেসেরই কর্তৃত্ব থাকিবে দেখিয়া ইংরাজের সদিচ্ছায় ও মিঃ জিন্নার পরামর্শে লীগ কাউন্সিল ২৯শে জুলাই তারিখে মন্ত্রীমিশনের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করিয়া, ১৬ই আগষ্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিন স্থির করিলেন। এই প্রত্যক্ষ সংগ্রামে মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাব বর্জ্জন করিয়া Peaceful demonstration করা হইবে স্থির হইলেও প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সুরু হইল হিন্দুর বিরুদ্ধে। সহস্র সহস্র নিরীহ হিন্দু নাগরিক কলিকাতা রাজধানীর (সভ্যতা কৃষ্টির প্রধাধ কেন্দ্রের) রাজপথে গুণ্ডা কর্তৃক নিহত হইল—কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইল। বাংলার লীগ-গভর্ণমেণ্ট লীগ কাউন্সিলের প্রস্তাব সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিবার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে হত্যাকারীকে সাহায্য করিয়া আত্ম-রক্ষাকারী হিন্দুর উপর তীব্রভাবে দমননীতি চালাইতে লাগিলেন। আর ইংরাজের সদিচ্ছায় ছোট লাট ও বড়লাট বাহাদুর নিয়ম-তান্ত্রিক কর্ণধার হইয়া এই বর্ব্বর হত্যালীলা প্রত্যক্ষ করিয়া প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সাক্ষ্য দিলেন। ইংরাজের সদিচ্ছা সাম্প্রদায়িক তিক্ততায় পর্য্যবসিত হইতেছে দেখিয়া সাম্রাজ্য লিপ্সু ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট বাহিরে লীগের কার্য্যের নরমসুরে নিন্দা করিলেও অন্তরে খুসী হইলেন।

ইহার পর পণ্ডিত নেহেরু ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে অন্তবর্ত্তী সরকার গঠন করিয়া নিজেই ইহার নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। পরিশেষে লর্ড ওয়াভেলের সাধুচেষ্টায় ও সদিচ্ছায় অক্টোবর মাসের শেষভাগে লীগদল অন্তবর্ত্তী গভর্ণমেণ্ট যোগদান করিলেন। ইহার পর গণপরিষদ গঠনের প্রস্তাব হয়। ৯ই ডিসেম্বর গণপরিষদের প্রথম বৈঠকের দিন স্থির হয়। ইহাতে ইংরাজের সদিচ্ছায় মোস্‌লেম লীগ যোগদান করিলেন না। তখন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ্যাট্‌লি ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে আলোচনার জন্য লণ্ডনে আহ্বান করেন। কংগ্রেস, লীগ ও শিখদলের প্রতিনিধিগণ লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া যথারীতি আলোচনা করিলেন, কিন্তু কোন মীমাংসা হইল না। এ্যাট্‌লি লীগের ব্যাখ্যা সমর্থন করিয়া সদিচ্ছার পরিচয় দিলেন। কংগ্রেস এখন সব কিছুই মানিয়া লইতে স্বীকৃত হইল, কিন্তু লীগ তথাপি গণপরিষদে যোগ দিল না। ১৯৪৭ সালের জানুয়ারী মাসে গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশন হইল। ২০শে ফেব্রুয়ারী মিঃ এ্যাটলি সদিচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া ঘোষণা করিলেন যে ১৯৪৮ সালের জুন, মাসের মধ্যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারত শাসনের সমুদয় দায়িত্ব ভারতবাসীর হস্তে অর্পণ করিয়া ভারত পরিত্যাগ করিবে। যদি লীগ গণপরিষদে যোগদান না করে তাহা হইলে ব্রিটিশ কাহার হস্তে ক্ষমতা অর্পণ করিবেন তাহা পরে ঘোষিত হইবে। প্রয়োজন হইলে ভারতের বিভিন্ন অংশের শাসনভার বিভিন্ন দলের হাতে দিয়া ব্রিটিশ ভারতত্যাগ করিবে।" ভারতের ঐক্য রক্ষার সঙ্কল্প ব্রিটিশ সদিচ্ছায় দেখা গেল না। প্রকৃত পক্ষে পাকীস্থান মানিয়া লইবার কথাই হইল। ইহাতে আবার ভারতের চারিদিকে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গারূপে দেখা দিল। তখন ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট লর্ড ওয়াভেলের স্থলে লর্ড মাউণ্ট ব্যাটেনকে বড়লাট করিয়া ভারতে প্রেরণ করিলেন। এই বড়লাট বাহাদুরের সদিচ্ছায় শেষ পর্য্যন্ত কংগ্রেস ও মুস্‌লিম লীগকে পৃথক পৃথক গণপরিষদ গঠন করিবার জন্য আহ্বান করা হইল।

ইহার পর ৩রা জুন, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট আর একটি ঘোষণা করিলেন। ঐ ঘোষণা অনুযায়ী ভারতবাসীকে দুইটি ডোমিনিয়নে ভাগ করা হইল—একটি ভারতীয় ইউনিয়ন অপরটি পাকীস্তান। অর্থাৎ হিন্দুসংখ্যা গরিষ্ঠ যেসব প্রদেশ সেখানে ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন, এবং মুসলমান সংখ্যা গরিষ্ঠ প্রদেশ সেখানে পাকীস্তান প্রতিষ্ঠিত হইল। কংগ্রেস ও মোস্‌লেম লীগ উহাতে সম্মত হইলেন। তখন ইংরাজের সদিচ্ছার আবার নূতন সমস্যার উদ্ভব হইল। বাংলা-দেশে ১০ বৎসর যাবৎ পাকীস্তান শাসনের নমুনা দেখিয়া বাঙ্গালী হিন্দুরা ভীত হইয়া পড়িল। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর প্রথম ঘোষণার উপর ভিত্তি করিয়া তাহারা

দাবী করিল যে বাংলাদেশের হিন্দুগরিষ্ঠ জেলা গুলিকে ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করা হউক—লীগ-শাসনতন্ত্র জোর করিয়া তাহাদের ঘাড়ে চাপানো চলিবে না। ইহাতে মোসলেম লীগ আবার 'লড়কে লেঙ্গে'র তাণ্ডব সুরু করিয়া দিল। ওদিকে পাঞ্জাবের কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা ভাঙিয়া গিয়া দাঙ্গা আরম্ভ হইল। পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখেরা তাহাদের জন্য ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত স্বতন্ত্র রাষ্ট্র দাবী করিল। ইংরাজের সদিচ্ছায় পরিপুষ্ট লীগ ফাঁপরে পড়িয়া গেল। কিন্তু লীগের কায়েদে আজম কায়দা হইলেন না—তিনি কর্ত্তিত (Truncated) পাকীস্তান লইতেই সম্মত হইলেন। ফলে পাঞ্জাব ও বাংলাদেশ পূর্ব্ব, পশ্চিম করিয়া ভাগ হইল। পাঞ্জাবের পূর্ব্বদিক ও বাংলার পশ্চিম দিক হিন্দুপ্রধান বলিয়া ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হইল আর পশ্চিম পাঞ্জাব ও পূর্ব্ব বাংলা পাকীস্তান ডোমিনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হইল। আসামের মুসলমান-প্রধান সিলেট জেলাটি পূর্ব্ববঙ্গের সহিত সংযুক্ত করিয়া পাকীস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হইল। পাঞ্জাবের সীমান্ত প্রদেশের পাঠানেরা প্রথমে ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করিতে চাহিয়াছিলেন—কিন্তু ইংরাজের সদিচ্ছায় ও মোসলেম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের তিক্ত অভিজ্ঞতা এড়াইবার জন্য তাঁহারা স্বাধীন পাঠানীস্থান গঠনের সঙ্কল্প করিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সকল রকম দাবী অগ্রাহ্য করিয়া সীমান্ত প্রদেশের কংগ্রেসী-মন্ত্রীসভা ভাঙিয়া দিয়া সীমান্ত প্রদেশকে পাকীস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হইল। আবার ইংরাজের সদিচ্ছায় বাংলা ও পাঞ্জাব দেশকে Boundary Commission বসাইয়া এমনভাবে ভাগ করা হইল যাহাতে উভয় সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্ব চিরস্থায়ী থাকে এবং ইংরাজের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। বিশেষতঃ এই বাঙ্গালী-হিন্দু এবং পাঞ্জাবী হিন্দু ও শিখ নেতাজীর আজাদ্ হিন্দ ফৌজে যোগদান করিয়া ভারত হইতে ব্রিটিশশক্তি উচ্ছেদ করিতে চাহিয়াছিল। অতএব একটা স্বাভাবিক জাতক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া এই দুই জাতীকে জব্দ ও ধ্বংস করিবার জন্য তাহাদিগকে নানান অসুবিধায় ফেলিয়া চিরস্থায়ী সাম্প্রদায়িক কলহের মধ্যে ঠেলিয়া দিবার জন্য এই সীমানা নির্দ্ধারণের অপকৌশল গ্রহণ করা হইল।

যাহা হউক এখন ইংরাজের সদিচ্ছার দিল্লীতে দুইটি গণপরিষদ গঠন করা হইয়াছে। অধিকাংশ দেশীর রাজ্য ভারতীয় ইউনিয়রের গণপরিষদে যোগদান করিয়াছেন। হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুর ব্রিটিশের সদিচ্ছায় মুগ্ধ হইয়া নিজেকে সার্ব্বভৌম স্বাধীনরাজ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, তবে ইহাও বলিয়াছেন আবশ্যক বোধ করিলে তিনি যে কোন গণপরিষদে যোগদান করিবেন। বোধ হয় এই আবশ্যকটি ইংরাজের সদিচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে। আরও দুই একটি দেশীয়রাজ্য স্বাধীন সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করিবেন কি গণপরিষদে

যোগদান করিবেন তাহা এখনও ইংরাজের সদিচ্ছায় স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

এইরূপ ইংরাজ-সদিচ্ছার আমরা আর কত পরিচয় পাইব তাহা জানি না। তবে ইংরাজের সদিচ্ছায় আজ ইংরাজ ভারতের নিকট হইতে ১৫৬৬ কোটী টাকার ঋণ কৌশলে ফাঁকি দিবার মতলব করিয়াছেন—ভারতের সদ্যলব্ধ স্বাধীনতা রক্ষা করিবার সন্ধিক্ষণে তাহাকে দেউলিয়া করিবার জন্য। তথাপি সদিচ্ছা বশতঃই তাহারা এমন করিয়া আমাদের স্বাধীনতা দান করিয়া গেল একথা স্বীকার করিতেই হইবে। হয়তো ইহার মূলে তাহাদের সেই কূট-নৈতিক চাল—তাহাদের সেই বুদ্ধির খেলা আছে, হয়তো তাহারা প্রত্যাবর্ত্তনের পথ পাইবে বলিয়া আশা করে—কিন্তু সেই পুরাতন প্রবাদ অনুযায়ী "অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি পড়িয়াছে।" ইংরাজ যাহাই আশা করিয়া থাকুক, তাহাদের সে আশায় ছাই পড়িবে—তাহাদের "সে-গুড়ে বালি" পড়িবেই। এটা ঠিকই যে একদিন না একদিন হিন্দু-মুসলমান নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিবে, তখন তাহারা একত্রে মিলিবে—ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্দের বন্ধনে। তখন তাহারা আর ইংরাজের সদিচ্ছার উপর নির্ভর করিবে না—ইংরাজের সদিচ্ছায় যখন তাহাদের সব গিয়াছে দেখিতে পাইবে, তখন তাহারা 'একজাত, একপ্রাণ' হইয়া অখণ্ড ভারতসাম্রাজ্য স্থাপনে প্রয়াসী হইবে।

১৫ই আগষ্ট ইংরাজ সরকারের ভারত ত্যাগ

গান

"বিজয়ী বিশ্ব তিরঙ্গা প্যারা,
ঝণ্ডা উঁচা রহে হমারা॥
সদা শক্তি বরসানে ওয়ালা
প্রেম সুধা সরসানে ওয়ালা
বীরোকো হরষানে ওয়ালা,
মাতৃভূমিকা তন-মন-সারা।
ঝণ্ডা উঁচা রহে হমারা॥

স্বতন্ত্রতাকে ভীষণ রণমেঁ,
লখ কর বঢ়ে জোশ ক্ষণ-ক্ষণমেঁ,
কাঁপে শত্রু দেখ কর মনমেঁ
মিট জায়ে ভয় সংকট সারা।
ঝণ্ডা উঁচা রহে হামারা॥

ইস ঝাণ্ডেকে নীচে নির্ভয়,
লেঁ স্বরাজ্য ইহ অবিচল নিশ্চয়,
বোলো 'ভারত-মাতাকী জয়,'
স্বতন্ত্র্যতা হী ধ্যেয় হমারা।
ঝণ্ডা উঁচা রহে হামারা॥

আও প্যারে বীরো আও,
দেশ-ধর্ম্মপর বলি বলি জাও,
এক সাথ সব মিল কর গাও,
প্যারা ভারত দেশ হমারা।
ঝণ্ডা উঁচা রহে হমারা॥

ইসকী শান ন জানে পাওএ
চাহে জান ভলে হী জারে,
বিশ-বিজয় করকে দিখলায়ে,
তব হোকে প্রণ পূর্ণ হমারা।
ঝণ্ডা উঁচা রহে হমারা॥"

দিল্লীর অনুষ্ঠান

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট, বৃহস্পতিবার, রাত্র ১২টা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরাজি-মতে ১৫ই আগষ্ট আরম্ভ হইল। সেই শুভমুহূর্ত্তে ব্রিটিশ-সরকার ভারতীয়দের হস্তে সকল ক্ষমতা অর্পণ করিলেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের শেষ পর্ব্ব ১৫ই আগষ্ট, ভারতীয় ডোমিনিয়নের পার্লামেণ্ট ও পাকিস্তান পার্লামেণ্ট রাজ-প্রতিনিধি লর্ড মাউণ্টব্যাটেন কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৃহস্পতিবার রাত্র ১২টা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে "শঙ্খধ্বনি" "বন্দেমাতরম" ও "জয় হিন্দ" ধ্বনি সহকারে এবং অন্যান্য নানাবিধ মাঙ্গলিক আচারের সহিত ভারতের প্রতিগৃহে স্বাধীন-

ভারতের নূতন জাতীয় পতাকা উড্ডীন হইল। পাকীস্তান রাষ্ট্রেও পাকীস্থানী-পতাকা উড্ডীন হইল।

ঐ দিন রাত্র ১২টার সময় ভারতীয় ইউনিয়নের গণপরিষদের অধিবেশন বসে এবং তাহা এক ঘণ্টা ১৫ মিনিট স্থায়ী হয়। গণপরিষদের অধিবেশন আরম্ভের পূর্ব্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনী "বন্দেমাতরম্" গানটি গাহিবার পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু কর্ত্তৃক উপস্থাপিত আনুগত্যের শপথ সম্পর্কিত প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সমস্ত সদস্য নিম্নলিখিত শপথটি গ্রহণ করার পর ভারতীয় ডোমিনিয়নের গণপরিষদের সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও ভারতীয় ডোমিনিয়নের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু বড়লাট ভবন অভিমুখে যাত্রা করেন।

গণপরিষদের শপথ

"দুঃখ ও ত্যাগের ভিতর দিয়া ভারতবাসীর স্বাধীনতা অর্জ্জনের এই পরমমুহূর্ত্তে আমি ভারতীয় গণপরিষদের একজন সদস্যরূপে ভারতের ও ভারতবাসীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিতেছি, যাহাতে এই প্রাচীন দেশ জগৎসভায় তাহার ন্যায্য আসন লাভ করিতে এবং মানব জাতির কল্যাণ ও বিশ্বশান্তির জন্য পূর্ণ ও সাগ্রহ সাহায্য প্রদান করিতে পারে।"

ভারতীয় ইউনিয়নের মোসলেম্ লীগদলের লীডার চৌধুরী খালেক কুজ্জুমান পণ্ডিত নেহেরুর প্রস্তাব সমর্থন করিয়া এই আশা ব্যক্ত করেন যে "ধ্বনির যুগের অবসান হইয়াছে, এবং সকলে যেন ভারতের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য কাজ করেন।" ডাঃ রাধাকৃষ্ণ প্রস্তাবটি সমর্থন করেন।

গণপরিষদের অধিবেশনের প্রথমেই ভারতের যে সব শহীদ জীবনদান করিয়াছেন, তাঁহাদের জন্য দুই মিনিট সকলে মৌন থাকিয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন। তাহার পর অধিবেশনের প্রস্তাব ক্রমে মাউণ্টব্যাটেনকে ভারতীয়-ইউনিয়নের বড়লাট পদে বরণ করা হয়।

গণপরিষদের সভাপতি **ডাক্তার রাজেন্দ্রপ্রসাদ** তাঁহার অভিভাষণে বলেন —"বহু বর্ষ স্বাধীনতা সংগ্রামের পর আজ আমরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অধিকার করিতে যাইতেছি। যাহারা এই সংগ্রামে সব কিছু বিসর্জ্জন দিয়াছেন, এমন কি ফাঁসি-মঞ্চে আরোহণ করিয়াছেন, বন্দুকের গুলির সাম্নে বুক পাতিয়া দিয়াছেন, আন্দামানের অসহনীয় ক্লেশভোগ করিয়াছেন, সেইসব জানা ও অজানা স্বাধীনতা-সংগ্রামের শহীদ ও সাহসী সৈনিকদের আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ ও কৃতজ্ঞচিত্তে

স্মরণ করিতেছি। জাতীয় জীবনের এই শুভ মুহূর্ত্তে আমরা মহাত্মা গান্ধীর প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাইতেছি। ত্রিশ বৎসরের অধিক তিনি স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালিত করিয়াছেন। ভারতের এই জীবনমরণ সংগ্রামে তিনিই আমাদের পথপ্রদর্শক ও উপদেষ্টারূপে পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। তিনি ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতীক্। তিনি সত্য ও অহিংসার অমোঘ অস্ত্রে আমাদিগকে সুসজ্জিত করিয়াছেন, যাহাব ফলে নিরস্ত্র আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়ী হইয়াছি। আজ স্বাধীনতা দিবসের বিজয়োৎসবে আমরা তাঁহাকে কৃতজ্ঞ-চিত্তে স্মরণ করি। তাঁহার অপরিসীম্ দান দেশবাসী কখনই বিস্মৃত হইবে না, ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। জাতিকে নৈরাশ্যের অন্ধকার হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।"

ভারতীয় স্বাধীনতার সনদ

এই গণ-পরিষদ ভারতকে স্বাধীন সার্ব্বভৌম সাধারণতন্ত্ররূপে ঘোষণা করার অনমনীয় সঙ্কল্প প্রকাশ করিতেছে এবং এ দেশের ভবিষ্যৎ শাসন কার্য্যের জন্য শাসনতন্ত্র প্রণয়নের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিতেছে ;

এই ইউনিয়ন গঠিত হইবে সেই সকল এলাকা লইয়া যেগুলি বর্ত্তমানে বৃটিশ ভারতের বা সীমান্ত রাজ্যসমূহের মধ্যে আছে ও ভারতের অন্য যে সকল অংশ বর্ত্তমানে বৃটিশ ভারত বা সামন্ত রাজ্য উভয়েরই বাহিরে রহিয়াছে এবং এতদুপরি, যে সকল এলাকা ভারতের স্বাধীন সার্ব্বভৌম সাধারণতন্ত্রের অঙ্গীভূত হইতে ইচ্ছুক এবং

এই এলাকাগুলি তাহাদের বর্ত্তমান সীমানা বা গণ-পরিষদ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত অপর কোনও সীমানাসহ, প্রবর্ত্তিত শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী, ইউনিয়নের উপর যে সকল ক্ষমতা বা কার্য্যভার অর্পিত হইবে, অথবা স্বভাবতঃই যে সকল ক্ষমতা ও কার্য্যভার ইউনিয়নের হাতে আসিবে, তদ্ব্যতীত অবশিষ্ট সকল ক্ষমতার অধিকারী হইবে এবং স্বশাসক এলাকার মর্য্যাদা অর্জ্জন করিবে, এবং এই সার্ব্বভৌম স্বাধীন ভারতে, উহার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত অংশে ও শাসনযন্ত্রের সর্ব্বক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতা ও কর্ত্তৃত্ব জনসাধারণের নিকট হইতেই লব্ধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং

এই ইউনিয়নে ভারতের সর্ব্বশ্রেণীর জনসাধারণ যাহাতে সামাজিক, বৈষয়িক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার লাভ করে ; আইনের চোখে সকলে সমতুল্য মর্য্যাদা ও সুযোগ পায় ; ইউনিয়নের প্রবর্ত্তিত বিধানাবলী এবং সামাজিক ও নৈতিক আদর্শের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া চিন্তা, ভাষা, বিশ্বাস, ধর্ম্মমত

পূজার্চ্চনা বৃত্তি, সভা-সমিতি ও কার্য্যের স্বাধীনতা অর্জ্জন করে তাহার প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হইবে এবং উহা পাওয়ার সুব্যবস্থা করা হইবে এবং

এই ইউনিয়নে সংখ্যালঘু, অনগ্রসর ও উপজাতীয় এলাকাসমূল এবং অনুন্নত ও অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্য পর্য্যাপ্ত রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করা হইবে এবং এতদ্বারা. সাধারণতন্ত্রের এলাকার অখণ্ডতা এবং সভ্য জাতিসমূহের দ্বারা স্বীকৃত ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও বিধান অনুযায়ী জল, স্থল ও অন্তরীক্ষ্যে উহার সার্ব্বভৌম অধিকার রক্ষিত হইবে এবং

এই প্রাচীনভূমি যাহাতে বিশ্ব-সভায় তাহার যথাযোগ্য মর্য্যদালাভ করিতে পারে এবং বিশ্বশান্তি ও মানবকল্যাণের জন্য স্বেচ্ছামূলকভাবে পূর্ণ সহযোগিতা করিতে সমর্থ হয় তাহার ব্যবস্থা করা হইবে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর বাণী

শুভদিন আজ সমাগত, সেই বিধি নির্দ্দিষ্ট শুভদিন। দীর্ঘদিনের সুপ্তি ও সংগ্রামান্তে ভারত আবার উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে;—জাগ্রত তেজোদ্দীপ্ত, মুক্ত, স্বাধীন ভারত! অতীত এখনও অনেক জায়গায় আমাদের আঁকড়াইয়া রহিয়াছে। আমাদের বহুবিঘোষিত প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে এখনও অনেক কাজ বাকী। তবু আজ সংশয়-সংকটময় মূহূর্ত উত্তীর্ণ হইয়াছে, ইতিহাস আজ নূতনরূপে আমাদের সম্মুখে দেখা দিয়াছে। এই ইতিহাস রচনা করিব আমাদের জীবনের মধ্য দিয়া, আমাদের কর্ম দিয়া। ভাবীকালেব ঐতিহাসিক তাহা লিখিয়া রাখিবেন। আমাদের ভারতের পক্ষে, সমগ্র এশিয়ার পক্ষে এবং সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ উপস্থিত। প্রাচ্যের আকাশে এক নূতন তারকার—স্বাধীনতার তারকার উদয় হইল। নূতন এক আশার সঞ্চার হইল, দীর্ঘকালের স্বপ্ন আজ বাস্তব রূপে গ্রহণ করিল। এই তারকা যেন আর অস্ত না যায়, এই আশা যেন কোনও চক্রান্তে বিনষ্ট না হয়—ইহাই কামনা করি।

যদিও আকাশ আজ মেঘাবৃত, যদিও আমাদের দেশবাসীর অনেকেই আজ দুঃখক্লিষ্ট এবং একাধিক দুরূহ সমস্যা আমাদের চারিদিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, তথাপি স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার আনন্দোৎসব আজ আমরা পালন করিব। কিন্তু স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে গুরু দায়িত্বভারও গ্রহণ করিতে হয়; স্বাধীন ও সুশৃঙ্খল জাতির মত আমাদের তাহা গ্রহণ করিতে হইবে।

যিনি এই জাতির পিতা, এই স্বাধীনতার যিনি স্রষ্টা, প্রাচীন ভারতের আত্মার যিনি মূর্ত প্রতীক স্বাধীনতার মশাল তুলিয়া ধরিয়া যিনি আমাদের

তমসাচ্ছন্ন আকাশ আলোকে উদ্ভাসিত করিয়াছেন—আজ সর্বাগ্রে তাঁহাকে স্মরণ করি।

তাঁহার যোগ্য অনুগামী অনেক সময়েই আমরা হইতে পারি নাই, তাঁহার নির্দেশ বহুবার লঙ্ঘন করিয়াছি। কিন্তু আত্মবিশ্বাসে আত্মিকশক্তিতে, সাহসে ও বিনয়ে অপূর্ব গরিমায় ভারতের এই মহান সন্তানের আত্মিক প্রভাব কেবল আমাদের নহে, পরবর্তী যুগেও প্রাণে প্রাণে অনুভূত হইবে; তাঁহার নির্দেশ তাহারাও স্মরণ করিবে। ঝড়ঝঞ্ঝা যতই প্রবল হউক, স্বাধীনতার এই মশাল আমরা কখনই নিভিয়া যাইতে দিব না।

স্বাধীনতা সংগ্রামের যে সকল অজ্ঞাত সেবক ও সৈনিক প্রশংসা বা পুরস্কারের প্রত্যাশা না রাখিয়া ভারতের সেবা করিয়াছে, এমন কি তাহার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়াছে—এখন আমরা তাহাদের স্মরণ করিতেছি।

রাজনৈতিক ভাগাভাগির ফলে আমাদের যে সকল ভ্রাতা-ভগিনী আজ আমাদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন এবং দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের সহিত এই নবলব্ধ স্বাধীনতার উৎসবে যোগদানে অসমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকেও আজ স্মরণ করি। তাঁহারা আমাদেরই আপন জন ছিলেন এবং সকল অবস্থাতেই তাহা থাকিবেন। তাঁহাদের সৌভাগ্যে, দুর্ভাগ্যে আমরা সমভাবেই অংশীদার হইব। ভবিষ্যৎ আমাদের দিকে তাকাইয়া আছে—কোন পথে আমরা চলিব? কী হইবে আমাদের কাজ? ভারতের কৃষক, শ্রমিক ও জনসাধারণকে স্বাধীনতা দান, সুযোগ দান—ইহাই হইবে আমাদের কর্তব্য। দারিদ্র্য, অজ্ঞতা ও ব্যাধির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইবে, ইহাদের দূর করিতে হইবে। এক সুসমৃদ্ধ, প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক জাতি গড়িয়া তুলিতে হইবে, এবং প্রত্যেক নরনারীর জীবন যাহাতে পূর্ণতা লাভের ও সর্বত্র সুবিচার লাভের সুযোগ পায় এই উদ্দেশ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপন করিতে হইবে। কঠিন কাজ আমাদের সন্মুখে রহিয়াছে। যতদিন না আমাদের প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণ প্রতিপালন করিতেছি, যতদিন না সমুদয় ভারতবাসীকে তাহাদের বিধিদত্ত অধিকার দান করিতেছি, ততদিন পর্যন্ত আমাদের কাহারোই বিশ্রাম করা চলিবে না।

সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের বাণী

"স্বাধীনতার সংগ্রামে জাতি আজ জয়যুক্ত হইয়াছে। আমাদের জীবনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছে,—সেই বিজয়োৎসবে আমরা আজ যোগ দিতে পারিতেছি। এই সংগ্রামের এই গৌরবময় পরিসমাপ্তি যাঁহাদের আত্মত্যাগের ফলে হইয়াছে, আজ সর্বাগ্রে তাঁহাদের স্মরণ করা আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য। স্বাধীনতালাভের

আনন্দোৎসবে দেশবাসী আজ সসম্ভ্রমে তাঁহাদের স্মরণ করুক। আমাদের মত যাঁহারা আজ এই দিনটিতে বাঁচিয়া আছেন, তাঁহারা নিজেদের সৌভাগ্যের জন্য গর্বিত ও গৌরবান্বিত বোধ করিবেন। গান্ধীজীর প্রেরণায় ও নেতৃত্বে শান্তিপূর্ণ ও অহিংস উপায়ে দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রাম চালাইয়া চরম সম্মানের গৌরবময় আসনে ভারতকে প্রতিষ্ঠিত করার গৌরবে আমবা আজ গৌরাবান্বিত। অবশ্য ইহা স্বীকাব করিতে হইবে, যে, আমাদের ঈপ্সিত লক্ষ্যে আমরা পৌঁছি নাই, কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহ যে ভারতের ভবিষ্যৎ আমাদের ইচ্ছামত গড়িয়া তুলিবার কাজে এখন আমাদের বাধা দিবার কেহ নাই। এই উপ-মহাদেশের আবালবৃদ্ধ বনিতা নির্বিশেষে আমরা সকলে আজ যে স্বাধীনভাবে সংগ্রামের ফলভাগী হইতে পারিতেছি ইহা আমাদের গৌরবের বস্তু।

স্বাধীনতালাভের সঙ্গে, সঙ্গে যে সকল গুরু দায়িত্বভার আমাদের উপর বর্তিয়াছে আনন্দোৎসবের কোলাহাল আমরা যেন সে সব ভুলিয়া না যাই। ভিতর ও বাহিরে শত্রুর হাত হইতে আমাদের স্বাধীনতাকে অতি সতর্কতার সহিত রক্ষা করাই হইবে আমাদের প্রথম কর্তব্য।

(দেশের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল ব্যক্তিই সমান অধিকার লাভ করে, উৎপাদনের ন্যায্য অংশের অংশীদার যেন শ্রমিকেরা হইতে পারে, সে ব্যবস্থা আমাদের করিতে হইবে। গ্রামের লক্ষ লক্ষ কৃষক যাহাতে তাহাদের কঠিন পরিশ্রমের উপযুক্ত মূল্য পায় তাহা আমাদের করিতে হইবে। দেশের প্রতিটি সন্তানের খাদ্য, বস্ত্র, বসবাস ও শিক্ষালাভের ব্যবস্থাও রাষ্ট্রকে অবশ্যই করিতে হইবে। দেশকে আমাদের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষানুযায়ী গড়িয়া তুলিবার সুযোগ এক্ষণে অদৃষ্টক্রমে আমরা পাইয়াছি। মাতৃভূমির প্রতি কর্তব্যে যদি আমাদের ত্রুটি ঘটে, সেজন্য অন্য কেহ দায়ী হইবে না। আমাদের যাত্রাপথে অতি দুরূহ এবং প্রায় দুর্লঙ্ঘ্য বাধা রহিয়াছে; কিন্তু তাহা আমাদের অতিক্রম করিতেই হইবে।)

এই বিরাট ও কঠিন কর্তব্যসাধনে আমি দেশবাসীর কাছে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রার্থনা করিতেছি। এই কর্তব্য অতি পবিত্র স্বার্থের কাড়াকাড়ি অন্তর্বিরোধ ও সঙ্কীর্ণ সন্দেহ দ্বারা তাহাকে যেন কলঙ্কিত করা না হয়; এই দায়িত্ব অতি গুরুভার—বাধা দেওয়ার মনোবৃত্তি লইয়া বা গুপ্ত পন্থায় তাহাকে যেন ব্যাহত করা না হয়। এই পূণ্যভূমিতে বহু ক্ষতস্থানের জ্বালা আজিও জুড়ায় নাই, বহু বিক্ষুব্ধ আত্মা আজিও সান্ত্বনালাভ করে নাই। জাতীয়তা ও মানবতার দিকে চাহিয়া কাহারো পক্ষেই দেশকে তাঁহাদের শুভ কামনা ও সহযোগিতা হইতে বঞ্চিত করা সম্ভব নহে। আমাদের প্রত্যেকের শ্রেষ্ঠ শক্তি ও সম্পদ লইয়া এই মিলিত দায়িত্বকে গ্রহণ করিতে হইবে।

যাঁহারা এতকাল আমাদের অঙ্গীভূত ছিলেন তাঁহারা আজ পৃথক হইয়া যাইতেছেন, সুতরাং তাঁহাদের জন্য আজ বেদনা বোধ করা স্বাভাবিক। যাঁহারা এতকালে মনে প্রাণে ঐক্যের ধ্যান করিয়াছেন, ভারত-বিভাগের ফলে আজ তাঁহাদিগকে ভাগাভাগির হিসাব করিতে হইতেছে তখন কতটা তিক্ততা ও বেদনায় যে তাঁহাদের অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, তাহা অনেকেই ধারণা করিতে পারিবেন না। কিন্তু আমাদের (ভৌগোলিক) সীমান্তের ওপারে আমাদের যেসব ভাই আছেন তাঁহাদের আমরা অবহেলা করিতেছি বা ভুলিয়া গিয়াছি একথা যেন, তাঁহারা মনে না করেন। তাঁহাদের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি আমাদের দৃষ্টি সর্বদা সজাগ থাকিবে—এই দাবী তাঁহাদের রহিল। বিলম্বে নয় অবিলম্বেই দেশমাতৃকার অনুগত সেবক রূপে আমরা আবার মিলিত হইব, এই আশা ও বিশ্বাস লইয়াই তাঁহাদের ভবিষ্যৎ কল্যাণের প্রতি আমরা সর্বদা যত্নশীল থাকিব।

মৌলানা আজাদের বাণী

"জাতীয় সংগ্রামের প্রথম অধ্যায়ের সার্থক পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। আমরা স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছি। সমগ্র জাতির পূর্ণ সহযোগিতা এবং দৃঢ়তা ব্যতিরেকে ইহা সম্ভবপর হইত না। জাতির পুনর্গঠনের দ্বিতীয় এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে ঐ সকল গুণের আরও অধিক প্রয়োজন হইবে। যাহাতে ইহাকে আমাদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী রূপদান করিতে পারে, এই নবলব্ধ স্বাধীনতাকে সেইভাবে কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। এই প্রয়োজনীয় মুহূর্ত্তে ভারতবাসী সমুদয় নরনারীকে দেশের ডাকে সাড়া দিতে হইবে, অবস্থা নির্ব্বিশেষে নিষ্ঠার সহিত কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে।"

শ্রীযুক্তা নাইডুর বাণী

ভারতবর্ষ আর একবার বিশ্ব-সভ্যতার পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইবে, আর একবার বিশ্ববাসীকে শান্তির ললিত বাণী শুনাইবে—হিংসা, দ্বেষ, হানাহানির ঘনান্ধকারে তাহার প্রীতির প্রদীপ্ত প্রদীপখানি বিশ্বের সম্মুখে তুলিয়া ধরিবে। বিশ্বের সকল জাতির উদ্দেশ্যে তাহার প্রেম ও প্রীতির হাতখানি প্রসারিত করিয়া দিবে। অতঃপর তিনি বলেন, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম মহাকাব্যের মতই বিরাট ও বিস্ময়কর। এই সংগ্রামে যুবকবৃন্দ, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, পীড়িত-পতিত ও গৃহী ও সন্ন্যাসী এক সঙ্গে আসিয়া যোগ দিয়াছে। ভারতের এই বিপ্লব বিনা রক্তপাতের বিপ্লব, জগতের ইতিহাসে ইহার তুলনা নাই। এই কৃতিত্বের মূলে রহিয়াছে যে ক্ষুদ্রকায় অর্দ্ধনগ্ন মহামানবের জীবনব্যাপী সাধনা তিনি

আজও স্বাধীনতার এই পরমলগ্নে বঞ্চিতের অশ্রুমোচনে ভারতের এক কোণে সাধনায় আত্মসমাহিত।

রাষ্ট্রপতির বাণী

রাষ্ট্রপতি কৃপালনী তাঁহার বেতার বক্তৃতায় নবলব্ধ স্বাধীনতায় সন্তুষ্ট না থাকিয়া অতঃপর দ্বিখণ্ডিত ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করিবার জন্য দেশবাসীর প্রতি সর্ব্বশক্তি নিয়োগের দাবী জানান। অতঃপর তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের শহীদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়া বলেন যে অপরে যাহাতে স্বাধীনতা, শান্তি ও সম্মানের সহিত বসবাস করিতে পারে তজ্জন্যই এই সব সহীদ অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। আজ জাতীয় শক্তির এই পরমলগ্নে সেইসব জানা ও অজানা শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের প্রীতি ও শ্রদ্ধার অঞ্জলি প্রদান করিতেছি।

ভারতীয় ডোমিনিয়ন পার্লামেণ্টের অধিবেশন

নয়াদিল্লী, ১৫ই আগষ্ট

ব্রিটিশের নিকট হইতে ভারতীয়দের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর কার্য্যের শেষ পর্ব্ব সম্পূর্ণ করিবার জন্য অদ্য সকালে ভারতীয় ডোমিনিয়ন পার্লামেণ্টের এক নূতন অধিবেশন হয়।

নূতন ডোমিনিয়নের গভর্ণর জেনারেল লর্ড মাউণ্টব্যাটেন যখন বক্তৃতা করিতে উঠেন, তখন পুনরায় গতকল্য দ্বিপ্রহর রাত্রির ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানের সময়কার দৃশ্যের অবতারণা হয়। লর্ড মাউণ্টব্যাটেন নানা উজ্জ্বল পদকশোভিত নৌ-সেনাপতির পোষাক পরিহিত ছিলেন। তিনি বলেন--"আজ হইতে আমি আপনাদের নিয়মতান্ত্রিক গভর্ণর-জেনারেল। আমি আপনাদিগকে আপনাদেরই একজনরূপে আমাকে গণ্য করিতে অনুরোধ করিতেছি। (উচ্চ হর্ষধ্বনি) আমি ভারতবর্ষের স্বার্থ আরও পূর্ণভাবে রক্ষার জন্য সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিব।"

লর্ড মাউণ্টব্যাটেন যখন অধিক সংখ্যায় বন্দীদিগকে মুক্তিদানের বিষয় ঘোষণা করেন এবং মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ও সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন, তখন পরিষদে বিপুল হর্ষধ্বনি উত্থিত হয়। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, পণ্ডিত নেহরুর বিচক্ষণ পরিচালনায় এবং তাঁহার মনোনীত সদস্যগণের সাহায্যে ও জনসাধারণের সহযোগিতায় ভারতবর্ষ শক্তিশালী

ও প্রভাবশালী জাতিতে পরিণত হইয়া জগৎসভায় নিজের ন্যায্য স্থান অধিকার করিতে পারিবে।

দেশীয়রাজ্যগুলি সম্পর্কে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন বলেন যে, বস্তুতঃ সংশ্লিষ্ট সমস্ত দেশীয়রাজ্যই ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদানের ও স্থিতাবস্থার চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছে। এভাবে ৩০ কোটির অধিক লোক ও ভারতের অধিকাংশ স্থান লইয়া একটি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দেশীয় রাজ্যের মধ্যে একমাত্র হায়দ্রাবাদ এখনও ডোমিনিয়নের সহিত যোগ দেয় নাই। নিজাম পাকিস্তান ডোমিনিয়নের সহিত যোগ দিতে ইচ্ছুক নহেন, কিন্তু ভারতীয় ডোমিনিয়নে যোগ দিতে পারিবেন কি-না তাহাও এখন পর্য্যন্ত স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তবে যে ডোমিনিয়ন তাঁহার রাজ্য পরিবেষ্টন করিয়া আছে, সেই ডোমিনিয়নের সহিত তিনি তিনটি প্রধান বিষয়—বৈদেশিক ব্যাপার, দেশরক্ষা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্বন্ধে সহযোগিতা করিবেন বলিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিয়াছেন।

গভর্ণর জেনারেলের বক্তৃতার উত্তরদানকালে **সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ** বলেন যে, "ভারতের বৃটিশ প্রভুত্বের আজ অবসান ঘটিল। এখন হইতে পারস্পরিক লাভ, শুভেচ্ছা এবং সাম্যেব ভিত্তিতে উভয় দেশের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইবে। ভারতের ঐক্য সম্বন্ধে নিজের অবস্থার কথা ঘোষণা করিয়া ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ জনসাধারণের অবস্থার উন্নতিকল্পে গঠনমূলক কর্ম্মপন্থায় আত্মনিয়োগ করিতে এবং সরকারী কর্ম্মচারীদের শাসকের ভূমিকা ত্যাগ করিয়া জনসেবায় আত্মনিয়োগ করিতে বলেন। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ দেশীয় রাজ্যের শাসকগণকে ইংলণ্ডের রাজার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে এবং নিয়মতান্ত্রিক শাসকের ন্যায় কাজ করিতে অনুরোধ করেন।"

অতঃপর লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ও লেডী মাউণ্টব্যাটেনকে সভাপতি মঞ্চে লইয়া যান। সভাপতি বিদেশ হইতে প্রেরিত বাণীসমূহ পাঠ করেন এবং বড়লাট ইংলণ্ডেশ্বরের বাণী পাঠ করেন।

লর্ড মাউণ্টব্যাটেন এবং সভাপতির বক্তৃতার পর গণ-পরিষদ ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়; ঐ সময় ৩১বার তোপধ্বনি করা হয়। দপ্তরখানার উত্তর দক্ষিণ অংশ হইতে ইউনিয়ন জ্যাক নামাইয়া ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করা হয়। গভর্ণর জেনারেল ও লেডী মাউণ্টব্যাটেন, দেশীয় নৃপতিবর্গ ও উচ্চপদস্থ সামরিক ও অসামরিক কর্ম্মচারী এবং বৈদেশিক দূতগণ উপস্থিত ছিলেন।

দিল্লীর সহস্র সহস্র লোক পরিষদ ভবনের চতুর্দ্দিকে সমবেত হইয়াছিল। জনতা পণ্ডিত নেহরুকে দেখিতে চাহে, এইজন্য পণ্ডিত জহরলাল নেহরু পরিষদ-ভবনের বারান্দায় দাঁড়াইয়া জনতাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

লর্ড মাউণ্টব্যাটেন তাহার বক্তৃতায় বলেন :—

উল্লেখযোগ্য দেশীয় রাজ্যের মধ্যে একমাত্র হায়দ্রাবাদই এখনও পর্যন্ত যোগ দেয় নাই।

আয়তন সংখ্যা এবং মর্য্যাদার দিক হইতে হায়দ্রাবাদের বৈশিষ্ট্য আছে। ইহার নিজস্ব সমস্যাও আছে। নিজাম পাকিস্তান ডোমিনিয়নে যোগ দিতে চান না, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত ভারতীয় ডোমিনিয়নে যোগ দিতেও পারেন নাই। কিন্তু পররাষ্ট্র, দেশরক্ষা এবং যোগাযোগ রক্ষা ব্যাপারে তিনি আমাকে তাহার সহযোগিতা জানাইয়াছেন।

উৎসব দিবস অপেক্ষা আজিকার এই দিনটি আমাদের কল্পনার ভারতকে গড়িয়া তোলার জন্য প্রত্যেকের পক্ষে উৎসবের দিন। অতীত হইতে দৃষ্টি সরাইয়া আনিয়া এখন আমাদিগকে ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হইবে। অন্যান্য জাতি ও দেশের সহিত আমাদের কোন বিরোধ নাই। ভারতের ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করিলেই বুঝা যায় যে, আমরা শান্তিপ্রিয় জাতি এবং ভারত সমগ্র বিশ্বের সহিত শান্তিতেই থাকিতে চাহে। ভারতের সীমার বাহিরে ভারতীয় সাম্রাজ্যের রূপ অন্যান্য সাম্রাজ্যের রূপ হইতে পৃথক। ভারতের বিজয়াভিযান আত্মিক অভিযান, উহা কাহারও পায়ে দাসত্বের শৃঙ্খল—তা সোনারই হউক আর লোহারই হউক—পরাইয়া দেয় না। ভারত অন্য দেশকে, অন্য জাতিকে, যে বন্ধনে বাঁধিয়াছে, তাহা ভঙ্গুর নহে। সে বন্ধন সংস্কৃতি ও সভ্যতার বন্ধন, ধর্ম্ম ও মনের বন্ধন। আমরা এই ঐতিহ্যের ধারাই অনুসরণ করিব, রণবিধ্বস্ত পৃথিবীতে শান্তি ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে যেটুকু সম্ভব হয় তাহা করাই হইবে আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। যে পতাকাতলে সমবেত হইয়া আমরা বিজয়গৌরব লাভ করিয়াছি, সেই পতাকা ঊর্দ্ধে উত্তোলিত রাখিয়া আমরা বিশ্ববাসীকে অহিংসার অমোঘ অস্ত্র দান করিব। ভারতের বহু কাজ করার রহিয়াছে। তাহার জীবন ও সংস্কৃতিতে এমন কিছু রহিয়াছে, যাহাতে তাহার পক্ষে বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও টিকিয়া থাকা সম্ভবপর হইয়াছে।

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু তাহার বক্তৃতায় বলেন :—

আমাদিগকে আজ এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে হইবে যে, এদেশে আমরা এরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করিব, যেখানে প্রত্যেকে স্বাধীন হইবে, চরম আত্মবিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ পাইবে; যেখানে দারিদ্র্য, অজ্ঞানতা ও স্বাস্থ্যহীনতা থাকিবে না; উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধনে ভেদাভেদ বিলুপ্ত হইবে; যেখানে ধর্ম্মকে শুধু স্বীকার

করা হইবে না; অবাধ প্রচার ও ধর্ম্মাচরণের স্বাধীনতা থাকিবে; ধর্ম্ম যেখানে মানুষে মানুষে বিরোধ সৃষ্টি করিবে না, মিলন ঘটাইবে; যেখানে অস্পৃশ্যতা অপ্রীতিকর নিশাস্বপ্নের মত বিস্মৃতি হইবে; মানুষ দ্বারা মানুষের শোষণ যেখানে আর থাকিবে না; অনগ্রসরদের জন্য যেখানে সর্ব্ববিধ সুযোগ-সুবিধা থাকিবে; যেখানে লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর শুধু পর্য্যাপ্ত আহারই জুটিবে না, এই দেশে পুনরায় দুধের নদী বহিবে।)

যে সকল দেশীয় রাজ্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিয়াছে, আমরা তাহাদিগকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছি এবং দেশীয় রাজ্যের প্রজাবৃন্দের প্রতি আমাদের সৌহার্দ্দ জ্ঞাপন করিতেছি। দেশীয় রাজ্যের রাজন্যবর্গকে অমরা এইটুকু জানাইয়া রাখিতে চাহি যে তাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের কু-অভিসন্ধি নাই। আমরা ভরসা করি যে, তাঁহারা ইংলণ্ডেশ্বরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া নিজেরা নিয়মতান্ত্রিক শাসক হইবেন। বৃটিশ রাজতন্ত্র দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধের আঘাত সহ্য করিয়াছে, কিন্তু ইউরোপের অন্যান্য রাজতন্ত্র ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কাজেই বৃটিশ রাজতন্ত্রকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিলে তাহাদের পক্ষে শুভ হইবে।

বৃটিশ উপনিবেশগুলিতে এবং অন্যান্য স্থানে যে সকল ভারতীয় রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমরা শুভেচ্ছা জানাইতেছি। তাঁহাদের স্বার্থ সংরক্ষণে আমরা সর্ব্বদাই সজাগ থাকিব। ভারতেব সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিকে আমরা এই আশ্বাস দিতেছি যে, তাহাদের প্রতি নিরপেক্ষ ও ন্যায়সঙ্গত আচরণ করা হইবে এবং তাহাদের অধিকার সংরক্ষিত ও অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

আমাদের বৃহত্তর কর্ত্তব্যগুলির একটি হইতেছে, শাসনতন্ত্র রচনার কাজ শেষ করা। নিজেদের রচিত শাসনতন্ত্রের অধীনে যাহাতে আমরা কাজ আরম্ভ করিতে পারি, তজ্জন্য যত সত্বর উহা শেষ করিতে হইবে। আমাদের উদ্দেশ্য হইতেছে, এইরূপ একটি শাসনতন্ত্র রচনা করা, যাহাতে জনগণ তাহাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারিবে। ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং সাধারণের কল্যাণে উহা নিয়োজিত হইবে।

এযাবৎ আমরা স্বাধীনতা অর্জ্জনের ও এইজন্য সর্ব্বপ্রকার আত্মত্যাগ করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছি। বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগকে অন্য প্রকার সঙ্কল্প গ্রহণ কবিতে হইবে। কেহ যেন মনে না করেন যে, কাজ ও আত্মবিসর্জনের পালা শেষ হইয়াছে এবং স্বাধীনতার ফলভোগ করিবার সময় আসিয়াছে। আমাদের ইহা উপলব্ধি করা উচিত যে, ভবিষ্যতে নিঃস্বার্থভাবে কাজ কবিবার প্রয়োজনীয়তা পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী না হইলেও কম হইবে না। সেইজন্য আমাদিগকে আর একবার সেই মহৎ কর্ত্তব্যে, যাহা আমাদিগকে আহ্বান করিতেছে—আত্মনিয়োগ করিতে

হইবে। আমাদের কর্ত্তব্য বিরাট এবং সময়ও অনুকূল। আমরা যাহাতে উহা যথাযথভাবে সম্পাদন করিতে পারি, তজ্জন্য আসুন, আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি।

এই সব কিছু সম্পাদক করিতে হইলে আমাদিগকে সাধ্যানুযায়ী সমস্ত আদর্শবাদী ও ত্যাগী, বুদ্ধিজীবী, পরিশ্রমী এবং দৃঢ়চেতনা ও সংগঠন ক্ষমতাশালী লোকদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে হইবে। আমাদের মধ্যে বিভিন্ন আদর্শ ও মতবাদবিশিষ্ট দল ও উপদল আছে। তাহারা সকলেই নিজেদের মতবাদ অনুযায়ী দেশকে রূপান্তরিত করিতে এবং শাসনতন্ত্রের পরিবর্ত্তন সাধন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। ইহা বিরোধ-বিতর্কের সময় নহে, আমাদিগকে কঠিন কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হইবে এবং আশা করি, সকলেই যথাযাধ্য কাজ করিবার জন্য প্রস্তুত হইবেন। আমরা চাই কৃষকদিগকে দিয়া অধিক শস্য ফলাইতে, মজুরদিগকে দিয়া অধিক মাল উৎপন্ন করাইতে এবং শিল্পপতিদিগকে তাহাদের বুদ্ধি ও সম্পদ সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য নিয়োজিত করাইতে। সকলকে ভালভাবে বাঁচিয়া থাকার মত অবস্থার এবং আত্মোন্নতি ও আত্মোপলব্ধির সুযোগ আমরা অবশ্যই দিব।

গভর্ণর জেনারেল ও মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ

দেশীয় রাজন্যবৃন্দ, বিদেশী রাষ্ট্রদূত এবং সামরিক ও অসামরিক কর্ম্মচারিদের উপস্থিতিতে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন, পণ্ডিত জহরলাল নেহরু এবং তাঁহার মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করেন।

আটটা বাজিয়া ২০ মিনিট হইতেই দরবার হল ভারতীয় পতাকা, গভর্ণর জেনারেলের পতাকা, ষ্টার অব ইণ্ডিয়া পতাকা এবং মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পতাকা দ্বারা শোভিত করা হয়। শ্রীযুক্ত জগজীবনরাম ব্যতীত মন্ত্রিসভার অন্যান্য সকল সদস্যই আসিয়া সিংহাসনের দুই পাশে আসন গ্রহণ করেন। ঠিক সাড়ে আটটার সময় লর্ড মাউণ্টব্যাটেন দরবারগৃহে প্রবেশ করেন।

স্বরাষ্ট্র বিভাগীয় সেক্রেটারী মিঃ আর এন ব্যানার্জী লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের উদ্দেশে প্রদত্ত রাজকীয় অভিনন্দন বাণী পাঠ করেন। বড়লাট ও বড়লাট পত্নী এই সময়ে দাঁড়াইয়া ছিলেন।

ইহার পর প্রধান বিচারপতি মিঃ কানিয়া লর্ড মাউণ্টব্যাটেনকে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করান।

মন্ত্রিসভার সদস্যদের শপথ গ্রহণ

গভর্ণর জেনারেলের শপথ গ্রহণ করিবার পরে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন নূতন গভর্ণমেণ্টের সদস্যগণকে মন্ত্রগুপ্তির শপথ গ্রহণ করান। যথাক্রমে পণ্ডিত নেহরু সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল, ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, ডাঃ জন মাথাই, সর্দ্দার বলদেব সিংহ, মিঃ সি এইচ ভাবা, মিঃ রফি আমেদ কিদোয়াই, রাজকুমারী অমৃতকাউর, ডাঃ সি আর আম্বেদকর, মিঃ আর কে সম্মুখম চেট্টি, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী এবং মিঃ এন ভি গ্যাডগিল শপথ গ্রহণ করেন। মিঃ জগজীবনরাম পরে শপথ গ্রহণ করিবেন। প্রত্যেক সদস্যের শপথ গ্রহণের পরে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন তাঁহাদের সহিত করমর্দ্দন করেন। ইহার পর লর্ড ও লেডী মাউণ্টব্যাটেন তাঁহাদের আসন গ্রহণ করেন। অন্যান্য সকলেও এতক্ষণ দণ্ডায়মান ছিলেন। তাঁহারাও এই সময়ে আসন গ্রহণ করেন।

বেলা নয়টার সময়ে শোভাযাত্রা সহকারে বড়লাট ও বড়লাট পত্নী দরবারগৃহ ত্যাগ করেন।

গবর্ণর জেনারেল কর্ত্তৃক দিল্লীবাসীরা আপ্যায়িত

গবর্ণর জেনারেল লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ও লেডী মাউণ্টব্যাটেন অদ্য সন্ধ্যায় লাটভবনে নূতন ডোমিনিয়নের সদস্যবৃন্দ গণপরিষদের সদস্যবৃন্দ, কূটনৈতিক, সামরিক ও বেসামরিক বিভাগের কর্ম্মচারিবৃন্দ, দিল্লীর বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দও সাংবাদিকগণকে আপ্যায়িত করেন। দুই হাজার ব্যক্তি যোগদান করেন।

দিল্লীতে পাঁচ শতাধিক প্রতিষ্ঠানের যোগদান

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে দিল্লীর তিন শতাধিক উৎসবে পাঁচ শতাধিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যোগদান করে। প্রত্যেক জায়গায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন প্রভাত ফেরী এবং শোভাযাত্রা হয়। শ্রমিক, ছাত্র, সরকারী কর্ম্মচারীবৃন্দ সকলেই স্বাধীনতা উৎসবে যোগদান করেন। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত শঙ্কররাও দেও কাশ্মীর গেটে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। ডাঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ, দেওয়ান চমনলাল, শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনী এবং ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ বিভিন্ন স্থানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।

কলিকাতার অনুষ্ঠান

গান

"বন্দেমাতরম্" "বন্দেমাতরম" "বন্দেমাতরম্"
চক্রশোভিত ওড়ে নিশান নব ভারতে বাজে বিষাণ,
কে আছ কোথায় ছুটে এসো সবে জ্ঞানী ও কর্ম্মী, ধনী ও কৃষাণ।
পনের আগষ্ট পূণ্যদিন প্রাচীন ভারতে জাগে নবীন,
গাও তিন রঙ্গা পতাকার তলে নব ভারতের ঐক্যতান্।
"বন্দেমাতরম্" "বন্দেমাতরম্" "বন্দেমাতরম্"
নূতন যাত্রা সুরু এবার, মিলেছে সুযোগ জনসেবায়
মৃত্যু-সাধনা সফল হয়েছে, গাই সবে মিলে জীবন গান।
"বন্দেমাতরম্" "বন্দেমাতরম্" "বন্দেমাতরম্"

পূর্ব্বাভাষ

মহাত্মা গান্ধী এই সময় কলিকাতায় অবস্থান করিতেছিলেন। ১৪ই আগষ্ট বৈকালে কলিকাতাস্থিত মোস্‌লেম লীগ পশ্চিম বঙ্গে হিন্দুস্থানের জাতীয় পতাকা উত্তোলিত করিবেন, হিন্দুদের সহিত বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হইবেন, স্থির করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা "জয়হিন্দ" "বন্দেমাতরম" ধ্বনি সহকারে ভারতীয় ইউনিয়নের জাতীয় পতাকায় সুসজ্জিত লরী লইয়া বাহির হইলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে কলিকাতা এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। তখন হিন্দু-মুসলমানে কোলাকুলি আরম্ভ হইল। সকলেই "জয়হিন্দ" ও "বন্দেমাতরম্" ধ্বনির সহিত সকলে সকলকে অভিবাদন করিতে লাগিলেন।

বাংলার গভর্ণর কর্ত্তৃক ক্ষমতা হস্তান্তর

১৪ই আগষ্ট, বৃহস্পতিবার রাত্রি একটায় (বেঙ্গল টাইম) ১৫ই আগষ্ট পড়িবা মাত্র কলিকাতায় গবর্ণমেণ্ট হাউসে ক্ষমতা হস্তান্তর পর্ব্ব সুরু হয়। ঐ সময়ে কলিকাতার সমস্ত গৃহে "জয় হিন্দ," "বন্দেমাতরম" ও শঙ্খধ্বনির মধ্যে জাতীয় পতাকা উড্ডীন হয়। গবর্ণমেণ্ট হাউস ও প্রত্যেক সরকারী ভবনে অনুরূপ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। গবর্ণর ফ্রেডারিক ব্যারোজ বিদায় লইবার সঙ্গে

পশ্চিম বঙ্গের নব নিযুক্ত গবর্ণর চক্রবর্ত্তী রাজাগোপাল আচারিয়া আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিলেন। তিনি আসন গ্রহণ করিলে তাঁহার অনুমতি অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীসভার প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে সকল মন্ত্রী একে একে শপথ গ্রহণ করেন।

গবর্ণরের শপথ

নূতন গভর্ণর নিম্নলিখিত শপথ গ্রহণ করেন:—"আমি ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি যতদিন পশ্চিমবঙ্গের গবর্ণর থাকিব, ততদিন আমি রাজা ৬ষ্ঠ জর্জ ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের প্রতি এবং আইনানুসারে বিধিবদ্ধ ভারতীয় শাসনতন্ত্রের বিশ্বস্ত ও অনুগত থাকিব এবং ভয়, অনুগ্রহ, প্রীতি বা বিরাগ দ্বারা প্রভাবান্বিত না হইয়া ভারতের আইন ও প্রথা অনুসারে সমস্ত শ্রেণীর অধিবাসীদের প্রতি সুবিচার করিব।"

মন্ত্রীগণের আনুগত্যের শপথ নিম্নে প্রদত্ত হইল হইল:—"আমি ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে আমি আইনানুসারে বিধিবদ্ধ ভারতীয় শাসনতন্ত্রের প্রতি সর্ব্বাংশে বিশ্বস্ত ও অনুগত থাকিব এবং ভয়, অনুগ্রহ, প্রীতি বা বিরাগ দ্বারা প্রভাবান্বিত না হইয়া ভারতের আইন ও প্রথা অনুসারে সমস্ত শ্রেণীর অধিবাসীদের প্রতি সুবিচার করিব।"

মন্ত্রগুপ্তির শপথ

মন্ত্রীগণের মন্ত্রগুপ্তির শপথ নিম্নরূপ:—আমি এমত প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, পশ্চিম বঙ্গের মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে যে সকল বিষয় আমার সম্মুখে উত্থাপন করা হইবে কিংবা আমার গোচরে আনা হইবে মন্ত্রী হিসাবে আমার কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন না হইলে আমি ঐ সকল বিষয় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন ব্যক্তির বা ব্যক্তিদের গোচরে আনিব না বা প্রকাশ করিব না।

[দ্রষ্টব্য:—ভারতীয় ইউনিয়নের প্রত্যেক প্রদেশে কলিকাতার মতই অনুষ্ঠান হইয়াছিল, এজন্য উহা পৃথক পৃথক মুদ্রিত করিবার কোন সার্থকতা নাই। ভারতের বাহিরে ভারতীয় ইউনিয়নের পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানগুলিই নিম্নে মুদ্রিত করিলাম।]

পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ১৫ই আগষ্ট উৎসব

লণ্ডন, ১৫ই আগষ্ট

অদ্য লণ্ডনের কেন্দ্রস্থলে ভারতীয় ডোমিনিয়ন এবং পাকিস্থান ডোমিনিয়নের পতাকা উত্তোলিত হয়। সহস্র সহস্র লোক এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিল।

জনতার ভীড়ের জন্য যানবাহনের গতিপথ পরিবর্তিত করিতে হইয়াছিল। সরকারী উৎসব অনুষ্ঠান ব্যতীত এইরূপ জনসমাবেশ কচিৎ দৃষ্ট হয়।

ভারতবর্ষ এবং পাকিস্থানের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। উভয় ডোমিনিয়নের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যাহাতে উভয় সম্মেলনে যোগ দিতে পারেন, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উভয় অনুষ্ঠানের সময় নির্ধারিত হইয়াছিল। ইণ্ডিয়া হাউসে লাইব্রেরী কক্ষে মহাত্মা গান্ধীর একটি পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি রাখা হইয়াছিল। ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় বক্তৃতা ও শুভেচ্ছাজ্ঞাপক বাণী শুনিবার জন্য উভয় ডোমিনিয়নের নবনিযুক্ত হাইকমিশনারগণ প্রথম সারিতে আসন গ্রহণ করেন। সভাকক্ষের মধ্যে ভারতীয় সম্প্রদায়, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এবং ভারতের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন বহু ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। বাহিরে অপেক্ষমান জনতা যাহাতে বক্তৃতা শুনিতে পারে, তজ্জন্য লাউডস্পীকারের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

ইণ্ডিয়া হাউসের অনুষ্ঠান শেষ হইবার পর ভারতীয় ডোমিনিয়নের শ্রীযুত কৃষ্ণ মেনন এবং পাকিস্থান ডোমিনিয়নের মিঃ হবিব ইব্রাহিম রহিমতুল্লা পাকিস্থানের পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে যোগদান করিবার জন্য ল্যাঙ্কাষ্টার হাউসে গমন করেন। এই সরকারী ভবনটিকে এই অনুষ্ঠানের জন্য চাহিয়া লওয়া হইয়াছিল।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি হিসাবে মিঃ এ ভি আলেকজাণ্ডার মিঃ হার্বার্ট মরিসন ও স্যার এরিক ম্যাকটিনোর সহিত এই দুই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। ব্রেজিলের রাষ্ট্রদূত, চীনের রাষ্ট্রদূত, নেপালের রাজদূত, দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিনিধি হিসাবে ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্টের হাই কমিশনার এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রেড কমিশনার উভয় অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

মস্কো, ১৫ই আগষ্ট

অদ্য মস্কোয় ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত স্বেবডনভস্ক স্কোয়ারে মেট্রোপোল হোটেলে তাঁহার নিজের ফ্ল্যাটের অলিন্দে ভারতীয় ডোমিনিয়নের নূতন পতাকা উড্ডীন করেন। ইহার পর তিনি ভারতীয় দূতাবাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট নূতন বাসভবনেও পতাকা উত্তোলন করেন। দূতাবাসের সদস্যগণ জাতীয় সঙ্গীত গান করেন; এই উপলক্ষে পণ্ডিত নেহরুর নিকট হইতে প্রাপ্ত এক বাণী পাঠ করা হয়। শ্রীযুক্তা পণ্ডিত পতাকা উত্তোলনকালে বলেন,—"এই দিনটি বিশেষ স্মরণীয়; ইহা যে ভারতের পক্ষেই ভাগ্য নিয়ামক তাহা নহে, উহা বিশ্বের পক্ষেও সমভাবে সত্য। মানবজাতির প্রতি শান্তভাবে আত্মনিবেদন

করাও এই দিবসের উদ্দেশ্য; ভারতবর্ষ সর্ব্বদা উহারই সাধনা করিয়াছে। স্বাধীনতালব্ধ নূতন সুযোগ পাইয়া আমরা যেমন আনন্দিত, তেমনি ভুলিলে চলিবে না যে, রাজনীতিতে স্বাধীনতালাভের সহিত অন্যবিধ স্বাধীনতা না পাওয়া গেলে উহা নিরর্থক হইবে। সুতরাং সর্ব্বপ্রকার অসুবিধা দূর করার দিকেই আমাদের প্রচেষ্টা নিবদ্ধ হইবে; আমাদের নূতন শাসনতন্ত্রে যে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে, তাহা রূপায়িত করিতে হইবে। অতঃপর তিনি বলেন, "ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের বহু সহযোগী মৃত্যুবরণ করিয়াছেন; তাঁহাদের স্মরণ করিয়া আমাদের চিত্ত ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছে। যাহাদের আত্মোৎসর্গের ফলে আমাদের স্বাধীনতা লাভ সম্ভব হইয়াছে, সেইসব অজ্ঞাতনামা লক্ষ লক্ষ ব্যক্তিকে স্মরণ করিতে হইবে।"

শ্রীযুক্তা পণ্ডিতের বক্তৃতার পর ভারতীয় স্বাধীনতার শহীদদের স্মরণে দুই মিনিটকাল মৌনাবলম্বন করা হয়। সকালের দিকে অস্থায়ী বৃটিশ রাষ্ট্রদূত মিঃ ফ্রাঙ্ক রবার্টস ভারতীয় স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপনকল্পে শ্রীযুক্তা পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ করেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত মিঃ বেডিন স্মিথ, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও কানাডা এবং রুশ পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন প্রতিনিধিও তাঁহার সঙ্গে দেখা করেন।

ওয়াশিংটন, ১৫ই আগষ্ট

ভারতীয় দূতাবাসে রাষ্ট্রদূত মিঃ আসফ আলী অদ্য ভারতীয় ডোমিনিয়নের নূতন পতাকা উত্তোলন করেন। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের দূত, সহরের বিশিষ্ট নাগরিক ও ব্যবসায়ী এবং বহু ভারতীয় উপস্থিত ছিলেন। রাস্তায় জনতার এত ভীড় হয় যে, দূতাবাসগামী রাস্তাটি দিয়া যানবাহন চলাচল অসম্ভব হয়।

কলম্বো, ১৫ই আগষ্ট

ভারতীয় স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় সিংহলে ভারতীয় ডোমিনিয়নের প্রতিনিধি মিঃ ভি ভি গিরি বলেন যে, ভারত বিভাগ একটি অস্থায়ী ব্যবস্থা; শীঘ্রই দেশের বিভক্ত অংশ দুইটি নিজেদের মধ্যে বুঝাপড়া করিয়া সম্মিলিত হইবে।

সিঙ্গাপুর, ১৫ই আগষ্ট

বিপুল উল্লাস ধ্বনির মধ্যে ভারতীয় ও পাকিস্থান ডোমিনিয়নের পতাকা দুইটি পৃথক জায়গায় উত্তোলন করা হয়।

রেঙ্গুন, ১৫ই আগষ্ট

ভারতীয় হাইকমিশনারের অফিসে ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করা হয়। এই উপলক্ষে ব্রহ্ম গবর্ণর স্যার হুবার্ট র‍্যান্স ও ব্রহ্ম সরকারের কর্ম্মচারিবৃন্দ, ইংরাজ ব্যবসায়ী, ভারতীয় সামরিক কর্ম্মচারিবৃন্দ এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, হল্যাণ্ড, চীন ও সুইজারল্যাণ্ডের কন্সালগণ উপস্থিত ছিলেন।

টোকিও, ১৫ই আগষ্ট

ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তর দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে টোকিও এর ইম্পিরিয়াল প্লাজায় বৃটিশ কমনওয়েলথের সম্মিলিত দখলদার সৈন্যরা কুচকাওয়াজ করে। মারাঠা সৈন্যদল উহার পুরোভাগে ছিল। ভারতীয় ও পাকিস্থানের পতাকা উত্তোলনকালে জাপানে ভারতীয় যোগাযোগকারী মিশনের নেতা স্যার রাম রাও উপস্থিত ছিলেন।

নানকিং, ১৫ই আগষ্ট

অদ্য ভারতীয় দূতাবাসে জাতীয় পতাকা উত্তোলনকালে বক্তৃতা প্রসঙ্গে চীনে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত মিঃ কে পি এস মেনন বলেন :—

ভারতের ইতিহাসে এই দিনটি একটি স্মরণীয় দিন এবং আমার মনে হয়, এশিয়ার এবং পৃথিবীর ইতিহাসেও এই দিনটির তাৎপর্য সামান্য নহে। কারণ, আজ ভারতবর্ষ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে আবার প্রবেশ করিতে যাইতেছে। স্বাধীনতার এই আলো যাহাতে ভবিষ্যতে কখনও কোনও কারণে আর নির্বাপিত না হয়, এ বিষয়ে ভারতের সন্তানগণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

যে পতাকা আমি উত্তোলন করিতে যাইতেছি, উহা হাতে লইয়াই ভারতীয় কংগ্রেস স্বাধীনতার সংগ্রাম পরিচালনা করিয়াছিল। সেদিন ইহা ছিল মাত্র একটি দলের—একটি জাতির পতাকা। আর আজ ইহা একটি রাষ্ট্রের পতাকা। ইহার পরিকল্পনা পূর্ব্বের মতই আছে—দুই হাজারের অধিক বৎসর পূর্বে রাজর্ষি অশোক নির্মিত সারনাথের অশোক স্তম্ভের চক্র কেন্দ্রস্থিত চরকার স্থান গ্রহণ করিয়াছে, এই মাত্র প্রভেদ। প্রাচীন জাতির পুনরুজ্জীবনের ইহাই যথোপযুক্ত প্রতীক।

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সহানুভূতি দ্বারা যাঁহারা সাহায্য করিয়াছিলেন তাঁহাদের সকলের প্রতি আজ আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। চীনদেশের সহানুভূতি সম্বন্ধে আমাদের কখনও কোনও সন্দেহ ছিল না। পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসে আমরা দুই প্রাচীন সঙ্গী। আমরা সুদিনে অথবা দুর্দিনে পরস্পরের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইতে কৃতসংকল্প। প্রাচ্যের অন্যান্য দেশও ভারতের

স্বাধীনতা সংগ্রাম সহানুভূতির সহিত লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে। এই সংগ্রাম তাহাদের নিকট একটি ভবিষ্যৎ সূচনাকারী প্রতীক বিশেষ। রাশিয়া মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ কখনও সমর্থন করে নাই। ভারতের স্বাধীনতা লাভে অবশ্যই সে সুখী হইয়াছে ও পশ্চিম ইউরোপের—এমনকি গ্রেট বৃটেনেরও নৈতিক মনোভাব ভারতের পক্ষেই ছিল। বৃটিশ ডোমিনিয়ন সমূহও ভারতকে তাহাদের রাষ্ট্রগোষ্ঠীতে সাদরে সমঅংশীদার হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের জন্মকথা আমাদের দেশবাসীকে চিরদিনই প্রেরণা দিয়াছে। যখনই সম্ভব আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র আমাদের স্বাধীনতার সপক্ষে তাহার পরোক্ষ প্রভাব প্রয়োগ করিয়াছে। আজ আমরা ঐ সমস্ত দেশের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

ভারতীয় ইউনিয়নের শীল মোহর

পঞ্চম অধ্যায়

ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস

পূর্ব্বাভাষ

প্রত্যেক রাষ্ট্রের এক একটি পতাকা আছে। সেই সব পতাকার সম্মান রক্ষা করিবার জন্য প্রত্যেক জাতি আজীবন যুদ্ধ করিয়া আসিতেছে। মহারাজা শিবাজীর পতাকা ছিল গৈরিক। রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ আফগানিস্থানে গিয়া স্বাধীন ভারতের প্রতীক গৈরিক পতাকাই উত্তোলন করিয়াছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন আরম্ভ করিয়া যে সব সভা হইত, তাহাতে যোগদান করিবার জন্য যুবকগণ "বন্দেমাতরম" নামাঙ্কিত গৈরিক পতাকা হস্তে শোভাযাত্রা করিয়া বাহির হইতেন। তাহারপর স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বাংলার নেতৃবৃন্দের সমর্থনে একটি ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকার সৃষ্টি হয়। উক্ত পতাকায় প্রত্যেক প্রদেশের জন্য একটি করিয়া পদ্ম অঙ্কিত করা হইয়াছিল এবং উক্ত পতাকায় "বন্দেমাতরম" শব্দটি লিখিত হইয়াছিল। ১৯০৬ সালে "যুগান্তর" পত্রিকা প্রকাশিত হইলে দেখা গেল উক্ত পতাকার পরিবর্ত্তে যুগান্তরের শীর্ষদেশে তলোয়ার, ত্রিশূল, চন্দ্র, সূর্য্য দ্বারা অঙ্কিত রক্ত পতাকা রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাস ১৯০৭ সালে প্যারিস সহরে বোমা তৈয়ার করিতে গিয়া ফ্রান্সে নির্ব্বাসিতা ম্যাডাম্ কামাথকে স্বদেশী আন্দোলনের পতাকাকে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া একটি ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা উপহার দেন। হোমরুল আন্দোলনের সময় শ্রীমতী এ্যানিবেসাণ্ট্ অনুরূপ একটি পতাকা উত্তোলন করিয়া ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন আরম্ভ করেন।

চরকা-শোভিত জাতীয় পতাকা

মহাত্মা গান্ধী তাঁহার অসহযোগ আন্দোলনের সময় ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকা ব্যবহার করেন। ১৯২২ সালের ১৮ই মার্চ তারিখে, মহাত্মা গান্ধী ধৃত হইয়া কারাবরণ করিলে সেই পতাকা সকলেই প্রত্যেক মাসের ১৮ই তারিখে উত্তোলন করিয়া মহাত্মা ও পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেন। ১৯২৯ সালের ২৬শে জানুয়ারী, "স্বাধীনতা দিবস" উপলক্ষে এই পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল, এবং এই পতাকা জাতীয় পতাকা হিসাবে উড্ডীন হইয়া

আসিতেছিল। তাহারপর অনেকেই জাতীয় ভিত্তিতে রচিত ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকায় আপত্য করায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ১৯৩১' সালের ২রা এপ্রিল, সকলের গ্রহণযোগ্য একটি পতাকা নির্ণয়ের জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করেন। ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব অনুসারে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির পতাকার বর্ণগুলির সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা বাতিল করিয়া সমান্তরালভাবে অবস্থিত বর্ণ তিনটির নিম্নলিখিতরূপ ব্যাখ্যা করেন :—

পতাকাটি পূর্ব্বের মত ত্রিবর্ণ রঞ্জিত থাকিবে। গেরুয়া বা জাফরান্ (ত্যাগ ও সাহসের প্রতীক্) মধ্যস্থানের শ্বেত (শান্তি ও সত্যের প্রতীক্) এবং ঐ শ্বেত বর্ণের মধ্যে জনসাধারণের আশা ও আকাঙ্খার প্রতীকরূপ থাকিবে গাঢ় নীল বর্ণের একটি চরখা, এবং সর্ব্বনিম্নে থাকিবে সবুজ রং (বিশ্বাস ও শৌর্য্যের প্রতীক্)। এই চরখা চিহ্নিত ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা জাতীয় পতাকারূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এই পতাকাই আজাদ হিন্দ ফৌজ বহন করিয়া স্বাধীনতা যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল। আর এই পতাকাই নেতাজীর সুযোগ্য সহকারী মেজর জেনারেল সানওয়াজ আজাদ হিন্দ্ ফৌজ কর্তৃক অধিকৃত ভারতের একটি অংশে স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রীয় পতাকা হিসাবে উত্তোলন করিয়াছিলেন।

চক্র-শোভিত জাতীয় পতাকা

ইহার পর ভারতীয় ডোমিনিয়নের জন্য যে পতাকা গৃহীত হইল তাহাতে পতাকার শ্বেত অংশের মধ্যে চরখার পরিবর্ত্তে সম্রাট অশোকের ধর্ম্ম চক্র অঙ্কিত করা হইল। এই ধর্ম্ম চক্রটীও গাঢ় নীল বর্ণে অঙ্কিত হইল। অবশ্য ইহাও নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকায় চক্র বা চরখা যাহাই থাকুক তাহার একটি স্বাধীনতার পতাকা হিসাবে ব্যবহার করা চলিতে পারিবে। উক্ত চক্র চিহ্নিত ত্রিবর্ণ রঞ্জিত স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকার অন্তর্নিহিত রাষ্ট্রীয় ও আধ্যাত্মিক ভাবের ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল। এই সমুদয় ব্যাখ্যা করিয়াছেন আমাদের দেশের নেতৃবৃন্দ ও মনীষিগণ।

পণ্ডিত নেহরু কর্তৃক জাতীয় পতাকা উত্তোলন

"এই পতাকা স্বাধীনতার প্রতীক—শুধু আমাদের স্বাধীনতা নহে, ইহা পৃথিবীর সর্ব্বজনের স্বাধীনতার নিদর্শন। যেখানে ভারতবাসীরা রহিয়াছেন বা যেখানে ভারতীয় প্রতিনিধিরা নিযুক্ত রহিয়াছেন, কেবলমাত্র সেখানেই এই পতাকা লইয়া যাওয়া হইবে না, দূর-দূরান্তরে, মহাসমুদ্র অতিক্রম করিয়া

ভারতীয় নৌ-বহর যেখানেই উপস্থিত হইবে সেখানেই এই পতাকা সগৌরবে উড়িতে থাকিবে। এই পতাকা স্বাধীনতা ও মৈত্রীর বাণী বহন করিবে, পৃথিবীর সকল দেশে ইহা একথাটিই জানাইয়া দিবে যে, ভারতবর্ষ সকলেরই, বন্ধুত্ব কমনা করিতেছে এবং স্বাধীনতাবঞ্চিত সকলকেই সাহায্য করিতে ভারতবর্ষ ইচ্ছুক রহিয়াছে।

চক্রের মধ্যে চরখা ভাবাত্মকরূপে যে শুধু রহিয়া গেল মাত্র তাহাই নয়, এই একটি চিহ্নের দ্বারা ভারতের আবহমানকালের সংস্কৃতি ও ইতিহাস যেন মুক্তিলাভ করিল।

এই পতাকা আমাদের আশার প্রতীক, নৈরাশ্যের প্রতিকার, বিপদের সহায় এবং বিপর্য্যয়ের উৎসাহ। এই পতাকা আমাদের দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথী, আমাদের উত্থান ও পতনের ইতিহাস, ইহার ত্রিবর্ণ পটভূমিতে সত্যাগ্রহের বর্ণে বর্ণে লিখিত। এই পতাকা কত যোদ্ধার শেষ নিঃশ্বাসের সান্ত্বনা, কত কর্ম্মীর শেষ সান্ত্বনার সার্থকতা। ইহার এক পৃষ্ঠা আমাদের অতীত ইতিহাসে উজ্জ্বল। আর অপর পৃষ্ঠা উজ্জ্বলতর ভাবী ইতিহাসের জন্য উন্মুখ। আজ স্বাধীনতার আনন্দ অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল—বড়ই পরিতাপের বিষয়, এই পতাকামূলে সমগ্র ভারতবর্ষ আজ একত্র সমবেত হইতে পারিল না।

অধ্যাপক শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, এম. এ কর্ত্তৃক জাতীয় পতাকার সনাতনী ব্যাখ্যা

কোন সনাতনী মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পক্ষপাতী দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনারা ত' জনমতের চাপে কোন কার্য্য করিতে স্বীকৃত নহেন, তবে এই জাতীয় পতাকা তুলিতেছেন কেন?

ভদ্রলোক বলিলেন যে,—ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক, এই পতাকায় যেরূপ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা কোন সম্প্রদায়েরই বিরুদ্ধ নহে।

আমি (সনাতনী) এই পতাকা সম্বন্ধে ইহাই ধারণা করিয়াছি যে,—ভারতীয় মৃত্তিকা অপেক্ষা ভারতীয় মনোরাজ্য হইতে বৃটিশ জাতির আধিপত্য চলিয়া যাওয়াই প্রকৃত স্বাধীনতালাভ। তাহার সূচনা এই পতাকা হইতে পাওয়া যায়। 'ইংরাজ চলিয়া যাও' একথার অর্থ ইংরাজের ভাব, ভাষা, রীতি ও নীতিকে এখানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গোটাকয়েক শ্বেতাঙ্গ ভারত হইতে চলিয়া যাক, ইহা আমি মনে করি না। আমাদের প্রাচীন আদর্শ—যাহা বৌদ্ধধর্ম্মেরও বহু পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহার নিদর্শন এই পতাকাতে আছে। প্রথমতঃ বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত হইতে প্রায় বিলুপ্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, সেই বৌদ্ধ-

ধর্ম্মের নিদর্শন 'অশোক ধর্ম্মচক্র' ইহাতে স্থান পাইল। দ্বিতীয়তঃ অশোক ছিলেন প্রথমে সনাতন ধর্ম্মী, তখন চণ্ডাশোক নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ভারতে তাহার সার্ব্বভৌম রাজ্য প্রতিষ্ঠা সেই সময়েই হইয়াছিল। পরে তিনি বৌদ্ধ হইয়া 'ধর্ম্মচক্র' পরিচালনা করেন। কিন্তু বৌদ্ধ অবস্থায় তিনি বর্ণভেদ স্বীকার করেন নাই। এই ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকায় অশোকের 'ধর্ম্মচক্র' অসঙ্গত বলিয়াই মনে হয়।

(১) বস্তুতঃ আজ চক্রধারীর চক্রই যে রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র্য আনিয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই চক্র ত্রিভুবনাধীশ্বর শ্রীবিষ্ণুচক্র, শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্র বা কালচক্র নামে অভিহিত হওয়া উচিত। যদি 'কালচক্র' বলিয়া গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে দ্বাদশটি 'অর' (pokes) থাকিবে—বার মাসের ইহা নিদর্শন। নিরাকার ব্রহ্মের সৃষ্টি, সংহার ও পালন শক্তি ত্রিমূর্ত্তিতে—ব্রহ্মা, শিব ও বিষ্ণুতে প্রথম পতিত হয়। ব্রহ্মার বর্ণ উদীয়মান সূর্য্যের মত, শিববর্ণ মধ্যাহ্ন সূর্য্যের মত উজ্জ্বল শুভ্র, এবং বিষ্ণুর বর্ণ রাত্রিমুখী সন্ধ্যার মত শ্যাম। এই ত্রিমূর্ত্তিই (Trinity) কালচক্রের বিবর্ত্তন করেন। জাতীয় পতাকায় সনাতন ধর্ম্মের এই প্রাচীন রূপ প্রকাশিত হইয়াছে।

(২) বেদই সনাতন ধর্ম্মের মূল। সেই বেদের একটি নাম 'ত্রয়ী' হইয়াছে। ঋগ্বেদ অগ্নি হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মার স্বরূপ, তাই ঊর্দ্ধে অগ্নিবর্ণ। ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিনটিকে লইয়া ত্রয়ী যজুর্ব্বেদ সূর্য্য হইতে প্রকাশিত। শুক্ল যজুর্ব্বেদ তাহার নাম, তিনি রুদ্রের স্বরূপ, তাই শুভ্র। সাম স্বয়ং বিষ্ণুরূপী—সুতরাং শ্যামবর্ণ এবং এই বিষ্ণুচক্র মধ্যে সুশোভিত। অনেক বিষ্ণুমন্দিরের চূড়ায় এখনও বিষ্ণুচক্র শোভা পায়। বিষ্ণু বর্ণাত্মা—তাঁহার চক্রশব্দই প্রথম প্রণব-ঝঙ্কার এবং বর্ণসৃষ্টির মূল। সুতরাং বিষ্ণুচক্রশোভিত বেদত্রয়ের সূচনা এই পতাকায় পাওয়া যায়।

(৩) গীতা সনাতন ধর্ম্মের পরম সম্পদ। এই গীতাতে কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান তিনটি সাধনমার্গ বর্ণিত হইয়াছে। গীতা অশোকের বহু পূর্ব্বে ভগবান বেদব্যাস লিখিত মহাভারতের অন্তর্গত এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখনির্গত। গীতায় ১৮টি অধ্যায় আছে—ছয়টি করিয়া অধ্যায়ে প্রত্যেক সাধনমার্গের বিচার আছে। সর্ব্বনিম্ন অধিকারীর পক্ষে কর্ম্মপথ, তাহাতে আবিলতা আছে, কর্ম্ম বন্ধনের হেতু বলিয়া তাহার শ্যামলতা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরেই ভক্তিবাদ,—শুভ্র নির্ম্মল এবং ঊর্দ্ধে জ্ঞানবাদ—গৈরিক বর্ণ, যাহা বৈরাগ্যের মূর্ত্তি। গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে কর্ম্মবাদ, দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে ভক্তিবাদ এবং তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে জ্ঞানবাদ বর্ণিত। মধ্যে ঠিক

ভক্তিবাদের উপরে শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শনচক্র জ্ঞান ও কর্ম্মকে স্পর্শ করিয়া ভারতের কর্ম্ম, প্রেম ও জ্ঞান এই সাধনপথের ত্রিধারাকে প্রবর্ত্তনা দিতেছেন।

(৪) সনাতন ধর্ম্মের মৌলিক তত্ত্ব বর্ণ ব্যবস্থায়। শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র (Wisdom, Power, Wealth & Labour) এই চারটি বর্ণের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু এই চারটি বর্ণের মূলে আছে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি। "অজামেকাং লোহিত শুক্ল কৃষ্ণাম" ইহা শ্রুতিতে আছে—প্রকৃতির রূপ হইল লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণ। লোহিত—রজোগুণ, শুক্ল—সত্ত্বগুণ, ও কৃষ্ণ—তমোগুণের প্রকাশক। এই গুণের বর্ণ লইয়া "বর্ণ" শব্দের উৎপত্তি। "বর্ণাঃ সাত্ত্বিকং রাজসং মিশ্রং তামসঞ্চেতি স্বচ্ছত্বাদি গুণসাম্যাৎ গুণবৃত্তং বর্ণশব্দেনোচ্যতে।" (মহাভারতের নীলকণ্ঠী টীকা)। সুতরাং বর্ণের মূলভূত গুণত্রয়ের স্বরূপ এই ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকায় প্রদর্শিত হইয়াছে। "কালঃ সৃজতি ভূতানি"—কাল প্রকৃতি সহায়তায় ব্রাহ্মণাদি বর্ণের ভেদ করিয়া থাকেন। এজন্য চক্ররূপে কাল মধ্যস্থলে বিরাজমান; অথবা জন্মমৃত্যু-চক্র প্রদর্শিত হইয়াছে। মহাভারতেও দেখা যায় ব্রাহ্মণ শ্বেত, ক্ষত্রিয় রক্ত, বৈশ্য পীত ও শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। আজ ক্ষত্রিয়শক্তি ও বৈশ্যশক্তি—শৌর্য্য ও ধনশক্তি প্রায় মিলিত অবস্থায় আছে, এজন্য পীত ও লোহিত মিশ্রিত বর্ণ উপরে, জ্ঞান বা ব্রাহ্মণ্যের শ্বেতবর্ণ মধ্যে, এবং শূদ্র বা সেবাবৃত্তির কৃষ্ণবর্ণ তাহার পরেই প্রকাশিত। সনাতন ধর্ম্ম যে কয়টি বৈশিষ্ট্য লইয়া বহুবর্ষ ব্যাপিয়া ভারতে বর্ত্তমান আছে—তাহার সমস্তগুলিই জাতীয় পাতাকায় দেখা হইয়াছে। এই জাতীয় পতাকা আজ ভারতে সর্ব্বসম্প্রদায় সম্মানিত হইয়া স্বকীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হউন। ভারতের মাটি ও মনের পূর্ণ স্বাধীনতা আনয়ন করুন, ইহাই সনাতনী আশা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্বাধীনতার বাণী*

শ্রীঅরবিন্দের বাণী—(রেডিওর জন্য)

[মূল ইংরাজি শ্রীমা কর্তৃক বেতারে পঠিত, অল-ইণ্ডিয়া রেডিওর ত্রিচিনপল্লী ও মাদ্রাজ কেন্দ্র হইতে প্রচারিত।—অনুবাদক শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত]

১৫ই আগষ্ট স্বাধীন ভারতের জন্মদিন। এ দিনে ভারতে একটা যুগের অবসান হল, আরম্ভ হল নূতন যুগ। তবে স্বাধীন জতি হিসাবে আমাদের জীবন দিয়ে, কর্ম্ম দিয়ে এ দিনটিকে আমরা মূল্যবান করে তুলতে পারি, সমস্ত জগতের জন্য, সেখানে একটা নূতন যুগ, মানব জাতির রাষ্ট্রনীতিক, সমাজনীতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ভবিতব্যের পক্ষে নূতন যুগ নিয়ে আসছে বলে।

১৫ই আগষ্ট আমার জন্মদিন—এ দিনের যে এতখানি অর্থ হয়ে উঠেছে তা আমার পক্ষে নিশ্চয়ই প্রীতিকর। এই সংযোগটি আমি শুধু আকস্মিক ঘটনা বলে গ্রহণ করি না, আমার কাছে তা হল আমি জীবন আরম্ভ করেছি যে কাজ নিয়ে তাতে আমার প্রতিপদের দিশারী ভগবৎ শক্তির সম্মতি ও অনুমোদন, তার পূর্ণ ফললাভের সূচনা। ফলতঃ চোখের সামনে আজ আমি দেখতে পাই—যে সব জাতিগত আন্দোলনের পরিপূর্ণতা আমার আয়ুকালেই ঘট্‌বে আশা করেছি, তখন যদিও তাদের মনে হত অসম্ভব স্বপ্নবিলাস বলে, সত্যই তারা সাফল্যলাভ করতে চলেছে, সার্থকতার পথে উঠে দাঁড়িয়েছে। এ সকল আন্দোলনেই স্বাধীন ভারত অনেকখানি স্থান অধিকার করতে পারে, নেতৃপদ লাভ করতে পারে।

প্রথম স্বপ্ন হল একটা বিপ্লবী আন্দোলন যার ফলে গড়ে উঠবে মুক্ত ও ঐক্যবদ্ধ ভারত। ভারত আজ মুক্ত বটে, কিন্তু একত্ব অর্জ্জন করেনি।

* চতুর্থ অধ্যায়ে, ১৫ই আগষ্ট, ইংরাজ সরকার কর্তৃক ভারবাসীর হস্তে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর গণপরিষদে কংগ্রেস নেতৃবর্গ যে বাণী দিয়াছিলেন, তাহা ঐ অধ্যায়েই মুদ্রিত হইয়াছে। বর্তমান অধ্যায়ে বাংলার কয়েকজন চিন্তাশীল ব্যক্তির বাণী মুদ্রিত হইল। শ্রীঅরবিন্দের প্রথম বাণীটি বেতারে প্রচারিত হয় এবং দ্বিতীয় বাণীটি সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়।

বস্তুতঃ এক সময়ে মনে হয়েছিল, ঠিক স্বাধীনতা লাভ করতে গিয়েই সে বুঝি ফিরে আবার পড়বে গিয়ে ব্রিটিশ অধিকারের অব্যবহিত পূর্ব্বেকার বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্ররাজির বিশৃঙ্খলার মধ্যে। তবে সুখের কথা, এখন দেখা যায় সে বিপদ খুব সম্ভব আর ঘটবে না। পরিপূর্ণাঙ্গ না হলেও একটা বৃহৎ ও শক্তিমান ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে। তা ছাড়া, সংগঠনী সমিতি (Constituent Assembly) তাঁদের কর্ম্মব্যবস্থায় যে দৃঢ়তা ও সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন, তাতে মনে হয়, অনুন্নত শ্রেণীর সমস্যা সুসমাধান হবে বিনা ভাগ-বাটরায়। কিন্তু হিন্দু মুসলমানের প্রাচীন সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ এত গাঢ় হয়ে উঠেছে যে বোধহয় দেশকে তা যেন স্থায়ীভাবে খণ্ডিত করেছে রাজনীতি হিসাবেও। তবে আশা করা যায় এই আপাত বাস্তবকে চিরন্তন বাস্তব বলে গ্রহণ করা হবে না, সাময়িক ব্যবস্থার বেশী মূল্য দেওয়া হবে না। কারণ, তা যদি স্থায়ী হয়, তবে ভারত সাঙ্ঘাতিক ভাবে দুর্ব্বল হয়ে পড়বে, এমন কি বিকল হয়েও পড়তে পারে; অন্তর্দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা সর্ব্বদাই রয়ে যাবে, এমন কি নূতন বিদেশী আক্রমণ ও অধিকারের সম্ভাবনাও দেখা দিতে পারে। ভারতের আভ্যন্তরীণ উন্নতি ও সমৃদ্ধি ব্যাহত হতে পারে, নেশন-সঙ্ঘের মধ্যে তার মর্য্যাদা হ্রাস পেতে পারে, তার ভবিতব্য ক্ষুণ্ণ হতে পারে, এমন কি ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তা কখন ঘটতে দেওয়া হবে না। দেশের বিভাগ দূর করা চাইই চাই। আমরা আশা করতে পারি, তা ঘটবে স্বাভাবিক ভাবে, কেবল শান্তি আর মৈত্রীর নয়, সমবেত কর্ম্মেরও প্রয়োজন যত বেশি স্বীকার করা হবে, ঘটবে এই সমবেত কর্ম্মে লিপ্ত হয়ে এবং তদুদ্দেশ্যে যথাযথ উপায় গড়ে তোলবার ফলে। ঐক্য এইভাবে অবশেষে আসতে পারে যে আকারেই হোক না—বিশেষ আকারটির প্রয়োজন কাজের সুবিধার দিক দিয়ে, তার নিজস্ব নিত্য মূল্য কিছু নাই। কিন্তু যে উপায়ে হোক, যে ধারায় হোক, বিভাগ দূর হওয়া চাই। একত্বকে প্রতিষ্ঠিত করা চাই, প্রতিষ্ঠিত হবেই—কারণ, ভারতের ভবিষ্যৎ মহত্ত্বের জন্য তার প্রয়োজন।

আর একটি স্বপ্ন হ'ল এশিয়ার সকল জাতির পুনরুত্থান ও মুক্তি, মানব সভ্যতার উন্নতি কল্পে তার যে মহৎ ব্রত তা পুনর্গ্রহণ। এশিয়া উঠেছে; তার অনেকানেক অংশ এখন সম্পূর্ণ মুক্ত, কিংবা মুক্ত হতে চলেছে এই মুহূর্ত্তেই; অন্যান্য অংশ যা এখনও পরাধীন কি প্রায় পরাধীন, যত সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে হোক, তারাও চলেছে মুক্তির দিকে। অল্প কিছু করবার বাকী আছে, তা করা হবে আজ হোক আর কাল হোক।

এখনও আছে ভারতের নিজস্ব কাজ এবং সে কাজ সে আরম্ভ করেছে সামর্থ্য ও নৈপুণ্য সহকারে, তাতে ইতিমধ্যেই প্রমাণ করে কতখানি তার ভবিষ্য-সম্ভাবনা আর কোনস্থান সে অধিকার করতে পারে জাতিসঙ্ঘের সভায়।

তৃতীয় স্বপ্ন হল একটা বিশ্বসম্মিলনী—তা হবে সমগ্র মানবজাতীর জন্যে শোভনতর, উজ্জ্বলতর, মহত্তর জীবনের বাহ্য প্রতিষ্ঠা। মানবজাতীর সে ঐক্য সাধনাও সুরু হয়েছে; সূত্রপাত যদিও তার ত্রুটি বহুল, বাহ্য ব্যবস্থাও তার হয়েছে বটে কিন্তু চলতে হয়েছে বিপুল বিঘ্নের বিরুদ্ধে। কিন্তু গতিবেগ যখন দেখা দিয়েছে, তখন তা ক্রমেই বৃদ্ধি পাবে, জয় তার হবেই শেষে। এক্ষেত্রেও ভারত প্রধান অংশ এক গ্রহণ করেছে; সে যদি অনুসরণ করে চলে সেই উদারতর রাষ্ট্রনীতি, বর্ত্তমানের ঘটনা আর আশু সম্ভাবনার মধ্যেই যা সীমাবদ্ধ নয়, যার দৃষ্টি ভবিষ্যতের মধ্যে, এবং ভবিষ্যৎকে যা নিকটে নিয়ে আসে, তা হ'লে ভারতবর্ষের উপস্থিতি অর্থই হবে মন্থর কি শঙ্কিত নয়, ক্ষিপ্র, নির্ভীক ক্রমগতি। অবশ্য একটা দুর্য্যোগ অতর্কিতে এর মাঝে এসে পড়তে পারে, আরব্ধ কর্ম্মকে বন্ধ করতে পারে, নষ্টও করতে পারে, তা হলেও শেষ ফল সুনিশ্চিত। ঐক্যসাধন প্রকৃতির ধারায় অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজন, অপরিহার্য্য ক্রিয়া। নেশন সকলের জন্যে এর প্রয়োজন স্পষ্ট, কারণ এ ছাড়া ক্ষুদ্রতর নেশনদের স্বাধীনতা যে কোন মুহূর্ত্তে বিপদাপন্ন হতে পারে, বৃহত্তর ও শক্তিমান নেশনদের জীবনও নিরাপদে থাকে না। ঐক্য বাঞ্ছনীয় সকলের স্বার্থের দিক দিয়ে। কেবল মানুষের ঘোর অপদার্থতা, মূঢ় আত্মপরতাই তাকে ব্যর্থ করতে পারে—কিন্তু, এসব বাধাও প্রকৃতির প্রয়োজন আর ভগবৎ-ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে না। কিন্তু কেবল বাহ্য প্রতিষ্ঠাই যথেষ্ট নয়, গড়ে ওঠা দরকার একটা আন্তর্জ্জাতিক ভাব ও দৃষ্টি, আন্তর্জ্জাতিক আয়তন প্রতিষ্ঠান পর্য্যন্তও দেখা দেওয়া দরকার—এমন একরকমের ব্যবস্থা যাতে এক দেশের অধিবাসী দুই বা ততোধিক দেশের নাগরিক অধিকার লাভ করতে পারে, বিভিন্ন নেশনের শিক্ষাদীক্ষা স্বেচ্ছায় সম্মিলিত হয়ে একীভূত হয়ে উঠতে পারে। নেশন-বাদ তার পূর্ণ সার্থকতা লাভ করে, তার যোদ্ধৃভাব পরিত্যাগ করবে, দেখবে আত্মরক্ষণের সঙ্গে তার অক্ষুণ্ণ স্বকীয়তার সঙ্গে এ ধরণের নূতন পরিণতির কোন দ্বন্দ্ব নাই। একটা অভিনব ঐক্যভাব সমস্ত মানবজাতিকে অধিকার করবে।

তার পরের স্বপ্ন। ভারত তার আধ্যাত্মিকতা জগৎকে দান করবে। এ কাজ ইতিমধ্যেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। ভারতের আধ্যাত্মিক বিদ্যা ইউরোপে

ও আমেরিকায় ক্রমেই অধিকতর পরিমাণে প্রবেশলাভ করছে। ক্রমেই এ ধারা বৃদ্ধিলাভ করবে। এ যুগের দুর্যোগের মধ্যে মানুষের দৃষ্টি আশায় ভরসায় বেশি করে এদিকে ফিরছে; ভারতের শাস্ত্রবিদ্যা কেবল নয়, তার সাধনা, অন্তর ও আধ্যাত্মিক অনুশীলন পর্য্যন্ত আশ্রয় গ্রহণ করতে উন্মুখী হয়েছে।

আমার শেষ স্বপ্ন হল, বিবর্ত্তনের একটা নূতন সোপানে উত্তরণ, যার ফলে মানুষ উঠে দাঁড়াবে একটা উৰ্দ্ধতর ও বৃহত্তর চেতনার মধ্যে, আর যেসব সমস্যা মানুষকে বিমূঢ় উদ্বিগ্ন করে এসেছে, যেদিন থেকে সে ব্যক্তিগত উৎকর্ষের, সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর সমাজের চিন্তা করে স্বপ্ন দেখে এসেছে, তাদের সুষ্ঠু মীমাংসা সুরু হবে। কিন্তু এ হল এখনও আমার ব্যক্তিগত আশার ও আদর্শের কথা। তবে ভারতবর্ষে এবং পাশ্চাত্যে যাদের দৃষ্টি ভবিষ্যতের দিকে, তারা ধীরে ধীরে একে গ্রহণ করছে। অবশ্য অন্যান্য ক্ষেত্র অপেক্ষা এখানে বাধাবিঘ্ন অত্যন্ত বিপুল; কিন্তু বাধাবিঘ্নের সৃষ্টি হয়েছে, জয় করবার জন্যেই ত—ভগবৎ আদেশ যদি থাকে, তবে তাদের উপর জয় হবেই। এখানেও, এই বিবর্ত্তন ক্রমের আবির্ভাব সম্ভাবনা যদি থাকে, তবে তা ঘটবে অধ্যাত্মসত্তার ও আত্মচেতনার পরিণতির ফলে এবং এই কারণেই তার প্রেরণা আসতে পারে ভারতবর্ষ হতে—বাহিরের ক্ষেত্র থাকবে পৃথিবী ব্যেপে, কিন্তু উৎস হবে ভারত।

ভারতের আজকার এই মুক্তিদিবসের মধ্যে অমি এই অর্থ দেখছি—এ যোগাযোগ কত দূর-প্রসারী বা কত শীঘ্র বাস্তবে পরিণত হবে, তা নির্ভর করছে, এই মুক্ত নবীন ভারতবর্ষের উপর।

শ্রীঅরবিন্দের বাণী—(সংবাদপত্রের জন্য)

[মূল ইংরাজি হইতে শ্রীযুক্ত পশুপতি ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক অনুদিত এবং "যুগান্তর" পত্রিকায় প্রকাশিত।]

আজ ১৫ আগষ্ট স্বাধীন ভারতের শুভ জন্মদিন। পুরাতন কাল এবার বিগত হলো, নূতন জীবনের হলো সুরু। শুধু যে আমাদের কাছে এর একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে তা নয়, সমগ্র এশিয়াখণ্ড এবং সমস্ত জগতের কাছেই রয়েছে এর গুরুত্ব। যাবতীয় স্বাধীন জাতির দরবারে আজ একটি নবশক্তি প্রবেশলাভ করছে। মানবের ভবিষ্যৎ কল্যাণের দিক দিয়ে, তার রাজনৈতিক ও ও সামাজিক পরিণতি এবং তার উৎকর্ষ ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে কল্পনাতীত পরিবর্ত্তন এনে দেবার সম্ভাবনা নিয়ে আজ স্বাধীন ভারত পৃথিবীর সকল দেশের সর্ব্বজাতির সম্মেলনে আসন গ্রহণ করছে। ১৫ আগষ্টের এই বিশেষ দিনটি আমার জন্মদিন হিসাবে এতকাল পর্যন্ত কেবল আমার নিজের কাছেই স্মরণীয়

ছিল এবং আমার জীবন আদর্শের যারা অনুগামী তারা প্রতিবছর এই দিনটিকে স্মরণ করে কিছু উৎসবানুষ্ঠান করতো, কিন্তু এই নির্দ্দিষ্ট দিনটি আজ এমন সার্ব্বজনীন অ-সামান্যতা লাভ করাতে যদি আমি কিছু বিশেষ তৃপ্তিলাভ ক'রে থাকি, সেটা আমার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। এমন একটা যোগাযোগ যে কেবল দৈবক্রমেই ঘটে গেছে, একজন যোগসাধক হিসাবে তা ব'লে আমার মনে হয় না। আমার জন্মের প্রথম দিন থেকে যে বিধাতা আমাকে জীবনের এই নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম-ধারায় পরিচালিত করেছেন, এই যোগাযোগে যেন তাঁরই সহৃদয় অনুমোদন রয়েছে ব'লে আমার প্রতীতি হয়। আমার জীবদ্দশাতেই যে সকল জাগতিক পরিবর্ত্তন প্রত্যক্ষ করব বলে আমি এতাবৎ আশা করে এসেছি, যদিও সে সকল এককালে নিতান্তই অসম্ভব এবং স্বপ্নের অগোচর ছিল, কিন্তু কেবল এই নির্দ্দিষ্ট শুভ দিনটিতে আমি বারেবারে তা সার্থকতার পথে অগ্রসর হ'তে কিংবা সাফল্যের সম্ভাবনা নিয়ে আবির্ভাব হ'তে দেখেছি।

আজ এই মহা অনুষ্ঠান উপলক্ষে আমি কিছু বাণী দিতে অনুরুদ্ধ হয়েছি, কিন্তু আমি হয়তো তার পক্ষে ঠিক উপযুক্ত নই। তবে ব্যক্তিগতভাবে কেবল এইটুকু বলতে পারি যে বাল্যকালে ও যৌবনে আমি যে সমস্ত আদর্শের উত্তরোত্তর পরিণতির কল্পনামাত্রই করেছিলাম, এখন একে একে সেগুলি সার্থক হ'তে চলেছে। ভারতের এই স্বাধীনতার নবোদয় তারই প্রথম নিদর্শন। ভবিষ্যতের যে সকল কর্ম্মপন্থায় ভারত সকলের অগ্রণী হবে, আমার বিশ্বাস, এটা তারই প্রথম অংশ মাত্র। আমি চিরদিনই এই কথা স্থির জেনেছি যে, ভারতের স্বাধীনতার অভ্যুদয় হবে কেবল তার আপন স্বার্থরক্ষা ও সমৃদ্ধিলাভের জন্য নয়, কেবলই তার নিজস্ব প্রসার সম্পদবৃদ্ধি ও শক্তিবৃদ্ধির জন্য নয়, যদিও এই সকল আত্মোন্নতির দিক দিয়ে কিছুমাত্র অবহেলা করা তার চলবে না, কিন্তু অপরাপর শক্তিমান জাতিদের মতো পরস্বাপহরণ করে কারো উপর আধিপত্য স্থাপন করতেও সে কখনো যাবে না। সমগ্র মানবজাতির সে হবে পথপ্রদর্শক, সকলের মঙ্গলের পথে সাহায্যকারী, ঈশ্বরের শুভ ইচ্ছার অনুগামী।

ভারতের ভবিষ্যৎ পরিণতির সম্বন্ধে যে সকল আদর্শ এবং লক্ষ্য আমার কাছে প্রতিভাত হয়েছিল, আমি একে একে তাই এখন ব্যক্ত ক'রে যাই : প্রথমে হবে বিপ্লব যার ফলে ভারত স্বাধীন হবে আর সমস্ত ভারতের একতা স্থাপিত হবে, পুনরুত্থানের ফলে সমগ্র এসিয়া সকল প্রকারের প্রভাবমুক্ত ও স্বাধীন হয়ে মানবসভ্যতার উন্নতির কাজে আপন গৌরবের অংশটি গ্রহণ করবে; সমগ্র মানব সম্প্রদায়ের একটা নূতনতর বৃহত্তর মহত্তর ও উজ্জ্বলতর জীবনধারার সূচনা হবে, আর তার সম্যক উপলব্ধির মূল ভিত্তিস্বরূপ প্রকাশ্যভাবেই গড়ে

উঠবে একটা বিশ্বব্যাপী আন্তর্জ্জাতিক অবিরোধ সমন্বয়, যার ফলে জগতের সমস্ত বিভিন্ন জাতি নিজ নিজ বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ক'রেও এবং বহুধা বিভক্ত হ'য়েও নিজেদের মৌলিক একত্ব উপলব্ধি ক'রে এক চরম ও পরম ঐক্যসূত্রে মিলিত হয়ে থাকবে ; ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবদান হবে তার আধ্যাত্মিক জ্ঞান আর জীবনকে পারমার্থিক পথে পরিচালিত করবার পক্ষে তার সুনির্দ্দিষ্ট নির্দ্দেশ। অবশেষে ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হয়ে মানবচৈতন্য এমন এক উচ্চতর স্তরে উন্নীত হবে যেখানে গিয়ে আবাহমান কালের মানবজীবনের অনেক জটিল সমস্যার অতি সহজ মীমাংসা হ'য়ে যাবে ; আর যখন থেকে মানুষের প্রথম জ্ঞানোদয় ঘটেছিল এবং সে ব্যক্তিগত চরিতার্থতার ও সামাজিক সম্পূর্ণতার স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছিল, তখন থেকে আজও পর্য্যন্ত যে জীবনরহস্যের গ্রন্থি সে কিছুতে মোচন করতে পারে নি তাও অতঃপর সম্যক মোচন হ'যে যাবে।

ভারত স্বাধীন হয়েছে বটে, কিন্তু এখনও তার জাতীয় একতা ঘটেনি। এ শুধু একটা ভাঙা ফাটা দাগী স্বাধীনতা। এক সময় এমনও মনে হয়েছিল যে, ইংরেজ দখলের আগে ভারত যেমন বহু খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হয়ে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছিল, এখন বুঝি আবার তারই পুনরাবৃত্তি ঘটে যায়। ভাগ্যক্রমে তার সম্ভাবনা আপাতত উত্তীর্ণ হয়ে গেল বলে মনে হচ্ছে। গণপরিষদের সুযুক্তিপূর্ণ নির্ভীক কার্য্যপ্রণালী দেখে আশা করা যায় যে, কোনো বিবাদ বিচ্ছেদ না ঘটিয়ে দেশের হরিজন সম্প্রদায়ঘটিত সমস্যারও একটা সুমীমাংসা হয়ে যাবে। কেবল হিন্দু-মুসলমানের সেই পুরাণো সাম্প্রদায়িক বিচ্ছেদটা দেশের রাজনৈতিক বিভক্তিতে একটা স্থায়িত্বের আকার নিয়ে আরো যেন বেশি মাত্রায় প্রকট হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু তবু আশা করা যায় যে আমাদের জাতি এবং জাতীয় কংগ্রেস এই বিভক্তিতে একটা সাময়িক সিদ্ধান্ত ছাড়া চিরস্থায়ী ঘটনা ব'লে কখনই মেনে নেবে না। এ যদি স্থায়ী হয় তাহলে এই ভারতবর্ষ মারাত্মক রকমে শক্তিহীন ও পঙ্গু হয়ে' পড়বে, অন্তর্ব্বিপ্লবের সম্ভাবনা এখানে চিরদিনই থেকে যাবে, আর বাহির থেকে আক্রমণ ও পরাজয়ের সম্ভাবনাও যথেষ্টই থাকবে। দেশের এই অশুভ ব্যবচ্ছেদ অবশ্যই দূর করতে হবে। সাম্প্রদায়িক উন্মাদনাকে যুক্তির দ্বারা শান্ত ক'রেই হোক, শান্তি এবং ঐক্যের প্রয়োজনীতা ভিতরে ভিতরে ক্রমশঃ উপলব্ধির দ্বারাই হোক, পরস্পরের মধ্যে নিত্যদিনের সহযোগিতা ও সাহায্যের প্রয়োজন অপরিহার্য্যরূপে অনুভব করেই হোক, কিংবা ঐক্য বিধানের কোনো কার্য্যকুশল প্রতিষ্ঠান খাড়া করেই হোক, এ বিচ্ছেদ শেষ পর্য্যন্ত ঘুচে যাবে। জাতীয় একতা নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠিত হবে, কেমন আকারে আর কেমন ভাবে তা ঘটবে সেটা কার্য্যক্ষেত্রে কঠিন মনে হ'লেও আসলে তা নিতান্তই অবান্তর। যে

উপায়েই হোক এ বিচ্ছেদ ঘুচে যাওয়া চাই এবং অবশ্যই তা হবে। তা না হ'লে ভারতের মহান ভবিতব্য সফল হওয়ার সম্বন্ধে দারুণ বিঘ্ন ঘটতে পারে, এমন কি তা নষ্টও হ'য়ে যেতে পারে। কিন্তু কিছুতেই তেমন হবে না।

এসিয়া এখন জেগেছে। তার প্রধান প্রধান অংশগুলি কতক বা মুক্তি পেয়েছে কতক বা মুক্তির পথে অগ্রসর হ'য়ে চলেছে। যে সমস্ত অংশ এখনও রয়েছে পরাধীন তারাও স্বাধীনতা লাভের জন্য নানারকম সংগ্রামে নিযুক্ত। মুক্তি পেতে যেটুকু বাকি আছে তা আজ অথবা কাল সম্পূর্ণ হ'য়ে যাবে। এ কাজেও ভারতের খানিকটা নিজস্ব অংশ আছে এবং সেই কর্ত্তব্যটুকু সে এমন যোগ্যতার সঙ্গে সম্পাদন ক'রে যাচ্ছে যে, তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা কতদূর পর্য্যন্ত এবং বিশ্বজাতির মহাসদনে কোথায় যে তার স্থান তা এখন থেকেই স্পষ্ট অনুমান করতে পারা যায়।

সমগ্র মানব সম্প্রদায়ের একতাবিধায়ক সমন্বয়ের ক্রিয়া অগ্রসর হয়ে চলেছে। যদিও এখন তা সবেমাত্র প্রারব্ধ এবং নিতান্তই অস্পষ্ট, আর যদিও তাকে অসংখ্য বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়ে অতিক্রম ক'রে সুশৃঙ্খলায় প্রকাশিত হয়ে আসতে বিলম্ব হচ্ছে কিন্তু তার অন্তর্নিহিত গতিবেগ সুনিশ্চিত। ইতিহাসের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী যদি বিচার ক'রে দেখা যায়, তাহলে এ কথা মানতেই হবে যে যতদিন পর্য্যন্ত এই উদ্দেশ্যের সাফল্য না ঘটে ততদিন পর্য্যন্ত এই অন্তর্নিহিত বেগধারাটি উত্তরোত্তর বেড়েই চলবে, কোনো কিছুই একে প্রতিরোধ করতে পারবে না। এ বিষয়েও ভারত তার নির্দ্দিষ্ট অংশটি গ্রহণ ক'রে যথাযোগ্য ক্রিয়া করতে সুরু ক'রে দিয়েছে। আপন বর্ত্তমান অবস্থা আর বর্ত্তমান অশঙ্কাগুলিকে অতিক্রম ক'রে ভরত যদি তার বৃহত্তম রাজনীতি অনুশীলনের দ্বারা দূরবর্ত্তী ভবিষ্যৎকে কতকটা নিকটতম ক'রে এনে ফেলতে পারে তাহলে যে যুগপরিবর্ত্তনের এখন সম্ভাবনা, ভীরু পদবিক্ষেপে অতি মন্থরগতিতে অগ্রসর হচ্ছে, সেটি অচিরে আপন দৃপ্ত ব্যঞ্জনায় প্রকট হয়ে উঠবে। অবশ্য এ পক্ষে অনেক বিপর্য্যয়ও ঘটতে পারে আর অনেক বাধাবিঘ্নও এসে পড়তে পারে কিন্তু তবুও শেষ পর্য্যন্ত এর সাফল্য সুনিশ্চিত। প্রকৃতির বিবর্ত্তনধারায় মানবজাতির মধ্যে এই একতা সম্পাদনের প্রয়োজন আছে, অতএব এই আকিঞ্চনের সাফল্য যে অবশ্যম্ভাবী তা স্বচ্ছন্দেই ভবিষ্যদুক্তি করতে পারা যায়। জাতিসমূহেরও এতে প্রয়োজন আছে, কারণ এই একতা না থাকলে ছোটো ছোটে দেশগুলিও নিরাপদ হ'তে পারবে না আর বৃহত্তম জাতিগুলির নিরাপত্তাও অনিশ্চিত থেকে যাবে। ভারত যদি এমনি বিভক্তই হ'য়ে থাকে তা'হলে তার নিজের নিরাপত্তা চিরদিন অনিশ্চিত হ'য়ে থাকবে। মানুষের নির্বুদ্ধিতা আর হীন ধরণের স্বার্থবোধই এই একতা সম্পাদনের

অন্তরায়। কথিত আছে যে, তার বিরুদ্ধে স্বয়ং দেবতারাও কিছু করতে অক্ষম; কিন্তু প্রকৃতির প্রয়োজন আর ভগবৎ ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে সমস্ত কিছুই চিরদিন স্থায়ী হতে পারে না। গণ্ডীবদ্ধ জাতীয়তাবাদের একটা সীমা আছে, সে সীমা এর পর চরমে পৌছে যাবে; তখন দেখা দেবে সার্ব্বজনীন আন্তর্জ্জাতিক মনোভাব আর আন্তর্জ্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী, গড়ে উঠবে যত আন্তর্জ্জাতিক সংগঠন আর আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ। এমনও হয়তো হবে যে একই ব্যক্তি একাধিক স্বতন্ত্র দেশের পৌরজন ব'লে পরিগণিত হ'তে থাকবে, এক দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি অন্য দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে অবাধে মিশে যাবে, আর গণ্ডীবদ্ধ জাতীয়তার গোঁড়ামিটুকু শত্রুমিত্র বোধ আর সমরপ্রিয়তা ভুলে গিয়ে আত্মবিলোপ না ঘটিয়েও এই মিলনের স্রোতে অনায়াসে গা ঢেলে দেবে। মানবসমাজের মধ্যে এক নূতনতর একতা-চৈতন্যের উদয় হবে।

জগৎকে ভারতবর্ষের যা পরম দেয়, সেই মহাদানের ক্রিয়া ইতিমধ্যেই সুরু হ'য়ে গেছে। ভারতের আধ্যাত্মিকতা ইউরোপ ও আমেরিকার রন্ধ্রে রন্ধ্রে উত্তরোত্তর অনুপ্রবেশ করছে। এই ক্রিয়া চলতে থাকবে। যতই দুর্দ্দিন আসছে ততই তারা অভয়ের আশা নিয়ে এই দেশের দিকে ব্যাকুল দৃষ্টিপাত করছে, আর অনেকে এমন কি তার ধ্যানধারণা ও সাধনভজনের পদ্ধতিগুলিও আগ্রহের সঙ্গে আয়ত্ত করে নিচ্ছে।

আর যা কিছু আছে তা এখনও ব্যক্তিগত আশা আকাঙ্ক্ষার কথা। সেই আদর্শ এবং সেই লক্ষ্য কেবল ভারতেই নয়, পাশ্চাত্য দেশের দূরদর্শী ব্যক্তিদের মনেও তার উদয় হয়েছে। অবশ্য সে আশা পূরণ হ'তে বাধাবিঘ্ন তো যথেষ্টই আছে, আর মানুষ যতদিক দিয়ে যত রকমের প্রয়াস করে, এই বিষয়ের বাধাবিঘ্নই তার মধ্যে সব চেয়ে বেশি। কিন্তু জয় করবার জন্যই যত বাধাবিঘ্নের সৃষ্টি। সর্ব্বশক্তিমানের যদি ইচ্ছা হয় তবে সে সমস্তই দূর হ'য়ে যাবে। ক্রমবিকাশের পথে তাই যদি ঘটে তাহ'লে আত্মার উন্নতি আর আন্তলোকের জ্ঞানোদয়ের দ্বারাই তা সম্ভব হবে। এই বিষয়েও ভারতবর্ষের পক্ষথেকেই তার প্রেরণা আসতে পারে, আর যদিও তার ক্রিয়া সারা বিশ্বেই পরিব্যাপ্ত হবে, কিন্তু তার মূল কেন্দ্রটি হবে এই ভারতে।

শ্রীঅরবিন্দের ১৯১০ সালের ভবিষ্যদ্বাণী

(অনুবাদক—শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য)

১৯০৭ এর পর থেকে আমরা এক নূতন যুগে এসে উত্তীর্ণ হয়েছি। ভারতের পক্ষে এই যুগ আশা ও অভ্যুদয়ের যুগ। শুধুই ভারতে নয়, সারা পৃথিবী জুড়ে

এই মধ্যযুগের আকস্মিক অভ্যুত্থান ঘটবে। এতে অনেক কিছুই ওলোটপালোট হয়ে যাবে। উচ্চের স্থান নিচে নেমে আসবে, নিচের জিনিষ উঁচুতে উঠে যাবে। যারা পতিত, যারা পদদলিত, তারা হবে নবীন মর্য্যাদায় উন্নত। সকল জাতি ও সমগ্র মানবসম্প্রদায় একটা নূতন চৈতন্যলাভে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠবে, নূতনভাবে আর নূতন প্রেরণায় তারা নূতন রকম লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হবে। আর এই সমস্ত যুগান্তকারী পরিবর্ত্তনের মধ্যে ভারত হয়ে যাবে সম্পূর্ণ স্বাধীন। (জানুয়ারী ১৯০৭, "ইণ্ডিয়া" পত্রিকা হইতে।)

* * * *

অনেক পরস্পরবিরোধী জাতি এই দেশে বাস করে। কখনও সদ্ভাব মৈত্রী একতা ছিল না, কিন্তু তাহাতে ভয় কি?…ধর্ম্মমত এক নহে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে মিল নাই, মিলের আশাও নাই, কিন্তু তথাপি ভয় নাই। এক দেশে নানা ভাষা, ভাই-ভাইয়ের কথা বুঝিতে অক্ষম, পরস্পরের ভাবে প্রবেশ করি না, হৃদয়ে হৃদয়ে আবদ্ধ হইবার পথে অভেদ্য প্রাচীর পড়িয়া রহিয়াছে, অতিকষ্টে লঙ্ঘন করিতে হয়, তথাপি ভয় নাই।…এই সকল বাধায় চিরকাল আটকায় না। মায়ের প্রয়োজন, মায়ের টান, মায়ের প্রাণের বাসনা বিফল হয় না, তাহা সকল বাধা, সকল বিরোধ অতিক্রম করে। প্রাকৃতিক নিয়ম এই, সর্ব্বদেশের ইতিহাসের শিক্ষা এই। দেশ জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা, সেই সম্বন্ধ অব্যর্থ। স্বদেশ থাকিলে জাতীয়তা অবশ্যম্ভাবী। এক দেশে দুই জাতি চিরকাল থাকিতে পারে না, মিলিত হইবেই।…

কিন্তু এই ফল অবশ্যম্ভাবী হইলেও মানুষের চেষ্টায়, মানুষের বুদ্ধিতে বা বুদ্ধির অভাবে সেই অবশ্যম্ভাবী প্রাকৃতিক ক্রিয়া সত্বরে বা বিলম্বে ফলবতী হয়। প্রধান অন্তরায় মাতৃদর্শনের অভাব। আমাদের রাজনীতিবিদ্‌গণ প্রায়ই মায়ের সম্পূর্ণ স্বরূপ দর্শন করিতে অসমর্থ ছিলেন। রণজিৎ সিংহ বা গুরুগোবিন্দ ভারতমাতা না দেখিয়া পঞ্চনদমাতা দেখিয়াছিলেন। শিবাজী ও বাজীরাও ভারতমাতা না দেখিয়া হিন্দুর মাতা দেখিয়াছিলেন। অন্যান্য মহারাষ্ট্র রাজনীতিবিদ্ মহারাষ্ট্র-মাতা দেখিয়াছিলেন। আমরাও বঙ্গভঙ্গের সময়ে বঙ্গমাতা দর্শন করিয়াছিলাম। সেই দর্শন অখণ্ড দর্শন, অতএব বঙ্গদেশের ভাবী একতা ও উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ভারতমাতার অখণ্ডমূর্ত্তি এখনও প্রকাশ হয় নাই।…যেদিন অখণ্ডস্বরূপ মাতৃ-মূর্ত্তি দর্শন করিব…সেদিন এ অন্তরায় তিরোহিত হইবে। ভারতের একতা, স্বাধীনতা ও উন্নতি সহজসাধ্য হইবে। ভাষার ভেদে আর বাধা হইবে না, সকলে স্ব স্ব মাতৃভাষা রক্ষা করিয়াও সাধারণ ভাষারূপে হিন্দী ভাষাকে গ্রহণ করিয়া সেই অন্তরায় বিনষ্ট করিব। হিন্দুমুসলমান ভেদের প্রকৃত মীমাংসা উদ্ভাবন

করতে পারিব ।...(১৯১০) সালে প্রকাশিত "ধর্ম্ম" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দের আপন বাংলায় লিখিত।)

শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকারের বাণী

[শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার কলিকাতা বেতার-কেন্দ্র হইতে নিম্নলিখিত বক্তৃতা দেন। "বসুমতী" হইতে উদ্ধৃত।]

দুইশত বৎসরের ইংরাজ শাসনের আজ অবসান ঘটেছে, পরাধীনতার বন্ধন হয়েছে মোচন। আজিকার দিনে সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী সেই মহাত্মাদের নাম—যাঁরা অতীতে জাতির জীবনে সর্ব্বপ্রথম দেশপ্রাণতার উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন। পূজার মণ্ডপে প্রদীপ-শিখার ন্যায় যে ক্ষীণ অগ্নি তাঁরা প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন, পরবর্ত্তীকালের বহু দেশপ্রেমিকের মিলিত কর্ম্ম ও প্রয়াসে ক্রমে তা বহু ব্যাপ্ত হয়ে দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃতিলাভ করেছে। তাঁদের ত্যাগ, তাঁদের দুঃখবরণ, তাঁদের অভিলাষ ও আগ্রহ, তাঁদের স্বপ্ন ও সাধনা আজ সার্থক। পরলোকগত সেই পূর্ব্বাচার্য্যগণের সতৃপ্ত আত্মার আশীর্ব্বাদের দ্বারা আজ আমাদের স্বাধীনতার যাত্রাপথ নির্ব্বিঘ্ন হোক।

যে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সুদীর্ঘ সংগ্রামের ফলে এই স্বাধীনতা লাভ সম্ভব হয়েছে এবং যার হস্তে স্বাধীন ভারতের শাসনভার আজ ন্যস্ত, সেই কংগ্রেসের প্রথম পুরোধা ছিলেন একজন বাঙ্গালী—একথা স্মরণ করে আজ আমরা গর্ব্ব অনুভব করতে পারি। একথাও আজ সগর্ব্বে অনুভব করব যে, সেই স্বদেশীর দিনে বাংলা দেশেই কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, ছাত্র, শিক্ষক, নেতৃবৃন্দ ও কর্ম্মীরা সর্ব্বপ্রথমে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনকে সাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত করেছিলেন, রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষও ঘটিয়েছিলেন। আজ স্মরণ করছি সেই সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দকে, স্মরণ করছি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন ও দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রকে যাঁদের বিরাট অবদান আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সার্থক ও সফল করে তুলেছে। এটা আমাদের অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় যে বিগত ৩০ বৎসর যার একাগ্র সাধনার ও সুমহান নেতৃত্বে আমাদের স্বাধীনতার স্বপ্ন সফল হয়েছে, তিনি ভগবানের আশীর্ব্বাদরূপে আজও আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান। আজ সশ্রদ্ধচিত্তে তাঁকে প্রণাম করি।

একথা সত্য যে, ঐক্যবদ্ধ অখণ্ড স্বাধীন ভারত আমাদের সাধনার লক্ষ্য ও কর্ম্মের প্রেরণা ছিল, তা আমরা পাইনি; শুধু তাই নয়, যে বঙ্গ-বিভাগের বিরুদ্ধে আন্দোলনের দ্বারা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সূচনা, সেই দ্বিধাখণ্ডিত বঙ্গালাকেই

আজ আমরা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছি। বাঙ্গালা দেশের স্বাধীনতার উৎসব তাই অঙ্গবিচ্ছেদের বেদনা দ্বারা ক্ষুণ্ণ।

কিন্তু হৃদয়াবেগের দ্বারা বাস্তবকে তো অগ্রাহ্য করা যায় না এবং ভৌগোলিক সীমা দ্বারা পরিমাপ করা যায় না মানুষের মনের। ভৌগোলিক বিভাগ সত্ত্বেও মনের বিভাগ যদি আমাদের ভবিষ্যতে না ঘটে, তবে নিশ্চয়ই আমাদের উৎসব ব্যর্থ হবে না। বাঙ্গালা দেশ খণ্ডিত হলেও দেশের স্বাধীনতা তো সত্য। সেই সত্যকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে পরিপূর্ণ শ্রদ্ধায় ও যথোচিত কর্ত্তব্যবোধে। অধিকারের সঙ্গেই থাকে দায়িত্ব, বৃহৎ গৌরবেরই বৃহৎ দায়। আমাদের এই নবলব্ধ অধিকারকে রক্ষা করা, নির্ব্বিঘ্ন করা, মহত্তর করার দায়িত্বের কথা আজ উপলব্ধি করা প্রয়োজন। আজ অনাবশ্যক বাগাড়ম্বর নয়, সহজ উত্তেজনা নয়, সঘন করতালি নয়,—কষ্টের দ্বারা আজ রাষ্ট্রীয় অধিকারের পরিপূর্ণ কল্যাণকে দেশের সর্ব্বসাধারণের জীবনে পরিব্যাপ্ত করার দায়িত্ব, মুক্ত ভারতের সকল নরনারীর। একদা সভাসমিতিতে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করাই আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সেদিন অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য, অনাহার ও দারিদ্র্যের সমুদয় দায় ইংরেজ স্কন্ধে চাপিয়ে আমরা আপন কর্ত্তব্য সমাপ্ত করেছি। কিন্তু আজ ইতিহাসের পট পরিবর্ত্তন হয়েছে, আমাদের অন্নাভাব, আমাদের বস্ত্রাভাব, আমাদের স্বাস্থ্যহীনতা, আমাদের নিরক্ষরতা প্রভৃতি সমস্যার জন্য দোষারোপের আর কোন পাত্র নেই। প্রতিকারের জন্যও আর কারো মুখের পানে চাইবার জো রইল না। এই পুঞ্জীভূত জাতীয় গ্লানি মোচন করবার দায়িত্ব আজ হতে একান্তভাবে এই স্বাধীন ভারতের সকল নরনারীর।

আমাদের দুরূহ কর্ত্তব্যসাধনে দেশের আপামর সাধারণের অকুণ্ঠিত সহযোগিতার প্রয়োজন আছে। দেশ অর্থ তো খানিকটা মাটি নয়। যে ভারতবর্ষকে আমরা মাতৃরূপে কল্পনা করেছি সে তো ভূগোলের পাতার মধ্যে নয়,—মানুষের জীবনের মধ্যে এই বৃহৎ ভূখণ্ডের অগণিত নরনারীর জীবনকে কেন্দ্র করে সে আমাদের ধ্যানের মধ্যে জন্মলাভ করেছে। এই কোটি কোটি নরনারীকে দিতে হবে অন্ন, দিতে হবে বীর্য্য, দিতে হবে জ্ঞান, দিতে হবে জীবনে বাঁচবার আনন্দ। সে কাজ কোন ব্যক্তিবিশেষের নয়,—সে কাজ সকলের। নেতাদের পরিকল্পনা, কর্ম্মীদের রূপ। নেতার চেয়ে কর্ম্মীর গুরুত্ব কম নয়। এই দুইয়ের সম্মিলিত সহযোগিতাই গড়ে উঠে জাতি, সমৃদ্ধ হয় দেশ, সার্থক হয় স্বাধীনতা।

আজ স্বাধীনতা শব্দটির প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে আমাদের সচেতন হওয়া প্রয়োজন। ১৯২১ সালের কথা মনে আছে। স্বরাজ কথাটা সে সময়ে বহু প্রচলিত হয়।

অথচ লক্ষ করেছি স্বরাজ প্রাপ্তিতে কার কি লাভালাভ হবে, সে সম্পর্কে সাধারণের মধ্যে বহু হাস্যকর ধারণা ছিল। স্বাধীনতা সম্পর্কেও যেন অনুরূপ অসম্ভব অবাস্তর প্রত্যাশা দ্বারা আমরা বিড়ম্বিত না হই। স্বাধীনতা লাভমাত্রই রাতারাতি দেশের দুঃখদুর্দ্দশা দূর হবে, দূর হবে খাদ্যাভাব, দূর হবে অনশন ও অনটন—এমন দুরাশা যাঁরা করেন আশাভঙ্গজনিত মনস্তাপ তাদেব পক্ষে অনিবার্য্য। স্বাধীনতা ম্যাজিকের যাদুদণ্ড নয়।

আজ যাঁরা রাষ্ট্র পরিচালনার অধিকার লাভ করলেন, তাঁদের উপরে রইল সর্ব্বসাধারণের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নয়ন পরিকল্পনার ভার। আর সর্ব্বসাধারণের উপর রইল অবিচলিত নিষ্ঠায় ও অকুণ্ঠিত সহযোগিতার সেবার দ্বারা, কর্ম্মের দ্বারা দেশকে উন্নত করবার দায়িত্ব। আমাদের সমস্যা বহুবিধ; তার সমাধান সময়, শ্রম, ধৈর্য্য ও সুনিয়ন্ত্রিত কর্ম্মপদ্ধতি সাপেক্ষ।

একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, যে-কোন পরিকল্পনাকে সার্থক করতে হলে সর্ব্বপ্রথমে প্রয়োজন তার উপযোগী একটি শান্ত ও সংযত আবহাওয়া। স্বরাজ ও রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা অব্যাহত না রইলে কোন জনহিতকর কাজই আরম্ভ বা শেষ করা সম্ভব নয়। কিন্তু দেশের জনসাধারণের সহায়তা ব্যতীত দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা সম্ভব নয়। নাগরিকদের মনে যদি কর্ত্তব্যবোধ, ধর্ম্মবোধ, ন্যায়-অন্যায় বোধ যথোচিতরূপে জাগ্রত না থাকে, রাষ্ট্রকে যদি সক্রিয় সহযোগিতা দ্বারা সমাজ-বিরোধী অপকার্য্য নিবারণে সাহায্য না করে, তবে বৃহত্তম পুলিশ বাহিনী এবং ফৌজদারী দণ্ডবিধির সমুদয় ধারা প্রয়োগ করেও দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। স্বাধীন ভারতের নাগরিক হিসাবে প্রত্যেক ভারতবসীর কর্ত্তব্য দেশে এমন একটি শান্তি ও শৃঙ্খলাপূর্ণ পরিবেশের সৃষ্টি করা—যা' আমাদের জাতিগঠনমূলক বিভিন্ন পরিল্পনাকে নির্ব্বিঘ্নে প্রয়োগের সাহায্য করবে। গতকল্যকার স্বাধীনতা উৎসবে হিন্দু-মুসলমানের যে প্রীতি ও মিলন স্থাপিত হয়, তা দেশের এই শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সাহায্য করবে। বিগত এক বৎসরকাল ধরে সাম্প্রদায়িকতার যে বিষ আমাদের জাতীয় জীবনকে জর্জ্জরিত করেছে, স্বাধীনতার প্রারম্ভে তা বিলীন হয়ে গেল—এ অত্যন্ত আশার কথা। এ মিলন যাতে স্থায়ী হয়, কোন অবস্থাতে যাতে ভেঙ্গে না যায়, এখন থেকে আমাদের সে বিষয়ে অবহিত হতে হবে।

আজকের এই নূতন পরিবেশের মধ্যে আমাদের সকলের কাজের রূপ ও উদ্দেশ্য পরিবর্ত্তিত হয়েছে। এখন যিনি যে পদে, যে কর্ম্মক্ষেত্রে এবং যে দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন, তাঁর কর্ম্ম ও দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালিত হলে তার ফল প্রতিফলিত হবে দেশের বৃহত্তর কল্যাণের মধ্যে।

আজ আমাদের স্বাধীন ভারতের নব-জীবনের প্রারম্ভে স্বাধীন নরনারী সকলকে এই কর্ম্মের দীক্ষাই নিতে হবে। কোন সম্প্রদায়ের বিভেদ, ধর্ম্মের বাধা, মতবাদের বিরোধ নয়—জাতি, ধর্ম্ম ও মত নির্ব্বিশেষে সকল প্রদেশের নরনারীকে গ্রহণ করতে হবে ব্রত। বহু সহস্র বৎসরের আমাদের এই প্রাচীন ভারতবর্ষে কত পতন-অভ্যুদয়—বন্ধুর-পন্থা পার হয়ে আজও অম্লান রেখেছে তার সংস্কৃতির ধারা। এই সংস্কৃতির উত্তরবাহক আমরা; আমরা গড়ব নূতন ভারতবর্ষ —যে ভারতবর্ষ সম্পদে, সমৃদ্ধিতে, শিক্ষায় ও শান্তিতে মহীয়ান। যে ভারতবর্ষ পৃথিবীকে নূতন আলোকের সন্ধান দেবে, দেবে নূতন বাণী নূতন পথের ইঙ্গিত, দেবে মহামানবের মিলন পথের সন্ধান। তার জন্য আসুন আমরা প্রস্তুত হই; হিন্দু-মুসলমান, জৈন-পার্শিক মায়ের সন্তান যে যেথানে আছ সবাই এসে মিলিত হই—

"এস ব্রাহ্মণ শুচী করি মন
ধর হাত সবাকার
এস হে পতিত হোক অপনীত
সব অপমান ভার।
মার অভিষেকে এস এস ত্বরা
মঙ্গল ঘট হয়নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র করা
তীর্থ নীরে
এই ভারতের মহামানবের
সাগর তীরে॥"

শ্রীআলামোহন দাসের বাণী

["হিন্দুস্থান" হইতে উদ্ধৃত]

ভারতের স্বাধীনতা লাভের এই প্রথম দিবসে আজ বহু কথাই আমার মনে হচ্ছে। আমাদের এই স্বাধীনতা লাভ একটা আকস্মিক ঘটনা নয়, বিশ্ব-মানবের গতানুগতিক রীতি অনুযায়ী আরম্ভ করা একটা সশস্ত্র অভিযান কিম্বা যুদ্ধের ফলস্বরূপ আমরা এই স্বাধীনতা লাভ করি নাই—এই স্বাধীনতার পশ্চাতে রয়েছে একটা বিশাল জাতির দুই শতাব্দীব্যাপী অভিযান, অনুভূতি, সঙ্কল্প, সাধনা, আত্মত্যাগ এবং সিদ্ধির বিচিত্র, অপূর্ব্ব ও রোমাঞ্চকর ইতিহাস।

স্বাধীনতা লাভের যে আনন্দ তার চাইতেও মহত্তর আনন্দে আমার প্রাণ পুলকিত হয়ে উঠেছে এই ভেবে যে, এই সিদ্ধির বীজ সর্ব্বপ্রথমে রোপিত

হয়েছিল এই বাংলারই বুকে, আমাদেরই অগ্রগামী দেশপ্রাণ বাঙ্গালীর দ্বারা। শুধু তাই নয়, আত্মত্যাগ, সাধনা, সঙ্কল্প, অনুভূতি এবং অভিযান প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বাঙ্গালীই সমগ্র ভারতকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে—আজিকার ১৫ই আগষ্টের এই যুগান্তকারী শুভদিন পর্য্যন্ত।

তাই আজ মনে পড়ছে বাংলার সেই মহাঋষির কথা—যিনি জননী জন্মভূমির বরাভয়প্রদা রণরঙ্গিণীরূপ ভারতবাসীর মানসচক্ষে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। যিনি দিয়াছিলেন ভারতবাসীকে সাধনার সারথীস্বরূপে, আত্মিক অভিযানের দেবদত্ত মহা অস্ত্রস্বরূপে—অমোঘ শক্তির অব্যর্থ কবচ, বিজয়মন্ত্র—"বন্দে মাতরম্।"

আসুন, আজ আমরা সকলে কৃতজ্ঞচিত্তে স্বাধীন ভারতের মন্ত্রদাতা আদিগুরু এই অমর দার্শনিকের অমরত্বকে প্রণিপাত করি।

তারপর মনে পড়ছে বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রের প্রাচীন, অধুনিক, ছোট-বড়, বিখ্যাত, অখ্যাত অসংখ্য কবি এবং গীত-শিল্পীগণের কথা—যাঁরা ছড়ায়, ছন্দে, সুরে-তালে ভাবে-ইঙ্গিতে পরাধীনতার ব্যথাকে মথিত করে জাতির প্রাণে এমন অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি করেছিলেন, যার ফলে সমগ্র ভারতের চিত্তে অভিযানের অন্তরালে কর্ত্তব্যের অনুভূতি জাগ্রত হয়েছিল।

বাঙ্গালী কবির একটি মাত্র কথা "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে?" বাঙ্গালীকে স্বাধীনতার সঙ্কল্পে অটল, অনিদ্র এবং অস্থির করে তুলেছিল। স্বাধীনতার জন্য এই যে আত্মিক সংগ্রাম এতে বিজয়ের বিলম্ব দেখে পাছে বাঙ্গালী হতাশ হয়ে পড়ে তাই বাংলার কবিগুরু ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়েছিলেন "ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে, ততই মোদের বাঁধন টুটবে।"

বাংলার ভাষা এবং সাহিত্য শুধু স্বাধীনতারই স্বপ্নে ভরা। বাংলার কবি, গায়ক, কথা-শিল্পী, সাধক, সাংবাদিক সকলেই স্বাধীনতার রসই পরিবেশন করে এসেছেন, স্বাধীনতার সাধনায় সহযোগিতা করে এসেছেন।

আসুন আজ আমরা এই শুভদিনে বঙ্গবাণীর বিগত এবং বর্ত্তমান সকল সাধককেই আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

সাধকগণের পরেই আমার মনে পড়েছে অমর সহীদগণের কথা, সঙ্গে সঙ্গে আমার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে। শুধু আবেদনে নিবেদনে যে স্বাধীনতা লাভ হবে না—অকাতরে রক্তদিয়ে স্বাধীনতা অপহরণকারীদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে, স্বাধীন হ'বার যোগ্যতা আমাদের অবশ্য আছে—এই সত্য ভারতের বুকে বাঙ্গালীই প্রথমে উপলব্ধি করেছিল বলে গর্ব্বে আমার বুক ভরে উঠেছে।

একটা দেশের জনসংখ্যাই তার যোগ্যতা এবং শক্তির পরিমাপক নয়। দেশে বীরের সংখ্যা কত তার উপরই দেশের এবং জাতির যোগ্যতা এবং শক্তি নির্ভর

করে। এই যে খ্যাত এবং অখ্যাত বাঙ্গালী বীর ভারতের জরাগ্রস্থ, জীবন্মৃত-যৌবনকে পথ দেখিয়ে বিপ্লবের অগ্নিধ্বজা উড়িয়ে নিজেদের বুকের রক্তে ভারতের ভাবী স্বাধীনতার বেদী রঞ্জিত করে গেল, তাদের বাঙ্গালী কোন দিনই ভুলতে পারবে না। বিদেশীর লেখা ইতিহাসে "অসামরিক এবং যুদ্ধকার্য্যে অযোগ্য" বলে অভিহিত বাঙ্গালীর সন্তানই ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে। আজও যারা বলে থাকে, বিনা রক্তপাতেই ভারত স্বাধীনতা লাভ করেছে, তারা হয় মূর্খ না হয় অন্ধ, নতুবা তাবা ভাবের ঘরে চুরি করে দার্শনিক সেজে বেড়াচ্ছে। যদি দলগত মর্য্যাদাকে স্বাধীন ভারতের গদীতে প্রতিষ্ঠিত করবার অভিসন্ধি না থাকে, তা হলে আজ একদল লোক কি করে অমর শহীদ ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকীর তপ্ত রক্তের ফল্গুধারার সঙ্গে ভারতের নবীন-শিবাজী নেতাজী স্থভাষচন্দ্রের অমৃত-শোণিত বন্যার সম্মিলিত স্রোতকে উপেক্ষা করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংসের কারণ অন্যত্র খুঁজে বেড়ায়। ভারতের শহীদ-সম্রাট স্থভাষচন্দ্রের বহির্ভারতীয় বজ্রাঘাত এবং ভারতের আভ্যন্তরীণ রক্ত-তান্ত্রিক তরুণ-তরুণীর মারণযজ্ঞের সংযুক্ত প্রভাবই যে ব্রিটিশ কেশরীর সাম্রাজ্যস্পৃহা এবং শোষণস্বপ্ন চিরতরে ভেঙ্গে গিয়েছিল একথা ভারতের অপর কেউ না মেনে নিলেও বাংলার তরুণ-তরুণীরা অস্বীকার করবে না।

যে শহীদের রক্তে বাংলার তথা ভারতের এমন কি বহির্ভারতের মাটী লাল হয়ে গেল, তার শক্তি কত। তার তাৎপর্য্য কি, তার পরিণতি কোথায়, সে কথা চড় খেয়ে যারা চড় চুরি করে তারা না বুঝতে পারে, কিন্তু চতুর কূটনৈতিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসাধক ব্রিটিশ জাতির চিন্তনায়কেরা বাঙ্গালী শহীদের আত্মত্যাগ দেখেই বুঝতে পেরেছিল যে, ভারতের শাসন এবং শোষণ আর বেশীদিন চল্‌বে না।

ভারতের স্বাধীনতার জন্য যে ধর্ম্মযুদ্ধ এতদিন চলেছিল, তার সৈনিক এবং অস্ত্রের সংখ্যা পেশাদার রাজনীতিক এবং তাদের বক্তৃতার চাইতে কম হতে পারে; কিন্তু ব্রিটিশের লৌহ-শৃঙ্খলকে ছিন্ন করেছে এই শহীদেরাই—যারা আজ লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গিয়েছে।

আসুন আজ আমরা সকলে ভারতের ধর্ম্মযুদ্ধের এই অমর শহীদগণের স্মৃতির উদ্দেশ্যে সর্ব্বান্তকরণে আমাদের শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি ও কিছুক্ষণ একান্ত মনে এই প্রার্থনা এবং সঙ্কল্প করি যে আমরা জীবন থাকতে এই অমর শহীদগণের স্মৃতি-পূজা কিছুতেই বন্ধ হতে দিব না। এই নবলব্ধ স্বাধীনতা নির্ব্বিঘ্নে রক্ষা করবার জন্য তাঁদের বীরত্ব এবং ত্যাগের আদর্শ এবং সাধনাকে জাতির জীবনে চিরজাগ্রত করে রাখব।

আজ স্বাধীনতার প্রথম দিবস, কাজেই আনন্দের দিন বটে। কিন্তু যা আমাদের অবশ্যপ্রাপ্য যা আমাদের জন্মগত, যা আমাদের "হকের দাবী" তা আদায়ের সম্ভাবনা ঘটিয়া উঠে নাই। বরং প্রভূত ক্ষোভের কারণ আছে এই ভেবে যে আজ ব্রিটিশের কূটনীতির ফলে আমাদেরই জাতির একটা বিরাট অংশ রাতারাতি "পরদেশী" হয়ে গেল।

সত্যই আজিকার দিনে আমাদের যে সকল ভাইবোন ও আত্মীয়স্বজন আইনের বলে দেশান্তরী হয়ে রইল, তাদের মানসিক অবস্থার কথা ভাবলে বিরহের ব্যথা বুকটাকে আচ্ছন্ন করে তোলে। কিন্তু আমাদের সেই বিচ্ছিন্ন পরিজনদের সাহায্য করবার জন্য যে যোগ্যতার আবশ্যক হবে, তা অর্জ্জন করতে হলে আমাদের এই বিরহের বুকেই সংযত আনন্দের ঘৃত-প্রদীপ প্রজ্বলিত করতে হবে। এই আনন্দ সাধকের আনন্দ, কর্ম্মযোগীর আনন্দ। শৃঙ্খল-মোচনের সুযোগে পাশ্চাত্যের অনুকরণে অযথা আড়ম্বর-উল্লাস এবং আস্ফালনে মত্ত হয়ে, স্বার্থপর অলস ও নিরুদ্বেগ জীবনের স্বপ্ন রচনা করলে এত সাধের স্বাধীনতাকে সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে না, হবে না, হবে না।

স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গেই স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের জন্যই হিমালয়প্রমাণ দায়িত্ব, সমুদ্রপ্রমাণ কর্ত্তব্য এবং জীবনব্যাপী পরিশ্রম অপেক্ষা করে রয়েছে। এই স্বাধীনতা আমাদের জীবনে বাংলার গগনচুম্বী তালগাছের অঙ্কুরের মতই একটি বিশাল ভবিষ্যতের এবং কল্যাণের সম্ভাবনা বহনকারী শিশুবৃক্ষ স্বরূপ। রোপণকারী এর ফল ভোগের প্রত্যাশায় ব্যাকুল হলে নিষ্ঠা, যত্ন এবং সেবার অভাবে সর্ব্ব সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে।

এই স্বাধীনতাকেও সার্থক এবং সফল করতে হলে আমাদের জাতীয়, সামাজিক এবং ব্যক্তিগত জীবনের সর্ব্বপর্য্যায়ে অকুণ্ঠচিত্তে অত্যাবশ্যকীয় সংস্কার সাধন করতে হবে। প্রাচীনের মধ্যে যা গ্রহণযোগ্য তাকে নির্ব্বিকারচিত্তে বর্জ্জন এবং গ্রহণ করতে হবে। বিশেষতঃ হিন্দু সমাজের কি ভণ্ডামী, কি ভুল, কি গ্লানি এবং কি দৌর্ব্বল্যের জন্য আমরা এতদিন পরাধীনতার নরক-যন্ত্রণা ভোগ করলাম তা বৈজ্ঞানিকসূত্রে অনুসন্ধান করে সেই ভুল, সেই গ্লানি এবং সেই দৌর্ব্বল্যকে নির্ম্মম হস্তে আমূল উৎপাটিত করে অতীতের গর্ভে বিসর্জ্জন দিতে হবে। নবীন ভাবধারা এবং রীতি-নীতি, পন্থা-প্রণালীর মধ্যে যা সত্যই গ্রহণ-যোগ্য তাকেও সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষা করে সার্ব্বজনীন ভাব গ্রহণ করতে হবে।

আজ আমরা যে স্বাধীনতা লাভ করেছি তা সম্পূর্ণ এবং বিশুদ্ধ স্বাধীনতা নয়। কারণ আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সংস্পর্শ মুক্ত হতে পারি নাই। কিন্তু আজই আমাদের পক্ষে সেই সংস্পর্শ যাহা এক প্রকার শৃঙ্খল, তাহা হতে মুক্ত

হওয়া সম্ভব নয়। বিশুদ্ধ স্বাধীনতা বা Absolute Independence রক্ষা করতে হলে জাতীয় জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে যে যোগ্যতা, যে স্বচ্ছলতা, যে সজীবতা, যে শক্তি আবশ্যক আমাদের তা নাই। এই যোগ্যতা অর্জ্জনের দায়িত্ব শুধু জাতীয় গভর্ণমেণ্টের একার নয়। ভারতের প্রত্যেক শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত এবং বিত্তশালী নাগরিককেই এই দায়িত্ব, এই কর্ত্তব্য, এই সাধনা মাথা পেতে নিতে হবে। কারণ পরোক্ষভাবে জনগণের এই প্রতিনিধিরাই হবেন ভারতের সেবক, পালক এবং শাসনকর্ত্তা। কিন্তু এই অগণিত জনগণ যতদিন দারিদ্র্যে জর্জ্জরিত, রোগে ক্লিষ্ট, অশিক্ষায় অন্ধ এবং আলস্যে নির্জ্জীব হয়ে থাকবে, ততদিন শুধু গভর্ণমেণ্টই নয় সমাজের মধ্যে যাঁরা সম্ভ্রান্ত, যাঁরা সুখী, যাঁরা ধনী, যাঁরা শিক্ষিত, তাঁরাও এই দেশের অধিবাসী বলে কিছু দাবী করতে পারবেন না।

সহরবাসী ধনী টাকার জোরে বড় বড় ডাক্তার ডাকবেন, আর গ্রামবাসী গরীব ডাক্তার, ঔষধ এবং পথ্য এই তিনটিরই অভাবে মরে যাবে, এ অবস্থার পরিবর্ত্তন না হলে, স্বাধীনতার কোন মানে থাকবে না।

যাঁরা ধনী তাঁরা তাঁদের পুঞ্জীকৃত নিষ্ক্রিয় অর্থের দৌলতে স্বাধীনতার ধ্বজা উড়িয়ে বিশ্ববাসীকে চমক লাগাবেন, আর চাষী শ্রমিকরা অর্থনৈতিক অন্যায় বণ্টনের জন্য, খেতে পাবে না এ অবস্থা আর চলতে পারবে না। বড় লোকের ছেলে বিলেতে পড়তে যাবে আর চাষী-মজুরদের ছেলে লিখতে পড়তেও শিখতে পাবে না এ রকম হলে চলবে না।

ভারতবর্ষকে যদি আমরা অতি শীঘ্র পৃথিবীর মধ্যে সব বিষয়ে আদর্শ রাষ্ট্র করে গড়ে তুলতে না পারি, তা হলে বুঝব যে অগণিত শহীদের আত্মত্যাগ ব্যর্থ হয়ে গেছে। তথাকথিত ধনী-গরীব, শিক্ষিত-নিরক্ষর, অভিজাত-ইতর ইত্যাদি অন্যায় এবং অবান্তর পার্থক্য দূরীভূত করবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে যেমন প্রাণপাত পরিশ্রম করতে হবে, তেমনি জনসাধারণের প্রত্যেক স্বচ্ছল এবং বিত্তশালী নাগরিককেও রাষ্ট্রের সেবায় সর্ব্বস্ব দান করতে হবে।

এই কাজ করবার জন্য বিদেশ থেকে কোনও নীতি, শ্লোগান কিংবা ঝাণ্ডা আমদানী করবার দরকার নাই। শুধু একটিমাত্র মন্ত্র, একটি মাত্র সঙ্কল্প বুকে বেঁধে নিয়ে কাজে লেগে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। সেটী হচ্ছে এই—চাষা হোক, মজুর হোক, মেথর হোক, মুচী হোক, কুলী বা কামার হোক, আর বাবু হোক, বামুন হোক, ধনীর দুলাল হোক কিম্বা রাজার কুমার হোক, আমার দেশবাসীমাত্রই আমার ভাই, আমার আত্মীয়, আমার 'স্বজাত'। শিক্ষায়, সংস্কারে, কর্ম্মে, সাধনা, চরিত্রে এদের প্রত্যেককে উন্নত করাই হচ্ছে আমার জীবনের ব্রত। কারণ, এই অগণিত, বিচিত্র, বিভিন্ন ভাগ্যের পুত্তলি জনগণকে

নিয়েই হল আমার জাতি ; এরাই হল মহামান্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের "নাগরিক"। আমিই তারা, আর তারাই আমি। আমাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। আমরা একই মাতার সন্তান, মাতৃস্তন্যের সব অধিকারী ; এই হবে নবীন স্বাধীন ভারতের সাধনা। এর জন্য চাই কর্ম্মী এবং সাধক।

তোমরা অর্থাৎ ভারতের তথা বাংলার তরুণ-তরুণীরা আজও জননী জন্মভূমির সৈনিক গৌরবের অধিকারী হয়ে আছ। এই গৌরবকে এবং অধিকারকে সম্বল করে "বন্দে মাতরম্" মহামন্ত্র বুকে বেঁধে, সুখদুঃখ, রৌদ্রবৃষ্টিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সমগ্র জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করতে হবে তোমাদের।

তোমার দেশের চাষী, তোমার দেশের শ্রমিক, তোমার দেশের কুলী, তোমার দেশের গরীব, স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলকেই শিখিয়ে পড়িয়ে, খাইয়ে-দাইয়ে, ধুয়ে-মুছে তাদের যোগ্যতা, স্বাস্থ্য, সাহস, স্বচ্ছলতা এবং সদাচারের অধিকারী করতে হবে। এই হচ্ছে এখন দেশের সম্মুখে আসল এবং জরুরী কাজ। এতে দেরী সইবে না। এ ছাড়াও রাষ্ট্রীয় এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও বহু কাজ পড়ে আছে, যা তোমাদের সাহায্য না পেলে গভর্ণমেণ্ট কিম্বা পুলিশ করে উঠতে পারবে না।

ঐ যে সব মুনাফাখোরের দল, যারা ব্রিটিশের আইনের জাল কেটে জনগণের লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা লুঠ করে নিয়ে বেরিয়ে গিয়ে আজও দেশের বুকে নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে। যাদের জন্যই লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে এবং বস্ত্রাভাবে মারা গেল, যাদের কালবাজারী ব্যবসায়ের ফলে আজও দেশের লক্ষ লক্ষ লোক প্রায় নিরন্ন এবং বস্ত্রাভাবে দিন কাটাচ্ছে এদের আজও সাজা হোল না। এই দিনে-ডাকাতের দলের মধ্যে যে শুধু পেশাদার বণিক এবং ঠিকাদাররাই ছিল তা নয়। ভাবতে লজ্জায় মাথা হেঁট হয় যে, যাদের হাতে সমগ্র জাতির জনগণের শাসন, পালন এবং কল্যাণের ভার ন্যস্ত ছিল, সেই বাংলার লীগ মন্ত্রিমণ্ডলীর ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারীরা, (লাট-বেলাট, মন্ত্রী, সদস্য সেক্রেটারী, ইন্সপেক্টর এমন কি তাদের কুল-ললনারা) পর্য্যন্ত ঐ কালবাজারীদের পৃষ্ঠপোষক এবং সহযোগী হয়ে, বাংলার ধনভাণ্ডার থেকে কোটি কোটি টাকা বিনা হিসাবে চুরি করে নিয়ে চলে গেল। এই যে শাসনের নামে পুকুর-চুরি ক'রে আজ যারা সীমার বাইরে সরে পড়েছে, দরকার হলে আন্তর্জাতীয় বিচারালয়ের সাহায্যে এদের গ্রেপ্তার করে উপযুক্ত শাসনের ব্যবস্থা করে ন্যায় এবং ধর্ম্মের মান রাখতে হবে। বর্ত্তমান স্বাধীন বাংলার গভর্ণমেণ্ট যদি এ কাজ করতে সাহস না পায় তা-হলে সমগ্র ভারতের তরুণ তরুণীকে জাগ্রত এবং একত্র করে এই ভদ্র তস্করের দলটাকে উপযুক্ত সাজা দিতে হবে। তা না হলে এই স্বাধীনতা বৈরাগীর আখড়ার গর্জ্জন এবং প্রহসন ছাড়া আর কিছুই হবে না। যে গভর্ণমেণ্ট

এ সব চোরকে সাজা দিতে অনিচ্ছুক কিংবা অপারগ হবে সে গভর্ণমেণ্টকে অবিলম্বে বদলে ফেলতে হবে। দরকার হলে তার জন্যে তোমাদের আবার হাজারে হাজারে শহীদ হতে হবে।

আজকার এই ১৫ই আগষ্ট শুধু ভারতের নয়—সমগ্র বিশ্বের একটা স্মরণীয় দিন।

নিজের দৌর্ব্বল্য এবং ত্রুটির ফলে ভারতবর্ষই একদা এই সাম্রাজ্যবাদের ইন্ধন যুগিয়েছিল। আজ ভুললে চলবে না যে, যেদিন একতার অভাবে বিশাল ঐরাবতমথসদৃশ ভারতবর্ষ শৃগালসদৃশ ইউরোপীয় বণিক এবং নাবিকের একটি ক্ষুদ্র বাহিনীর হস্তে বন্দী হয়েছিল, সেইদিনই আগুন লেগেছিল সমগ্র এশিয়া এবং আফ্রিকারও কপালে।

আজ ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশের শৃঙ্খল খুলে গিয়েছে বটে কিন্তু শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদীর শৃঙ্খল এবং প্রভাব থেকে সমগ্র এসিয়া ও আফ্রিকা আজও মুক্ত হয় নাই। আজ সমগ্র এসিয়া ভারতেরই মুখপানে চেয়ে আছে। ভারতের সম্মুখে আজ বিরাট দায়িত্ব। সে দায়িত্ব কি? সে হচ্ছে সমগ্র এসিয়া, এসিয়া কেন—সমগ্র বিশ্বকে সাম্রাজ্যবাদীর শাসন এবং শোষণ থেকে মুক্ত করা। এ হেন মহান বিরাট এবং সার্থক কর্ত্তব্য যে ভাগ্যবান জাতির সম্মুখে পড়ে রয়েছে, সে জাতির তরুণ-তরুণীদের কি এ জীবনে বিরাম, বিশ্রাম এবং বিলাসের অবকাশ কিংবা অধিকার আছে? মনের কান পেতে শোন, ঐ নেপথ্য হতে ভারতের লক্ষ শহীদের অমর আত্মার হুঙ্কার করে বলছে—অবকাশ নাই! অধিকার নাই। "বন্দেমাতরম্" "জয় হিন্দ"

"সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান,
সঙ্কটের কল্পনাতে হয়ো না ম্রিয়মাণ।
মুক্ত করো ভয়,
আপনা মাঝে শক্তি ধরো নিজেরে করো জয়।
দুর্বলেরে রক্ষা করো দুর্জনেরে হানো,
নিজেরে দীন নিঃসহায় যেন কভু না জানো।
মুক্ত করো ভয়,
নিজের পর করিতে ভর না রেখো সংশয়।
ধর্ম যবে শঙ্খ-রবে করিবে আহ্বান,
নীরব হয়ে নম্র হয়ে পণ করিয়ো প্রাণ।
মুক্ত করো ভয়,
দুরূহ কাজে নিজের দিয়ো কঠিন পরিচয়।" —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সপ্তম অধ্যায়

স্বদেশীযুগের কয়েকটি গান

(১)

অয়ি ভুবন-মনোমোহিনী,
অয়ি নির্মল-সূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী,
জনক-জননী-জননী ॥
নীল-সিন্ধুজল-ধৌত-চরণতল,
অনিল-বিকম্পিত-শ্যামল-অঞ্চল,
অম্বর-চুম্বিত-ভাল-হিমাচল,
শুভ্র-তুষার-কিরীটিনী ॥
প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
প্রথম সামরব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে
জ্ঞানধর্ম কত কাব্যকাহিনী ।
চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য,
দেশ-বিদেশে বিতরিছ অন্ন,
জাহ্নবী-যমুনা-বিগলিত-করুণা
পুণ্যপীযূষ-স্তন্যবাহিনী ॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(২)

সার্থক জনম আমার
জন্মেছি এ দেশে ।
সার্থক জনম মা গো,
তোমায় ভালবেসে ॥
জানিনে তোর ধন রতন,
আছে কি না রাণীর মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায়
তোমার ছায়ায় এসে ॥

কোন বনেতে জানিনে ফুল
গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন গগনে ওঠে রে চাঁদ
এমন হাসি হেসে॥
আঁখি মেলে তোমার আলো
প্রথম আমার চোখ জুড়ালো,
ঐ আলোতেই নয়ন রেখে
মুদব নয়ন শেষে॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৩)

মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।
ঘরের হয়ে পরের মতন
ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে॥
প্রাণের মাঝে থেকে থেকে
আয় বলে ওই ডেকেছে কে,
গভীর স্বরে উদাস করে,
আর কে কারে ধ'রে রাখে॥
যেথায় থাকি যে যেখানে
বাঁধন আছে প্রাণে প্রাণে
প্রাণের টানে টেনে আনে,
প্রাণের বেদন জানে না কে॥
মান অপমান গেছে ঘুচে,
নয়নের জল গেছে মুছে,
নবীন আশে হৃদয় ভাসে
ভাইয়ের পাশে ভাইকে দেখে॥
কত দিনের সাধন ফলে
মিলেছি আজ দলে দলে,
ঘরের ছেলে সবাই মিলে
দেখা দিয়ে আয় রে মাকে॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৪)

ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে,
ততই বাঁধন টুটবে,
মোদের ততই বাঁধন টুটবে।
ওদের আঁখি যতই রক্ত হবে,
মোদের আঁখি ফুটবে,
ততই মোদের আঁখি ফুটবে।
আজকে যে তোব কাজ করা চাই,
স্বপ্ন দেখার সময় তো নাই,
এখন ওরা যতই গর্জাবে ভাই,
তন্দ্রা ততই ছুটবে,
মোদের তন্দ্রা ততই ছুটবে।
ওরা ভাঙতে যতই চাবে জোরে,
গড়বো ততই দ্বিগুণ ক'রে,
ওরা যতই রাগে মারবে রে ঘা
ততই যে ঢেউ উঠবে,
ওরে ততই যে ঢেউ উঠবে।
তোরা ভরসা না ছাড়িস কভু,
জেগে আছেন জগৎ-প্রভু,
ওরা ধর্ম যতই দলবে, ততই,
ধুলায় ধ্বজা লুটবে,
ওদের ধুলায় ধ্বজা লুটবে

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৫)

আমার সোনার বাঙলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী ॥
ও মা, ফাল্গুনে তোর আমের বনে:
ঘ্রাণে পাগল করে, (মরি হায়, হায় রে,)
ও মা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে,
কি দেখেছি মধুর হাসি ॥

কি শোভা কি ছায়া গো
কি স্নেহ কি মায়া গো
কি আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে,
নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে
লাগে সুধার মতো, (মরি হায়, হায় রে,)
মা, তোর বদনখানি মলিন হ'লে,
আমি নয়নজলে ভাসি॥
তোমার এই খেলাঘরে
শিশুকাল কাটিল রে,
তোমারি ধূলামাটি অঙ্গে মাখি'
ধন্য জীবন মানি।
তুই দিন ফুরালে সন্ধ্যাকালে
কি দীপ জ্বালিস্ ঘরে, (মরি হায়, হায় রে.)
তখন খেলাধূলা সকল ফেলে,
তোমার কোলে ছুটে আসি॥
ধেনু-চরাই তোমার মাঠে
পারে যাবার খেয়াঘাটে,
সারাদিন পাখী-ডাকা ছায়ায় ঢাকা
তোমার পল্লীবাটে,
তোমার ধানে-ভরা আঙিনাতে
জীবনের দিন কাটে (মরি হায়, হায় রে,)
ও মা, আমার যে ভাই তারা সবাই,
তোমার রাখাল তোমার চাষী॥
ও মা, তোর চরণেতে
দিলেম এই মাথা পেতে,
দে গো তোর পায়ের ধূলা সে যে আমার
মাথার মাণিক হবে।
ও মা, গরীবের ধন যা আছে তাই
দিব চরণ তলে, (মরি হায়, হায় রে,)
আমি পরের ঘরে কিনব না আর।
ভূষণ ব'লে গলার ফাঁসি॥ —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৬)

মা গো, যায় যেন জীবন চলে
শুধু জগৎ-মাঝে তোমার কাজে
'বন্দে মাতরম্‌' বলে।
আমার যায় যেন জীবন চলে।

যখন মুদে নয়ন করবো শয়ন
শমনের সেই শেষ জ্বালে,
তখন সবই আমার হবে আঁধার,
স্থান দিও মা ঐ কোলে।
আমার যায় যাবে জীবন চলে॥

আমার মান অপমান সবই সমান,
দলুক না চরণ-তলে।
যদি সইতে পারি মায়ের পীড়ন
মানুষ হবো কোন কালে?
আমার যায় যাবে জীবন চলে॥

লাল টুপি আর কাল কোর্ত্তা,
জুজুর ভয় কি আর চলে?
আমি মায়ের সেবায় রইবো রত,
পাশব-বলে দিক্‌ জেলে।
আমার যায় যাবে জীবন চলে॥

আমায় বেত মেরে কি মা ভুলাবে,
আমি কি মার সেই ছেলে?
দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি,
কে পালাবে মা ফেলে?
আমার যায় যাবে জীবন চলে॥

আমি ধন্য হব মায়ের জন্য
লাঞ্ছনাদি সহিলে।
ওদের বেত্রাঘাতে কারাগারে
ফাঁসিকাঠে ঝুলিলে।
আমার যায় যাবে জীবন চলে॥

যে মার কোলে নাচি, শস্যে বাঁচি,
তৃষ্ণা জুড়াই যার জলে ;
বল লাঞ্ছনার ভয় কার কোথা রয়,
সে মায়ের নাম স্মরিলে ?
আমার যায় যাবে জীবন চলে ॥
বিশারদ কয়, বিনা কষ্টে
সুখ হবে না ভূতলে।
সে তো অধম যে হয় সইতে রাজী
উত্তমে চায় মুখ তুলে।
আমার যায় যাবে জীবন চলে ॥—কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

(৭)

ধন-ধান্যে-পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা ;
ও যে স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবেনাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা কোথায় উজল এমন-ধারা
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ এমন কালো মেঘে !
সেথা পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে উঠি পাখীর ডাকে জেগে।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবেনাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।

এমন স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড় !
কোথায় এমন হরিৎ ক্ষেত্র আকাশ-তলে-মেশে !
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে !
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবেনাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।

পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী, কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখী,
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে,
তারা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে,
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবেনাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।

ভায়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ !
ও মা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি,
আমার এই দেশেতে জন্ম, যেন এই দেশেতেই মরি।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবেনাকো তুমি.
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

(৮)

ভারত আমার, ভারত আমার
যেখানে মানব মেলিল নেত্র ;
মহিমার তুমি জন্মভূমি মা,
এসিয়ার তুমি তীর্থক্ষেত্র।
দিয়াছ মানবে জগৎ-জননী,
দর্শন-উপনিষদে দীক্ষা ;
দিয়াছ মানবে জ্ঞান ও শিল্প,
কর্ম-ভক্তি-ধর্ম্ম-শিক্ষা।
ভারত আমার, ভারত আমার,
কে বলে মা তুমি কৃপার পাত্রী ?
কর্ম্ম-জ্ঞানের তুমি মা জননী,
ধর্ম্ম-ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী।

ভগবদ্গীতা গাহিল স্বয়ং
ভগবান যেই জাতির সঙ্গে ;
ভগবৎ-প্রেমে নাচিল গৌর
যে দেশের ধূলি মাখিয়া অঙ্গে।
সন্ন্যাসী সেই রাজার পুত্র
প্রচার করিল নীতির মর্ম্ম ;
যাদের মধ্যে তরুণ তাপস
প্রচার করিল 'সোঽহং' ধর্ম্ম।
ভারত আমার, ভারত আমার,
কে বলে মা তুমি কৃপার পাত্রী ?
কর্ম্ম-জ্ঞানের তুমি মা জননী,
ধর্ম্ম-ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী।

আৰ্য্য ঋষির অনাদি গভীর
উঠিল যেখানে বেদের স্তোত্র ;
নহ কি মা তুমি সে ভারতভূমি,
নহি কি আমরা তাদের গোত্র ?

তাদের গরিমা-স্মৃতির বর্ম্মে
চলে যাব শির করিয়া উচ্চ ;
যাদের গরিমাময় এ অতীত,
তারা কখনই নহে মা তুচ্ছ।

ভারত আমার, ভারত আমাব,
কে বলে মা তুমি কৃপার পাত্রী ?
কর্ম্ম-জ্ঞানের তুমি মা জননী,
ধর্ম্ম-ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী।

ভারত আমার, ভারত আমার,
সকল মহিমা হউক খর্ব্ব ;
দুঃখ কি যদি পাই মা তোমার
পুত্র বলিয়া করিতে গর্ব্ব ?

যদি বা বিলয় পায় এ জগৎ,
লুপ্ত হয় এ মানব-বংশ,
যাদের মহিমাময় এ অতীত,
তাদের কখনও হবে না ধ্বংস।

ভারত আমার, ভারত আমার,
কে বলে মা তুমি কৃপার পাত্রী ?
কর্ম্ম-জ্ঞানের তুমি মা জননী,
ধর্ম্ম-ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী।

চোখের সামনে ধরিয়া রাখিয়া
অতীতের সেই মহা আদর্শ,
জাগিব নূতন ভাবের রাজ্যে,
রচিব প্রেমের ভারতবর্ষ। ।
এ দেবভূমির প্রতি তৃণ পরে
আছে বিধাতার করুণা-দৃষ্টি,

এ মহাজাতির মাথার উপরে
করে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি।
ভারত আমার, ভারত আমার,
কে বলে মা! তুমি কৃপার পাত্রী?
কর্ম্ম-জ্ঞানের তুমি মা জননী,
ধর্ম্ম-ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী। —দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

(৯)

বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার আমার দেশ!
কেন গো মা তোর শুষ্ক বয়ান, কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ!
কেন গো মা তোর ধূলায় আসন,
কেন গো মা তোর মলিন বেশ!
সপ্তকোটি সন্তান যার ডাকে উচ্চে 'আমার দেশ'!
কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ,
সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন 'আমার দেশ',
উদিল যেখানে বুদ্ধ-আত্মা মুক্ত করিতে মোক্ষ-দ্বার,
আজিও জুড়িয়া অর্দ্ধ জগৎ ভক্তি-প্রণত চরণে যাঁর।
অশোক যাঁহার কীর্ত্তি ছাইল গান্ধার হতে জলধি-শেষ,
তুই কিনা মা গো তাদের জননী,
তুই কি না মা গো তাদের দেশ!
কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ,
সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন 'আমার দেশ'!
একদা যাহার বিজয় সেনানী, হেলায় লঙ্কা করিল জয়,
একদা যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারতসাগরময়,
সন্তান যার তিব্বত চীন জাপানে গঠিল উপনিবেশ,
তার কি না এই ধূলায় আসন, তার কি না এই ছিন্নবেশ?
কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ,
সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন 'আমার দেশ'!
উঠিল যেখানে মুরজমন্দ্রে নিমাইকণ্ঠে মধুর তান,
ন্যায়ের বিধান দিল রঘুমণি, চণ্ডীদাস গাহিল গান!
যুদ্ধ করিল প্রতাপাদিত্য, তুই তো না সেই ধন্য দেশ!
ধন্য আমরা যদি এ শিরায় থাকে তাঁদের রক্তলেশ।

কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ,
সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন 'আমার দেশ' !
যদিও মা তোর দিব্য আলোকে ঘেরে
আছে আজি আঁধার ঘোর,
কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর।
আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা, মানুষ আমরা, নহি তো মেষ।
দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ !
কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ,
সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন 'আমার দেশ'।

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

(১০)

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই !
দীন দুখিনী মা যে তোদের,
তার বেশী আর সাধ্য নাই :
সেই মোটা সুতোর সঙ্গে মায়ের
অপার স্নেহ দেখতে পাই ;
আমরা এমনি পাষাণ, তাই ফেলে ওই
পরের দোরে ভিক্ষে চাই।
ওই দুঃখী মায়ের ঘরে তোদের
সবার প্রচুর অন্ন নাই ;
তবু, তাই বেচে কাচ সাবান মোজা
কিনে করলি ঘর বোঝাই।
আয় রে আমরা মায়ের নামে,
এই প্রতিজ্ঞা করব, ভাই !
পরের জিনিস কিনব না, যদি
মায়ের ঘরে জিনিস পাই।

—রজনীকান্ত সেন

(১১)

কোন্ দেশেতে তরুলতা
সকল দেশের চাইতে শ্যামল ?
কোন্ দেশেতে চলতে গেলেই
দলতে হয় রে দূর্ব্বা কোমল ?
কোথায় ফলে সোনার ফসল,
সোনার কমল ফোটে রে ?
সে আমাদের বাঙলা দেশ,
আমাদেরই বাঙলা রে !
কোথায় ডাকে দোয়েল শ্যামা,
ফিঙে গাছে গাছে নাচে ?
কোথায় জলে মরাল চলে,
মরালী তার পাছে পাছে ?
বাবুই কোথা বাসা বোনে,
চাতক বারি যাচে রে ?
সে আমাদের বাঙলা দেশ,
আমাদেরই বাঙলা রে !
কোন্ ভাষা মরমে পশি
আকুল করি তোলে প্রাণ ?
কোথায় গেলে শুনতে পাব
বাউল সুরের মধুর গান ?
চণ্ডীদাসের রামপ্রসাদের
কণ্ঠ কোথায় বাজে রে ?
সে আমাদের বাঙলা দেশ,
আমাদেরই বাঙলা রে !
কোন্ দেশের দুর্দ্দশায় মোরা
সবার অধিক পাই রে দুখ ?
কোন্ দেশের গৌরবের কথায়
বেড়ে ওঠে মোদের বুক ?
মোদের পিতৃপিতামহের
চরণ-ধূলি কোথায় রে ?
সে আমাদের বাঙলা দেশ,
আমাদেরই বাঙলা রে !

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত